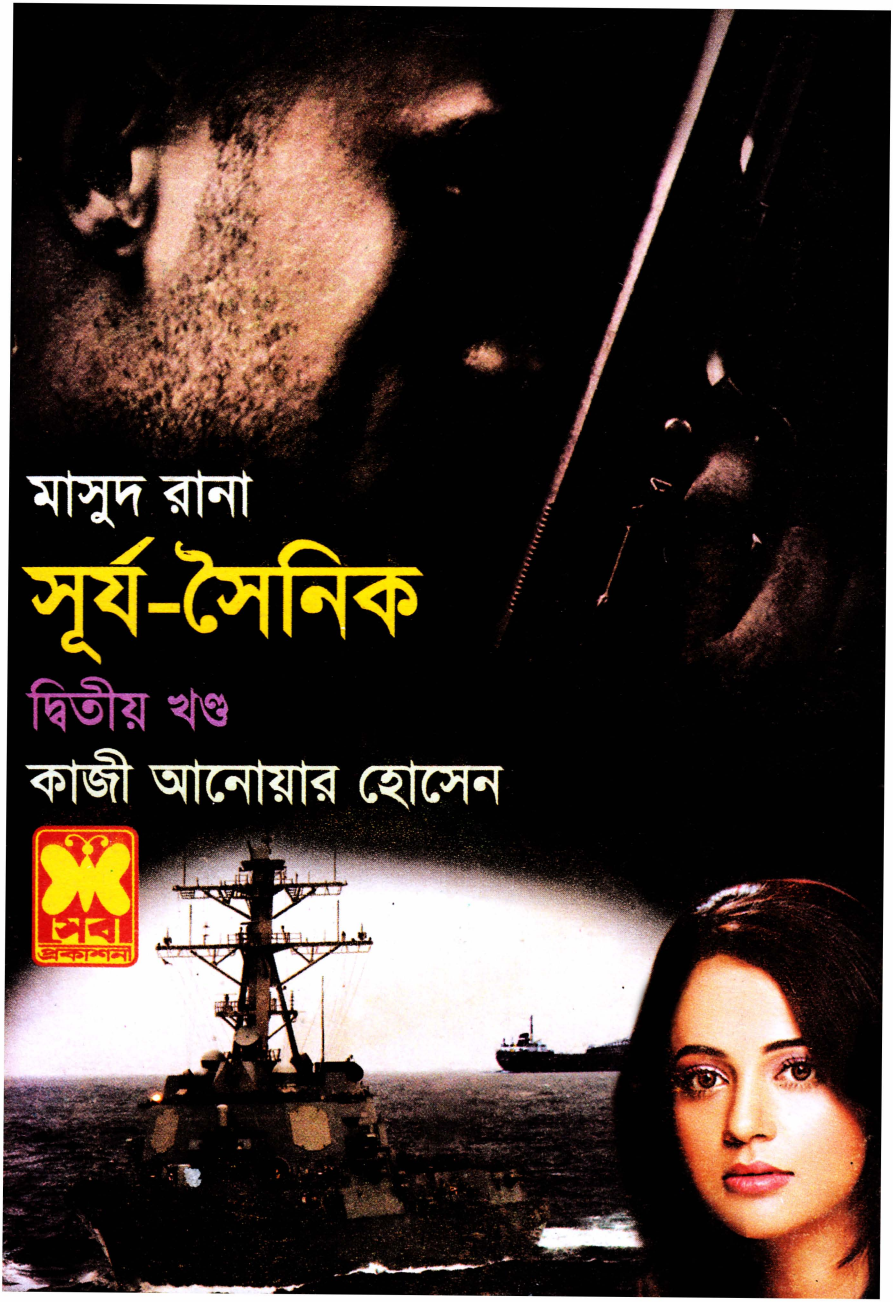
মাসুদ রানা
সূর্য-সৈনিক
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৪২০

সূর্য-সৈনিক

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7420-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১২

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন. ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-420
SHURJA-SHAINIK
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

পঁচাত্তর টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

মরুভূমি এখনও আঁধার। তবে ধীরে ধীরে ধূসর হয়ে আসছে পুবের আকাশ। নীড়ে ফিরছে নিশাচর পাখি। নিশাত ও নবী এক ঘণ্টা আগে বেরিয়েছে, হেঁটে পৌঁছে গেছে আর্কিওলজিকাল ক্যাম্পের কাছে। ঘুমের অভাবে শুষ্ক ওদের চোখ, রক্তে দৌড়াচ্ছে অতিরিক্ত অ্যাড্রেনালিন। সুন্দরীকে নিয়ে মরুভূমির গভীরে গেছে স্বর্ণা, ওখানে নামার কথা ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের কপ্টার। ভদ্রলোক পৌঁছে দেবেন ব্ল্যাডার ভরা ডিজেল। যথেষ্ট ফিউয়েল পেলে অনায়াসে মিশন শেষ করতে পারবে ওরা।

আর্কিওলজিকাল টিমের মাত্র একজনকে পাওয়া গেছে, কাজেই ওরা আন্দাজ করে নিয়েছে, শত্রুপক্ষ অন্যদেরকে বন্দি করে নিয়ে গেছে নিজেদের আস্তানায়। কোথায়, ওরা জানে না। হতে পারে কার্গো কপ্টার মাসুদ ভাইকে যেখানে নিয়েছে, সেখানেই। সেক্ষেত্রে তাদেরকে ইণ্টারোগেট করা হবে। সেই জিজ্ঞাসাবাদ হবে যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি ভয়ঙ্কর। কথা বের করার জন্য অকথ্য নির্যাতন চালানো হবে। কিন্তু কোনও ফলাফল পাবে না তারা। হয়তো এ মুহূর্তে আর্কিওলজিকাল ক্যাম্পের উদ্দেশে আসছে ওদের এমআই-৮ কপ্টার।

এদিকে অতি মূল্যবান সময় শেষ হয়ে এল। ঘনিয়ে আসছে শীর্ষ মহাসম্মেলন। এখনও জানা গেল না প্রধানমন্ত্রী কোথায়। হয়তো নির্যাতন করা হচ্ছে তাঁকেও।

পুব-দিগন্তে লাফ দিয়ে উঠল সূর্য, এর পর নড়াচড়া শুরু হলো ক্যাম্পে। তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে সবাই। বেশিরভাগই তরুণ ও তরুণী, কিছু দিন পর আর্কিওলজিস্ট হয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুবে। তবে বয়স্ক এক শ্বেতাঙ্গকেও দেখা গেল। উনি প্রফেসর। ক্যাম্পে গোটা দশেক তিউনিশিয়ান লোক, মনে হলো স্টাফ। কুচকুচে কালো মানুষের ভিড়ে একজনের পরনে বেমানান রংচঙে সুট। চেহারায় মহাবিরক্তি। সে বোধহয় সরকারী লোক।

আরও এক ঘণ্টা পেরুল, তারপর নিজ তাঁবু থেকে বেরুলেন প্রফেসর ব্রাম ট্যাগার্ট। মনে হলো না দলের চার ভাগের তিন ভাগকে হারিয়ে চিন্তিত। মস্ত হাই তুলে এসে দাঁড়ালেন রোদের ভিতর, বোধহয় ঘুম ভাল হয়নি। পরনে কোঁচকানো সাফারি সুট, মাথা ঢেকে রেখেছেন তোবড়ানো পানামা হ্যাট দিয়ে। টলতে টলতে গিয়ে ঢুকলেন মেস টেন্টে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রাঁধুনি। নিশাত ও নবী কোনও সুবাস পেল না। আন্দাজ করল, ওখানে ডিম ও আলু ভাজা দেয়া হচ্ছে। এখন ওটাই বা কে দিচ্ছে ওদেরকে, পরস্পরের দিকে চাইল ওরা। পেটে ছুঁচোর কেত্তন চলছে। অবশ্য মার্ভেল থেকে আনা টাটকা স্যাণ্ডউইচ পাবে ট্রাকে ফিরলে। মেস তাঁবুতে দীর্ঘ সময় নিয়ে খাওয়া চলল। তারপর বোধহয় শুরু হলো স্টাফ মিটিং। ছাত্র-ছাত্রীরা মেস-তাঁবু থেকে বেরুল, চলে গেল যে যার তাঁবুতে। পাঁচ মিনিট পর ব্যাগ ও টুলস হাতে চলে গেল রোমান ধ্বংসাবশেষের দিকে। আর্কিওলজিকাল সাইট ও এই ক্যাম্পের মাঝে মাথা তুলেছে ছোট একটা টিলা। কিছুক্ষণ পর অলস ভঙ্গিতে ছাত্রদের পিছনে গেলেন প্রশিক্ষক।

সবাই চলে যাওয়ার পর নিজ কোয়ার্টারে ফিরলেন ট্যাগার্ট। দু'মিনিট তাঁবুর ভিতর থাকলেন, তারপর বেরুলেন বই হাতে। তাঁবুর দরজার পাশেই ছায়ার ভিতর চেয়ার, সেখানে বসে খুললেন বইটা। আকার দেখে মনে হলো, এনসাইক্লোপিডিয়ার ভলিউম।

নিশাত ও নবী চাইছে ক্যাম্পে ঢুকে ধরবে প্রফেসরকে, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। স্থানীয় কর্মীরা ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক গুছিয়ে রাখছে, পরিষ্কার করছে তাঁবু।

'আমি একবার ভর্তি হতে চেয়েছিলাম আর্কিওলজিতে,' নিচু স্বরে বলল নিশাত। 'কদিন ওদের সঙ্গে ঘুরে দেখি এক সপ্তাহ পেরিয়ে যায়, শুধু মাটিই ঘাঁটছে। এদের তো চাকর আছে, ওদের কিছুই ছিল না। শেষে ভেগে গেলাম ওই ডিপার্টমেন্ট থেকে।'

'সরকার অনুদান দেয়নি বোধহয়,' বলল নবী।

'খামোকা দেবে কেন? ...ভাল করেই তো দেখলেন প্রফেসর ট্যাগার্টকে। কী মনে হয়?'

'মনে হচ্ছে এখানে চুপচাপ বসে টাকা রোজগার চলছে, কাজেই কোনও বিষয়ে তাড়াহুড়ো নেই। অন্যরা হারিয়ে গেলেও তার কোনও ক্ষতি নেই।'

'আমারও ঠিক তা-ই মনে হচ্ছে।'

আরও এক ঘণ্টা পেরুল, আরাম করে বসে রইলেন ট্যাগার্ট। আরও কিছুক্ষণ পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল তিউনিশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ। মাত্র দু' মিনিট কথা হলো, দুই হাত নাড়িয়ে কী যেন বললেন প্রফেসর, তারপর কথা শেষ করলেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

নিচু স্বরে বলে উঠল নিশাত, "প্রফেসর ট্যাগার্ট, আপনার লোকের কাছ থেকে কোনও খবর পেলেন?" এবার মোটা হয়ে উঠল নিশাতের কণ্ঠ, "না, কোনও খবর পাইনি।" এবার নাকি কণ্ঠে বলল, "নিশ্চয়ই বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন? তাদেরকে জানিয়েছেন তারা হারিয়ে গেছে?" মাথা নাড়ল নিশাত। "ওদের কী হয়েছে আমি কী জানি? এটা আমার কোনও বিষয় নয়। আমি কেন যোগাযোগ করতে যাব! আমি এসেছি কনসালট্যান্ট হিসাবে।" ..."আপনি তাদের জন্য চিন্তিত নন? কয়েক দিন পেরুল তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

...“তাতে আমার কী?” এবার স্বাভাবিক স্বরে বলল নিশাত, ‘এরপর স্টেজ থেকে স্থানীয় লোকটির প্রস্থান।’

বোধহয় ঠিকই ধরেছে নিশাত সুলতানা। কথা শেষ হতেই আর দেরি করেননি, আবার বইয়ে ডুব দিয়েছেন প্রফেসর।

আরও বিশ মিনিট অপেক্ষা করল নিশাত ও নবী। ততক্ষণে নীরব হয়ে গেছে ক্যাম্প। নতুন করে আর দেখা গেল না স্থানীয় কর্মচারীদেরকে। যে যার কাজ শেষে ক্যাম্প ছেড়েছে, হয়তো গেছে রোমান সাইটে। এবার গোপন স্থান থেকে বেরুল নিশাত, স্বাভাবিক পায়ে চলে গেল প্রফেসরের তাঁবুর পিছনে। পকেট থেকে ছোরা বের করে পোঁচ দিল পুরু নাইলনের কাপড়ে। ইমারসন সিকিউসি-৭এ ছোরা, মসৃণ ভাবে কাটছে। গরম ছুরি যেভাবে নরম মাখন কাটে।

নিঃশব্দে তাঁবুর ভিতর ঢুকল নিশাত, চলে গেল প্রবেশ দ্বারের কাছে। ট্যাগার্টের পিঠ এখন ওর দিকে। দূরত্ব মাত্র এক ফুট, কিন্তু কিছুই বুঝল না লোকটা। একবার চট্ করে পিছনে চাইল নিশাত। খানিক দূরে কয়েকটা ব্যারেলের পিছনে লুকিয়েছে নবী। ওই ব্যারেলগুলোর ভিতর রাখা হয়েছে ক্যাম্পের জেনারেটারের ডিজেল। হঠাৎ হাত উঁচু করল নবী। কম্পাউণ্ড পেরুতে শুরু করেছে রাঁধুনিদের একজন। তারপর চলে গেল সে ল্যাট্রিনে। এবার হাত মুঠো করে ঝাঁকাল নবী।

তাঁবু থেকে আধ পা বেরুল নিশাত, ট্যাগার্টের দুই বগলের নীচে দুই হাত ভরে এক হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এল তাকে তাঁবুর ভিতর। তাল সামলাতে পারল না অটোম্যান স্পেশালিস্ট, হুমড়ি খেয়ে পড়ল ধুলো ভরা মেঝের উপর। পরক্ষণে তাকে চিত করে বুকের উপর চেপে বসল নিশাত। বাম হাতে চেপে ধরেছে মুখ। ডান হাত উঁচু করে ছোরা দেখাল—একটু তেড়িবেড়ি করলে ফাঁক করে দেবে গলা!

এক মুহূর্ত পর নতুন তৈরি পিছন-দরজা দিয়ে ঢুকল নবী। 'আপা, ভাল দেখিয়েছেন। মনে হলো পঁচিশ কেজি ওজনের বাচ্চাকে সরিয়ে নিলেন।'

'ওজনটা কমপক্ষে এক শ' পঁচিশ কেজি। বসে বসে অনেক খেয়েছে ব্যাটা।'

ট্যাগার্টের মাথার পাশে দুই হাঁটু গেড়ে বসল নবী। লোকটার দুই চোখ পিরিচের মত গোল হয়ে উঠেছে। কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ইংরেজিতে সাবধান করল নবী, 'এবার মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নেওয়া হবে। নড়বেন না, বা চিৎকার দেবেন না, তা হলে স্রেফ খুন হয়ে যাবেন।'

চুপ রইল প্রফেসর।

'যদি বুঝে থাকেন, তা হলে মাথা দোলান।'

মোটেই নড়ল না ট্যাগার্ট। বিরক্ত হয়ে তার থুতনি ধরল নিশাত, মাথাটা বার কয়েক উঁচু-নিচু করিয়ে দিল। ভয় কমে এসেছে লোকটার, এবার দ্রুত কয়েকবার মাথা দোলাল।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল নিশাত। ককিয়ে উঠল প্রফেসর, 'আপনারা কারা? এভাবে আমাকে মারছেন...'

'গলা নিচু করুন,' চাপা স্বরে বলল নবী। 'আমরা স্মৃতি মাহমুদ, সবুর রহমান আর আসাদ চৌধুরির খোঁজে এসেছি।'

'আপনারা কারা?' দ্বিতীয়বারের মত বলল ট্যাগার্ট। 'আমি আপনাদেরকে চিনি না। আপনারা তো আমার গ্রুপের কেউ নন!'

তার একটা হাত খপ করে ধরল নবী। ভয় পেয়ে মাটির ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চাইল প্রফেসর। তার বাঁকা হয়ে যাওয়া চশমা সোজা করে দিল নবী, নিচু স্বরে বলল, 'আমরা আপনাদের বন্ধু। এখানে এসেছি আপনার সঙ্গীদের বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য।'

'তারা তো এখানে নেই।'

‘এ দেখি আস্ত গাধা,’ বিরক্ত হয়ে বলল নিশাত।

‘প্রফেসর ট্যাগার্ট,’ নরম করে বলল নবী। ‘আমরা এসেছি কয়েকটা প্রশ্ন করতে। আমরা বাংলাদেশি সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিমের সদস্য।’

‘বলুন?’

‘বাংলাদেশ সরকার থেকে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। আপনাদের মিশনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।’

‘এখানে সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই হবে না,’ বলল ট্যাগার্ট। ভয় দূর হয়েছে, এখন রেগে উঠছে।

‘কিছুই পাওয়া যাবে না, কেন মনে হলো আপনার?’ জানতে চাইল নিশাত।

‘নিশ্চয়ই জানেন আমি কে?’

লোকটা আসলে হারিয়ে যাওয়া সম্মান ফিরে পেতে চাইছে।

শান্ত স্বরে বলল নিশাত, ‘আপনি প্রফেসর ব্রাম ট্যাগার্ট, অটোম্যান এমপায়ারের উপর দুনিয়ার সেরা এক্সপার্টদের ভিতর অন্যতম।’

‘কাজেই ধরে নিতে পারি, আপনারা আমার কথা মেনে নেবেন। বাংলাদেশ সরকার থেকে অনুদান দেয়া এই এক্সপিডিশন আর কিছুই না, অর্থহীন সময় নষ্ট করা। কিছুই পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবেও না।’

‘আপনার যদি তা-ই মনে হয়, তা হলে এলেন কেন?’ জানতে চাইল নিশাত।

দ্বিধা নিয়ে চুপ রইল প্রফেসর, চোখদুটো চলে গেল বহু দূরে।

‘মিথ্যা বলবেন না,’ সাবধান করল নবী।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল ট্যাগার্ট. ‘চাকরি হারাই এক ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে। এদিকে আমার স্ত্রী আমাকে ডিভোর্স দিতে চলেছে। তার উকিল চুষে নিচ্ছে আমার সমস্ত টাকা।

আগেও ভাল বেতন ছিল না, পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গেল। এদিকে ক' বছর হলো একটা বইও বের হয়নি। অবস্থা তো বুঝতে পারছেন?'

'শুধু টাকার জন্য কাজটা নিয়েছেন, অর্থহীন কালক্ষেপণ জেনেও?'

'বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে প্রতি দিন সাত শ' ডলার করে পাই। টাকাটা আমার দরকার।'

'কাজেই এখানে চলে এসেছেন, শুয়ে-বসে আরাম করে বই পড়ছেন। এদিকে আপনার দলের সদস্যরা যে হারিয়ে গেছে, সেদিকে খেয়াল নেই। আগে ধারণা ছিল না, কোনও প্রফেসর এতটা পচে যেতে পারে।'

নিশাতের কথায় আপত্তি তুলল না ট্যাগার্ট, সামান্য লজ্জার ছাপও পড়ল না চেহারায়।

নিশাতের মন চাইল কষে একটা চড় দেয় লোকটার গালে, তবে তা না করে থমথমে কণ্ঠে বলল, 'এখন থেকে কাজ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করুন। আমাদেরকে বলতে হবে: কেন আপনার মনে হলো এই এক্সপিডিশন সময়ের অপচয়।'

'আপনারা ইউনুস আল-কবিরের গোটা কাহিনি জানেন?' নিশাতকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বলল, 'আমাদেরকেও জানানো হয়েছে আদ্যোপান্ত। সে-ডাকাত বা খুনি, যা-ই বলুন, বন্ধুত্ব করে এক আমেরিকানের সঙ্গে। এরপর মনোভাব বদলাতে থাকে তার। শেষে ঠিক করে পশ্চিমা খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ না করলেও চলে।'

'এসব আমরা শুনেছি,' বলল নবী।

'ওই গল্প আমি বিশ্বাস করি না। এক পলকের জন্যেও না। আল-কবিরের সমস্ত লেখা পড়েছি। বলা যায় তার বুকের ভিতর ঢুকে গেছি। ওই লোক বদলাবার নয়। অসম্ভব! বারবারির কোনও

জলদস্যু নিজের মনোভাব পাল্টে নিতে পারে না। ইউরোপিয়ান জাহাজ লুটপাট করে অনেক বেশি মুনাফা হতো। কেন বদলাতে যাবে তারা?'

'ইউনুস লড়াই করতেন ধর্মের জন্য, টাকার জন্য নয়,' বলল নবী।

'ইউনুস আল-কবির আর সব মানুষের মতই। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই, সে-ও টাকার পিছনে ছুটেছে। প্রথমে হয়তো ভেবেছে অধার্মিকদের খুন করলে পুণ্য হবে, তবে পরে তার লেখায় এসেছে আর্থিক লাভের কথা। ওগুলো কিন্তু তারই লেখা, আমার নিজের বানানো গল্প নয়।'

'আর্থিক মুনাফা মানেই অন্যায় ভাবে সম্পদ বৃদ্ধি নয়,' বলল নবী। বুঝেছে, ট্যাগার্ট নিজের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়েছে ইউনুস আল-কবিরকে। যেন তারই মত লোভী ছিল সেই দস্যু।

'আমাকে এখানে আনা হয় কারণ আমিই এক্সপার্ট,' বলল ট্যাগার্ট। 'যদি আমার কথা শুনতে ইচ্ছে না হয়, বিদায় নিয়ে চলে যেতে পারেন।'

'না, বলুন, আমরা কৌতূহলী,' বলল নিশাত। 'বারবারি জলদস্যুরা কত রোজগার করত?'

'তাদের ব্যাপারে কতটুকু জানেন?'

'শুনেছি আমেরিকান মেরিনরা তাদেরকে ধ্বংস করে।'

'এক এক্স আমেরিকান কনসালের অধীনে পাঁচ শ' মার্সেনারি এবং অল্প সংখ্যক মেরিনকে নিয়ে ধ্বংস করা হয় ডেমা শহর। ওটা ছিল ত্রিপোলির বাশাওয়ের পিছন-উঠান। ওই লড়াইয়ের ফলে দ্রুত শান্তি চুক্তি হয়।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ট্যাগার্ট। 'ফিফটিন্থ থেকে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির ভিতর বারবারি জলদস্যুরা লুটপাট করেছে। সে সময় যেসব দেশ চাঁদা দিতে পারেনি, তাদের জাহাজ দখল

করে নিয়েছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স থেকে শুরু করে স্পেন পর্যন্ত সাগরতীরের প্রতিটি ইউরোপীয় দেশ জলদস্যুদের চাঁদা দিতে বাধ্য হয়। প্রথম কিছুদিন জলদস্যুদের চাঁদা দিয়েছে এমন কী আমেরিকাও। ইউরোপ উপকূল থেকে ধরে আনা হয়েছে অগণিত মানুষকে। ধারণা করা হয় প্রায় দশ লাখ লোককে কিডন্যাপ করে জলদস্যুরা। এদের অর্ধেককে ধরা হয় তাদের নিজ বাড়ি থেকে। বিক্রি করে দেয়া হয় ক্রীতদাস হিসাবে।'

'এসব আমরা জানি,' বলল নবী।

নিজ সাবজেক্ট পেয়ে বলে চলেছে প্রফেসর, 'আমরা দেখছি সে আমলের সবচেয়ে শক্তিশালী নেভাল শক্তিকে। এই জাহাজগুলোর ভিতর সবচেয়ে মজবুত ছিল ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ। সবচেয়ে সফল জলদস্যুদের ভিতর অন্যতম ছিল ইউনুস আল-কবির। প্রথমে লেখাপড়া করেছে ইমাম হওয়ার জন্য, তবে তার পরিবারে ছিল জলদস্যুতা। কয়েক পুরুষ ধরে তারা ছিল লুটেরা। কাজেই বলতে পারি, সে মোটেই সাধু ছিল না। যখন ধরে নিল জলদস্যুতা করে ডাকাতি করা যায়, সেটার নাম দিল পবিত্র ধর্মযুদ্ধ। আসলে আজকের টেরোরিস্টদের সঙ্গে কোনও তফাত ছিল না তার।'

নিশাত কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। বুঝতে পারছে এ লোক নিজের সঙ্গে জলদস্যু-নেতার তুলনা করছে না, ইসলামী রাষ্ট্রের অতীত এবং বর্তমানের টেরোরিজমের ভিতর তুলনা করছে। এ এমন এক লোক যে জীবনে করুণ ভাবে হেরে গেছে। কখনও কোনওদিন গুলি ছোঁড়েনি, ধারণা নেই জঙ্গিরা কেমন হয়। লেখাপড়া করে প্রফেসর হয়েছে, তবে কখনও মানুষের অন্তর বুঝতে পারেনি।

'যদি ধরি ইউনুস আল-কবিরের মনোভাব পাল্টে যায়, তাতেই বা কী?' বলল প্রফেসর। 'আসল কথা কোথায় তার সেই

জাহাজ? মরুভূমির ভিতর দুই শ' বছর ধরে একটা জাহাজ আটকে থাকতে পারে না। টিকবে ওটা? এত দিনে ধ্বংস হয়ে গেছে। বা লুট করে নিয়েছে যাযাবররা। মূল বিষয়: আমার কথার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন, ওই জাহাজ আর নেই।'

'তর্কের খাতিরে বলছি, ওটা যদি থাকে?' বলল নবী। 'কোনও কারণে টিকে গেল? সেক্ষেত্রে ওটা কোথায় থাকবে? আপনার ধারণা শুনি।'

'ওয়াশিংটনে যে চিঠি পড়ি, তাতে ছিল ওই জাহাজ আছে শুকনো এক নদীর ভিতর। জায়গাটা আমাদের চেয়ে আরও দক্ষিণে। তবে পুরো এলাকা ঘুরে দেখেছে স্মৃতি, সবুর আর আসাদ। এক জায়গায় থামে তারা। ওখানে ছিল উঁচু জলপ্রপাত। নদী যখন ছিল, তখন ওই জায়গা পেরুনো ছিল অসম্ভব। কাজেই বারবারি জলদস্যু জাহাজ ওখানে থাকতে পারে না।'

'চিঠির ভিতর আর কোনও সূত্র?' বলল নিশাত, 'এমন কিছু, যা গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও আসলে জরুরি?'

'জেফ মার্টেল বলেছে ওই জাহাজ আছে বিশাল এক গুহার ভিতর। সেখানে যেতে হলে ব্যবহার করতে হয় অদ্ভুত এক যন্ত্র। এই যন্ত্র বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে, আমি জানি না। স্মৃতি মাহমুদ কয়েক সপ্তাহ আমার পিছে লেগে ছিল, কিছুই বলতে পারিনি। আর কোনও সূত্র বলতে আরেকটা বিষয়: স্থানীয়রা বলে ওই জাহাজ আছে কালো জিনিসের নীচে, তা আবার জ্বলে।'

'আরেকবার বলুন,' বলল নিশাত।

'কালো জিনিস যা জ্বলে। এই কথা এসেছে ইউনুস আল-কবিরের সাক্ষাৎ স্যাঙাতের দিনলিপি থেকে। লোকটার নাম ছিল রমিজ হারুনালি। ওই ডায়েরি টিকে থাকে, কারণ ওই লোক ছিল ত্রিপোলির বাশাওয়ের ভাতিজা। এসব লেখা ছিল রাজকীয় লাইব্রেরিতে। তবে ওসব দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে, তা আমি

জানি না। ব্যস, এ-ই। আর কিছু জানা নেই আমার।'

'ও,' বিড়বিড় করে বলল নিশাত।

যদি স্মৃতির মত ট্রেইণ্ড আর্কিওলজিস্ট সফিসটিকেটেড ইকুইপমেন্ট থাকা সত্ত্বেও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ খুঁজে বের করতে না পারে, তা হলে মার্ভেল জাহাজ থেকে আসা ওরা ক'জন কী করবে? এদিকে বড় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে শান্তি মহাসম্মেলন!

চট্ করে ঘড়ি দেখল নিশাত। হাতে মাত্র এক ঘণ্টা, তার ভিতর পৌঁছতে হবে সুন্দরীর কাছে। নইলে রওনা হবে স্বর্ণা। মনের ভিতর সব গুছিয়ে নিল নিশাত, ওর প্রথম কাজ সোহেল ভাইকে বলা: কথা হয়েছে ট্যাগার্টের সঙ্গে। এরপর ফিরতে শুরু করবে ওরা পাহাড়-সারির দিকে। ততক্ষণে মার্ভেল থেকে তথ্য মিলবে, জানা যাবে মাসুদ ভাই কোথায়। তাঁকে তুলে নেবার জন্য রওনা হবে ওরা।

'নবী ভাই, চলুন,' বলল নিশাত। 'ডক্টর ট্যাগার্ট, সময় দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না, আমরা এখানে আসিইনি। আমাদেরকে চেনেন না আপনি।'

'ঠিক আছে, কোনও সমস্যা নেই,' তাড়াতাড়ি করে বলল ট্যাগার্ট। 'আরেকটা কথা, আমার টিমের বিষয়ে কিছু জানেন?'

তিক্ত অনুভূতি হলো নিশাতের। তবে বলল, 'আপনাদের টিমের একজন মারা গেছেন। তিনি সবুর রহমান বা আসাদ চৌধুরি হতে পারেন। একবার গুলি করা হয়েছে কপালে। শকুনগুলো লাশের যে অবস্থা করেছে, তাতে তাঁকে চেনার উপায় রাখেনি। অন্য দু'জন সম্পর্কে কিছু জানি না।'

'হায় ঈশ্বর! আমার এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে? মনে হচ্ছে, এখুনি আমেরিকায় ফেরা উচিত!'

নবী কিছু বলবার আগেই ট্যাগার্টকে হ্যাঁচকা টানে আধ-শোয়া

করল নিশাত, পরক্ষণে লোকটার হাত মুচড়ে ঠেলে দিল পিঠের উপর অংশে।

'বাপরে, মরেছি!' করুণ বিলাপ ছাড়ল স্কলার।

'আপা, ছুঁচো মেরে হাত নোংরা করবেন না,' ইংরেজিতে বলল নবী।

চড়াৎ করে চড় পড়ল ডক্টরের গালে। উঠে দাঁড়াল নিশাত, লোকটার দিকে দ্বিতীয়বার না চেয়ে রওনা হয়ে গেল। ওর পর তাঁবু থেকে বেরুল নবী। থমথম করছে ক্যাম্প। কিন্তু ওরা দেখেনি তাঁবুর গায়ে কান লাগিয়ে বসে ছিল এক ছোকরা। সবই শুনেছে সে। নিশাত-নবী বালির ঢিবি পেরুতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল তিউনিশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভের খোঁজে। বিশ মিনিট পর বিপুল টাকার বিনিময়ে তথ্য পৌঁছে গেল ত্রিপোলিতে। তার পঁয়ত্রিশ মিনিট পর লিবিয়ার ভিতর এক পাহাড়ের উপর ঘুরতে লাগল এমআই-৮ কপ্টারের টারবাইন। দেখতে না দেখতে আকাশে উঠল যান্ত্রিক ফড়িং, রওনা হলো তিউনিশিয়ার সীমান্ত লক্ষ্য করে।

দুই

দিগন্তে ঝুলছে সূর্য, কিন্তু রোদের তেজ কমেনি। এগযিকিউটিভ কপ্টারের কেবিন থেকে বহু নীচে চেয়ে রয়েছেন অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামাল। কুঁচকে গেছে ভুরু। বমি আসছে। অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছেন, তবে নীচে যা দেখছেন তাতে যে-কোনও

সময়ে পাশে বসা লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে আলীর গায়ে বমি করে দেবেন। পাহাড়ে বিছিয়ে রয়েছে বিধ্বস্ত বাংলাদেশি এয়ারবাস। পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে ওটা। এক মাইল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। কেবিনের পঞ্চাশ ফুট লম্বা এক অংশ এবং একটা ইঞ্জিন ছাড়া সবই ছোট ছোট ভাঙা টুকরো।

'আল্লাহ্ সবাইকে মাফ করুন,' বললেন ফতে আলী। এই প্রথম এসেছেন সাইট দেখতে।

গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে লিবিয়ান সেনাবাহিনী, ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করছে এভিয়েশন এক্সপার্ট দল। এরা অ্যাম্বাসেডারের খানিক আগে পৌঁচেছে। এক মাইল দূরে রেখে এসেছে কপ্টার।

সাউণ্ডপ্রুফ কেবিনে ইণ্টারকমে বলল পাইলট, 'মিস্টার মিনিস্টার, আমরা এভিয়েশন এক্সপার্টদের কপ্টারের পাশে নামছি, নইলে দমকা বাতাসে এলোমেলো হবে সাইট।'

জবাব দিলেন মন্ত্রী, 'হাঁটতে ভালই লাগবে আমাদের।'

'ওকে, স্যর।'

নাহিদ কামালের দিকে চাইলেন ফতে আলী, এক হাত রাখলেন ভদ্রলোকের কাঁধে। 'আমার সরকার এবং আমার নিজের তরফ থেকে বলব, আমরা সত্যিই দুঃখিত, মিস্টার কামাল।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার আলী। আপনি যখন খবর দিলেন, তখনও মনে আশা ছিল...' কপ্টারের প্লেক্সিগ্লাস জানালা দেখিয়ে দিলেন কামাল। 'কিন্তু এখন...' মিলিয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। আর কিছু বলবার নেই।

সবুজ রঙের আর্মি কপ্টারের পাশে নামল ফ্রেঞ্চদের তৈরি এগযিকিউটিভ ইসি১৫৫ চপার। নেমে গেল মন্ত্রীর বডিগার্ড, মোষের ঘাড়ের মত মোটা গর্দান তার, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে। পাহাড়ের মত বিশাল লোক। পাত্তাই দিল না মাথার

উপর ঘুরছে রোটরগুলো। বালি ও পাথর ছিটকে উঠছে বাতাসের তোড়ে। ওই লোকের পর কপ্টার থেকে নেমে গেলেন মোহাম্মদ ফতে আলী, একটু সরে দাঁড়ালেন। শেষে নামলেন বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডার। থমথম করছে মুখ।

কেউ কোনও কথা বললেন না, নীরবে ধ্বংসাবশেষের দিকে চললেন। কয়েক পা যেতে না যেতেই ঘেমে উঠলেন কামাল। মনে হলো লিবিয়ান মন্ত্রী ও তাঁর গার্ড পণ করেছে, এক বিন্দু ঘামবে না। নির্বিকার চেহারা, প্রচণ্ড গরম এবং রোদে অভ্যস্ত। মাঝে মাঝে দমকা লূ হাওয়া আসছে পাহাড়ের দিক থেকে, সঙ্গে নিয়ে আসছে এভিয়েশন ফিউয়েল ও পোড়া প্লাস্টিকের দুর্গন্ধ।

আকাশ থেকে কামাল যা দেখেছেন, তার তুলনায় মাটিতে অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে জঞ্জাল। পুড়ে কালো হয়ে গেছে প্রতিটা জিনিস। দাউদাউ আগুনে জ্বলেছে গোটা বিমান। এলাকা কর্ডন করে রাখা সৈনিকদের কাছে পৌঁছে গেলেন তাঁরা। এখানে অপেক্ষা করবার কথা ছিল বাংলাদেশি এভিয়েশন এক্সপার্টদের লিডারের। সামনে জঞ্জালের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে তদন্ত দল, প্রতিটি জিনিসের ছবি তুলছে। তাদের সঙ্গে এক লোক ক্যামকর্ডার দিয়ে সব রেকর্ড করছে। ডিগনিটারিরা পৌঁছে যেতেই তাঁদের দিকে এলেন তদন্তকারী দলের চিফ। ঘোড়ার মত লম্বা মুখ তাঁর, ঠোঁটের কোণ একটু বাঁকা।

'অ্যাম্বাসেডার কামাল?' দূর থেকে বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ। আর ইনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী আলী।'

'আমি দাউদ তালুকদার।' দ্রুত এলেন তিনি, হাত মেলালেন তাঁদের সঙ্গে।

বাংলাদেশি এই এভিয়েশন এক্সপার্ট আমেরিকা থেকে মস্ত সব ডিগ্রি নিয়েছেন। সম্ভবত তাঁর নাম জানেন মন্ত্রী আলী। একটু কাত হয়ে চাইলেন ভদ্রলোকের দিকে।

'বলতে পারেন এখানে কী ঘটেছে?' জানতে চাইলেন অ্যাম্বাসেডার।

কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিক দেখলেন দাউদ। 'এখানে আমরা প্রথম লোক নই। আগেও অনেকে এসেছে।'

'কী বলছেন!' একটু তীক্ষ্ণ শোনাল মন্ত্রীর কণ্ঠ।

নাহিদ কামাল তাঁর দিকে চাইলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রী কীভাবে পরিস্থিতি সামলাবেন, তার উপর নির্ভর করছে বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কেমন হবে। শান্তি মহাসম্মেলনের সবাই খেয়াল রাখবে লিবিয়ান সরকার ব্যাপারটাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছে। এভিয়েশন এক্সপার্ট মিস্টার দাউদ যা বললেন, তাতে মন্ত্রী আলী এবং তাঁর সরকার বিপদে পড়তে পারে। সত্যি যদি কোনও প্রমাণ নষ্ট হয়, হয়তো দোষ দেয়া হবে লিবিয়ান সরকারকে—তোমরাই বাংলদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিমান ফেলে দিয়েছ। সেক্ষেত্রে বহু দেশ মুখ ফিরিয়ে নেবে লিবিয়ার দিক থেকে।

কাঁধ ঝাঁকালেন দাউদ। 'যতটুকু বুঝেছি, এখানে হাজির হয় একদল যাযাবর। অজস্র পায়ের ছাপ ফেলেছে। ক্যাম্প করে রান্না-বান্না সেরেছে। গুলি করে মেরে রেখে গেছে নিজেদের একটা অসুস্থ উট। ওই উটের শেষ বয়স ছিল। খয়ে গেছে দাঁতগুলো। ওটার কোনও মূল্য ছিল না বলেই মেরে ফেলা হয়।

'রেকেজের সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে মূল্যবান কী আছে খুঁজেছে। যাত্রীদের কয়েকটা লাশ ছিল, সেগুলো সরিয়ে ফেলেছে। শুনলাম, যাযাবররা মুসলিম নিয়ম অনুযায়ী মৃতদের চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর কবর দেয়। ওরা বোধহয় লাশগুলোর তাই করেছে। আসলে কী ঘটেছে বুঝতে হলে কেডাভার ডগ আনতে হবে।'

'কিছু বোঝা গেল? অ্যাক্সিডেন্টটা কী কারণে হয়?'

'যা বুঝলাম তা খুব সামান্য, তবে আন্দাজ করছি, চলার পথে বিমানের লেজের কোনও অংশ খসে পড়ে। ওটা এখনও পাওয়া

যায়নি। চারপাশ দেখবার জন্য কপ্টার পাঠানো হবে। ওরা ফ্লাইট পাথ ধরে খুঁজে দেখবে। রাডার এবং এলিভেটর বিকল হলে, তখন বিমানের হাইড্রলিক ফ্লুইডের অভাব দেখা দেবে। হাইড্রলিক সিস্টেম ফেইল করলে একই সঙ্গে বিকল হবে ফ্ল্যাপ, স্লেট ও মূল ডানার স্পয়লারগুলো। তাই যদি হয়, বিমান নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হয়ে ওঠে।'

মোহাম্মদ ফতে আলী জানতে চাইলেন, 'আপনি জানেন বিমানের লেজের কোন্ অংশ নেই?'

'এখনও নয়। ওটা পাওয়া গেলে বোধহয় জানা যাবে আসলে কী ঘটেছে।'

'আর যদি পাওয়া না যায়?' জানতে চাইলেন কামাল। পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে সন্দেহ করছেন তা নয়, তবে খেয়াল করেছেন তাঁর প্রতিক্রিয়া। ভদ্রলোক অবশ্যই পছন্দনীয় মানুষ, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তিনি নিরপেক্ষ কেউ।

'অন্যসব প্রমাণ হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা অনুচিত।'

অ্যাম্বাসেডারের দিকে চাইলেন আলী। 'মিস্টার কামাল, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বিমানের টেইলের ওই অংশ খুঁজে বের করা হবে। ঠিকই বেরুবে কীভাবে এই ক্র্যাশ হলো।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার কথা রাখা সম্ভব না-ও হতে পারে,' বললেন দাউদ। 'আজ বহু বছর ধরে আমি ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশনের কাজ করছি। এমনও দেখেছি মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হয়েছে প্লেন, ধ্বংসাবশেষ তুলে আনতে হয়েছে সাগর থেকে; তার পরেও ওসব ক্র্যাশের কারণ খুঁজে বের করা সোজা ছিল। কিন্তু এখানে যা ঘটেছে তা বোঝা ঢের কঠিন। আপনাদের লোক সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে দিয়েছে।' প্রতিবাদ করতে হাঁ করলেন আলী, তবে হাত তুলে তাঁকে বাধা দিলেন দাউদ। 'বলছি আপনাদের যাযাবরদের কথা। এরা তো আপনাদেরই জনগণ,

তাই না?'

'যাযাবররা কোনও দেশের নাগরিক হয় না, তারা মরুভূমির সন্তান।'

'যাই হোক, এরা সব ছিটিয়ে দিয়েছে, টেইল পাওয়া গেলেও পরিষ্কার ভাবে কিছু বলা সম্ভব হবে না।'

এভিয়েশন এক্সপার্টের চোখ দুটোকে বিদ্ধ করলেন আলী। 'অ্যাম্বাসেডার কামাল এবং আপনাদের সরকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আপনি দুনিয়ার সেরা এভিয়েশন এক্সপার্টদের একজন। কাজেই বলব, যা করবার তা করুন, মিস্টার দাউদ। বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে আপনি মূল সমস্যা খুঁজে বের করবেন। ধারণা করি আপনি প্রতিটি এয়ারলাইন ডেযাস্টার বিষয়ে পুরো মনোযোগ দিয়ে থাকেন। এবং এখন যে জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ধরে নিন, কী প্রমাণ পাবেন তার উপর নির্ভর করছে দুই সরকারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কেমন থাকবে।'

একবার অ্যাম্বাসেডার আরেকবার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দিকে চাইলেন দাউদ, তিক্ত হয়ে গেল চেহারা। বুঝেছেন এই ক্র্যাশ শুধু ফরেনসিক সায়েন্সের বিষয় নয়, এ থেকে শুরু হতে পারে মস্ত কোনও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যা।

'আপনাদের কনফারেন্স কবে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'আটচল্লিশ ঘণ্টা পর,' বললেন কামাল।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন দাউদ। 'যদি বিমানের টেইল পেতাম, আর যাযাবররা এভাবে সব নষ্ট না করত, হয়তো ওই সময়ের আগেই প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে পারতাম। যাই হোক, আমার সাধ্যমত চেষ্টা আমি করব।'

ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মিস্টার দাউদ ওটা ধরতেই বললেন, 'আপনার কাছে এর বেশি কিছু দাবি করছি না।'

নিঝুম আঁধারে ভাসছে দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজটা। সবাই সতর্ক। আশপাশ দিয়ে কোনও জাহাজ গেলে আগেই টের পাবে। নেটিং দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে সুপারস্ট্রাকচারকে। চলছে সোনার ও রেইডার। খুব কাছে না এলে কোনও জাহাজ বুঝবে না খোলা সাগরে ভাসছে বড়সড় কোনও জাহাজ।

কেবিনের দরজায় টোকা পড়তেই মুখ তুলে চাইল বিসিআইয়ের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার, সোহেল আহমেদ। যে এসেছে সে কমপিউটার বিশেষজ্ঞ রায়হান না হয়েই পারে না। সে হ্যাকার বলেই বোধহয় অতি সতর্ক।

'এসো, রায়হান।'

নীরবে খুলে গেল দরজা, ল্যাপটপ হাতে পিছলে ভিতরে ঢুকল রায়হান, পিছনে বন্ধ করে দিল দরজা। আরেক হাতে পাতলা এক পোর্টফোলিও। ওকে দেখে মনে হলো কয়েক সপ্তাহ ঘুমায়নি। তবে প্রসারিত ঠোঁট দুটো নীরবে হাসছে। মাসুদ ভাইকে যমের মত ভয় পায় সে, তবে সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে খাতির করে নিয়েছে বিসিআইয়ে যোগ দেয়ার পর।

'কী, রায়হান?' বামহাতে ধরা সিগারেটে সুখটান দিয়ে শেষাংশ অ্যাশট্রের ভিতর গুঁজে দিল সোহেল। রায়হান জানে, সোহেল ভাইয়ের ওই হাতটা নকল। বহু বছর আগে কাটা পড়েছিল ওটা কনুইয়ের কাছে। কিছুদিন আগে প্লাস্টিক, স্প্রিং ও রাবার দিয়ে অবিকল আরেকটা হাত তৈরি করে দিয়েছেন ড. শামশের আলী। সোহেল ভাই এখন ডানহাতের মতই ব্যবহার করতে পারে বামহাতের আঙুলও। ওই হাতের ভিতর ফাঁপা অংশে কিছু অস্ত্র ও গোলা-বারুদ রাখারও ব্যবস্থা আছে।

পোর্টফোলিও দেখিয়ে দিল রায়হান। 'মাসুদ ভাই যেখানে গেছেন, তার লোকেশন। সঙ্গে ওই এলাকার ইতিহাস।'

'জানতাম তুমি পারবে,' ডেস্কের উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার ও অ্যাশট্রে সরিয়ে নিল সোহেল। 'বিছিয়ে দাও ম্যাপ।' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, রায়হান ডেস্কের উপর মানচিত্র রাখতেই ওটার দিকে চাইল। 'এবার খুলে বলো।'

ছোট ট্রেইনিং ফ্যাসিলিটি দেখছে সোহেল। ওটা পাহাড়ের অনেক উপরে। উপকূল থেকে বিশ মাইল ভিতরে। পাহাড়ের চূড়াগুলো লুকিয়ে রেখেছে ক্যাম্পটাকে। এক পাশে বিশাল গভীর এক গহ্বর। কোনও ধরনের খনি হতে পারে। এসবই ধরা পড়েছে রানার জিপিএস ট্র্যান্সপণ্ডারের ফলে। উপকূল থেকে শুরু করে গহ্বর পর্যন্ত গেছে সরু এক কালো লাইন। বোধহয় রেল লাইন। ক্যাম্প থেকে উপকূলে যাওয়ার পর এক পাশে পুরনো কয়েকটা দালানের সামনে দিয়ে গেছে। ওখানে রয়েছে দীর্ঘ জেটি। একদিকে কিছু দালানের পাশে খনন কাজ হয়েছে।

বন্দরের দিকে আগে আঙুল তুলল রায়হান। 'ব্রিটিশদের কোলিং স্টেশন, তৈরি হয় আঠারো শ' চল্লিশ সালে। উনিশ শ' চোদ্দ সালে নতুন করে বড় পিয়ার তৈরি করে। ধারণা করা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাজে লাগবে। তবে তার অনেক পরে রোমেলের নর্থ আফ্রিকা ক্যাম্পেইনে প্রায় বিধ্বস্ত হয় পিয়ার। নতুন করে ওটা তৈরি করে জার্মানরা। ওটা ছিল তখন স্টেজিং এরিয়া, মিশর দখল করতে রওনা হয় হিটলারের বাহিনী। কালো লাইনটা রেলরোড, সোজা গেছে প্রকাণ্ড গহ্বরের পাশে। ওখানে কয়লা সরাতে বড় খাল ছিল, কিন্তু পরে শুকিয়ে যায়। তখন ওটার বদলে বসানো হয় রেলরোড।'

'দেখে মনে হচ্ছে কেউ নতুন করে চালু করেছে ওই খনিটা,' মন্তব্য করল সোহেল।

'ঠিক তাই, সোহেল ভাই। আন্দাজ পাঁচ মাস আগে। নতুন করে রেল লাইন ঠিক করেছে। এখন বড় ওর বগিগুলো চলতে

পারে। পুরনো খনিতে কাজ শুরু হয়েছে।'

'কিন্তু কেন? যে দেশ বসে আছে চল্লিশ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের উপর, তাদের কয়লা লাগবে কেন?'

'জায়গাটা পাওয়ার পর থেকে আমিও জানতে চেয়েছি,' বলল রায়হান। 'এবং কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। লিবিয়ান সরকার টাইডাল জেনারেটিং স্টেশন বসিয়েছে যাতে প্রকৃতি ঠিক থাকে। তা হলে?'

'ওখানে আসলে কী ঘটছে?'

'সিআইএর কমপিউটার হ্যাক করে জেনেছি, ওরা ভাবছে ওখানে গড়ে তোলা হচ্ছে সাবটেরেনিয়ান নিউক্লিয়ার-রিসার্চ প্রোগ্রাম।'

'শুনেছি মুয়াম্মার গাদ্দাফি নিউক্লিয়ার অ্যামবিশন ছেড়ে দিয়েছে,' প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে ঝোলাল সোহেল, ধরিয়ে নিল লাইটার দিয়ে। 'সিআইএ তো সব কিছুকে সন্দেহ করে। যে কোনও দিন শুনব আমার নানীবাড়ির সিঁড়িঘরের নীচে শুরু হয়েছে নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম।'

ফিক করে হেসে ফেলল রায়হান। 'তবে আমেরিকার ফরেন ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসেস বাতিল করে দিয়েছে সিআইএর ধারণা। তারা বলছে খনি চালু করা হয়েছে নিয়ম মেনে। এখন আমাদের সমস্যা: ওই খনির সঙ্গে কোনও করপোরেট এনটিটির নাম নেই। তাতে অবাক হইনি। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে লিবিয়ানদের সুনাম নেই। ট্রেড পাবলিকেশনের একটা আর্টিকেলে পড়লাম, লিবিয়া তেলের বদলে কয়লার গ্যাসিফিকেশনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠছে। বলা হয়েছে তারা এমন এক সিস্টেম পেয়েছে, ন্যাচারাল গ্যাসের বদলে কয়লা দিয়ে ঢের পরিচ্ছন্ন ভাবে কাজ করতে পারবে।'

'শুনে মনে হচ্ছে বিশ্বাস করছ না,' বলল সোহেল।

'কাজেই কাদা খুঁড়তে শুরু করলাম। বহু আগে যখন জাহাজ কয়লা ব্যবহার করত, সেদিকে চোখ ফিরালাম। সে সময়ের দৃশ্য তৈরি করলাম মনে মনে, দেখতে পেলাম জাহাজগুলোকে নিয়মিত রিফিউয়েল করা হচ্ছে, আর তাতে পঞ্চাশ পার্সেণ্ট মেইনটেন্যান্স বাড়ছে। শুধু তাই নয়, বিশ পার্সেণ্ট কমে আসছে এফিশিয়েন্সি।'

'কয়লা মানেই নোংরা পরিবেশ,' মাথা দোলাল সোহেল।

'শিপিং আর্কাইভে হায়দ্রাবাদ নামের এক উপকূলীয় ফ্রেইটারের ক্যাপ্টেনের লগ পেলাম। লিখেছে ওই স্টেশন থেকে কয়লা নেয়ার বদলে জাহাজে তুলবে কাঠের গুঁড়ো।'

'বর্তমানে কোনও গ্যাসিফিকেশন টেকনোলজি নেই যা ভাল। মূল কথায় এসো, আসলে জায়গাটা কী?'

'খনির উত্তরে একটা ফ্যাসিলিটি আছে, আগে ওখানে লিবিয়ান আর্মির ট্রেইনিং বেস ছিল।'

'তা হলে সরকার ওখানে স্যাংশান দিচ্ছে?'

'তা না-ও হতে পারে, সোহেল ভাই। কয়েক বছর আগে ট্রেইনিং বেস গুটিয়ে নেয়া হয়।'

'তা হলে কী পাওয়া গেল?' একটু বিরক্ত হলো সোহেল।

'তেমন কিছুই না। আমেরিকান ছবি যা দেখছেন সব দুই মাস আগে তোলা। বর্তমানে কী ঘটছে জানি না।'

'আমরা যদি টাকা দিয়ে কমার্শিয়াল স্যাটালাইট কোম্পানির সাহায্য নিই?'

'চেষ্টা করেছি। সাধারণ ফি'র দ্বিগুণ দিতে চেয়েছি। ওরা রাজি, কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, আগামী এক সপ্তাহের আগে কোনও ছবি দিতে পারবে না।'

'কাজেই সে চেষ্টা বাদ। তার আগেই যে করে হোক রানা ও প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করতে হবে।'

'জী।'

'তার মানে যে কোম্পানি রেল লাইন ব্যবহার করছে, তার করপোরেট পর্দা সরাতে পারোনি?'

'সে চেষ্টা পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মত, সোহেল ভাই। আগেও এসব চেষ্টা করেছি। এক এক করে পর্দা সরিয়েছি, কিন্তু বেরোয়নি মালিক কে। তবে লিবিয়ার ভিতর যেসব কোম্পানি কাজ করে, এদের বিষয়ে জেনেছি, এরা সাধারণত সরকারের সঙ্গে কাজ করে। ব্যাপারটা প্রায় জাতীয়করণের মত।'

'অর্থাৎ পুরো একটা বৃত্ত ঘুরলাম আমরা। কিন্তু এ থেকে কী বুঝব? সব কিছুর পিছনে লিবিয়ান সরকার?'

'হতে পারে। এসবের সঙ্গে থাকতে পারে আর্মি। আপনি তো জেএসও, বা জামাহিরিয়া সিকিউরিটি অর্গানাইজেশনের নাম জানেন। তারা দেশের প্রধান স্পাই এজেন্সি। তারা এসবের সঙ্গে থাকতে পারে। গাদ্দাফি দুনিয়ার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়ার পর জেএসওর ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। হয়তো তারাই চাইছে ক্ষমতা ফিরে পেতে।'

'এখুনি বলা যাচ্ছে না, তবে হতে পারে, প্রধানমন্ত্রীর বিমান এরাই ফেলে দিয়েছে।' একবার ছোট হয়ে আসা সিগারেট দেখল সোহেল, তারপর ওটাকে অ্যাশট্রের ভিতর গুঁজে দিল। কিছুই বলছে না রায়হান, একদম চুপ। আবার শুরু করল সোহেল, 'হতে পারে টেরোরিস্টরা জেএসওর কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়েছে, যাতে তারা চোখ বন্ধ রাখে। সুদানে একই কাজ করেছিল ওসামা বিন লাদেন। আফগানিস্তানেও।'

'এবার অন্যদিকে মনোযোগ দিই,' খেই ধরল রায়হান। 'আমরা জানি আগেও সন্ত্রাসীদের স্থান দিয়েছে লিবিয়ান সরকার। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা আশ্রয় পেয়েছিল ওদের কাছেই। এমনও হতে পারে ওই খনি বা রেল লাইন সন্ত্রাসীদের নতুন কোনও ফ্রন্ট। আসলে ওখানে ট্রেইনিং ক্যাম্প তৈরি করেছে। প্রচুর টাকা

খরচ করে ট্রেইনিং দিচ্ছে সন্ত্রাসী জঙ্গিদের। আফ্রিকার হীরা ট্রাফিকিঙে একই কাজ করেছিল আল-কায়েদা।'

'আমরা খামোকা মগজ খরচ করছি,' বলল সোহেল। 'যা ঘটবে তা বুঝে নিয়ে চলতে হবে। ভেবে কোনও লাভ নেই। মনের ভিতর কোনও জবাব পাব না। এখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে রানাকে ওখান থেকে বের করে আনা। ও হয়তো বলতে পারবে ওখানে আসলে কী ঘটছে।'

'ঠিক তাই, সোহেল ভাই।'

'আর কিছু বলবে?'

'তেমন কিছু না। আমাদের আসলে অপেক্ষা করতে হবে। মাসুদ ভাই যোগাযোগ করলে তখন দ্রুত মুভ করতে হবে।' একটু চুপ থাকল রায়হান, তারপর বলল, 'খুব খারাপ লাগছে।'

'বুঝতে পারছি কী বলতে চাও।'

'আসলে মাসুদ ভাই না গেলেও পারতেন। এত বড় ঝুঁকি...'

'ওটা ট্যাকটিকাল নেসেসিটি ছিল। নইলে জানতাম না ওখান থেকে কলকাঠি নাড়ছে সন্ত্রাসীরা।'

'আর কোনও উপায় থাকলে ভাল হতো। যদি রেইডারে অনুসরণ করা যেত কপ্টারটাকে...'

'কপ্টার ওই সাইটে নামবে তাই তো জানি না আমরা, পরেও ট্র্যাক করা অসম্ভব হতো। পুরো পথ মাটি ছুঁয়ে গেছে। স্যাটালাইট কাভারেজও পেতাম না। একমাত্র উপায়টাই বেছে নিয়েছে রানা।'

'সরকার এসব করছে, না কোনও সন্ত্রাসী দল, তা-ও জানি না আমরা। হতে পারে তারা ইউনুস আল-কবিরের দল। এ-ও জানি না তারা কী করতে চলেছে। জানা নেই প্রধানমন্ত্রী বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন। আসলে কিছুই জানি না আমরা।'

'তা বলতে পারো। নিশাত, স্বর্ণা আর নবী একটা কপ্টার দেখেছে। হয়তো ওটা দিয়েই এয়ারবাস ফেলে দেয়া হয়েছে।

আমাদেরকে জানতে হবে এসবের পিছনে কে বা কাদের হাত রয়েছে। এদিকে হারিয়ে গেছে আর্কিওলজিস্টরা। তারা কোনও ভাবে জড়িত হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে। নষ্ট বুদ্ধির এক অ্যাকাডেমিক ওখানে রয়েছে; কাজ না করে বসে বসে পয়সা নিচ্ছে লোভী বউয়ের পার্স ভরাতে। সব মিলে বিশ্রী পরিস্থিতি। এদিকে শান্তি মহাসম্মেলন চলে এল। ক্যাম্প ডেভিডের পর ওটা সবচেয়ে বড় কনফারেন্স।'

'আর একটু ভাবুন, মাসুদ ভাই মোটেই যোগাযোগ করছেন না। আমরা জানি না জিগস'র কোন্ টুকরো কোথায় বসবে।'

'এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে নিশাত, স্বর্ণা ও নবীকে খনি ক্যাম্পের কাছাকাছি থাকতে বলা,' বলল সোহেল। 'রানা সাহায্য চাইলে যাতে সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারে।'

'আর্কিওলজিস্ট আর ফতোয়ার কী হবে, সোহেল ভাই?'

'আপাতত ভুলে যাব। মূল কাজ রানা ও প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করা।'

ডেস্কের উপর বেজে উঠল ফোন। ডিসপ্লের দিকে চাইল সোহেল, কমিউনিকেশন্স ডিউটি অফিসার। বাটন টিপল ও। 'সোহেল বলছি।'

'এই মাত্র সিকিউর অ্যালার্ট পেলাম বিসিআই থেকে।'

'বলো?'

'মাসুদ ভাইকে যে কপ্টার নিয়ে গেছে, ঠিক তেমনি একটা গেছে তিউনিশিয়ার রোমান আর্কিওলজিকাল সাইটে। ওটা থেকে নামে সশস্ত্র লোকজন, কিডন্যাপ করে প্রফেসর ব্রাম ট্যাগার্ট, তিউনিশিয়ান সরকারী ওভারসিয়ার আর ক্যাম্পের এক স্টাফকে। বোধহয় এসবের সঙ্গে জড়িত স্থানীয় এক ছোকরা।'

তিক্ত চেহারা করল সোহেল। কমিউনিকেশন স্পেশালিস্টকে বলল, 'ঠিক আছে। বিসিআইকে অ্যাক্‌নলেজমেণ্ট দিয়ে বলো

আমরা বুঝতে পেরেছি।' রিসিভার নামিয়ে রায়হানের দিকে চাইল সোহেল। 'পাওয়া গেল তোমার আরেকটা জিগস'র টুকরো।'

এ টুকরো অন্য কোনও জিগস'র অংশ হতে পারে, তবে কিছু বলল না রায়হান।

তিন

বেশ কিছুক্ষণ হলো দম আটকে গেছে স্মৃতি মাহমুদের। দুঃস্বপ্নের ভিতর থেকে জেগে উঠছে সে।

আবছা চেতনা ফিরতেই টের পেল, কোথায় আছে। মাথার তালুর উপর টিসটিসে ব্যথা। ওখানে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছে গার্ড। বাবুর্চির সামনে আধপেটা মানুষের যে লাইন, সেখান থেকে ওকে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে আনা হয়েছে। টনটন করছে দুই হাত, যেন ছিঁড়েই গেছে। সবাই টিনের বাসনে করে মোটা বাবুর্চির কাছ থেকে সুরুয়ার মত পাতলা হলুদ তরল নিতে ব্যস্ত। ওই একই জিনিস দেয়া হয় সব বন্দিকে। রুক্ষ পাথুরে মাটির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় পিঠ ছিলে গেছে স্মৃতির। যে শুঁটকি তরুণ গার্ড ওকে টেনে সরিয়ে নিয়েছে, মনে হয় তার অন্তরে দয়া-মায়া বলতে কিছু নেই।

হঠাৎ পুরো সচেতন হয়ে উঠল স্মৃতি। আস্তে করে চোখ খুলল। খিঁকখিঁক করে হাসছে গার্ড। কিন্তু আরেক গার্ড রেগে উঠে কী যেন বলছে তাকে।

ওকে টেনে কিছুদূর নিয়েই দুই হাত ছেড়ে দেয়। ঠাস্ করে

পাথরের উপর পড়ে স্মৃতির মাথা। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য জ্ঞান হারায় ও। একটু আগে আরবিতে কী যেন বলছিল লোকগুলো।

শুঁটকি গার্ডের সঙ্গে এখনও তর্ক করছে তৃতীয় গার্ড। তারপর চতুর্থ এক লোক এসে যোগ দিল তর্কে। তাকে চেনে স্মৃতি, সে ওঅর্ক ক্যাম্পের সিনিয়র কোনও কর্মকর্তা। তার দুই ধমকে চুপ হয়ে গেল সবাই। যে গার্ড স্মৃতির মাথার উপর ডাণ্ডা মেরেছে, সে বুট দিয়ে খোঁচা দিল ওর পেটে। হাতের ইশারা করছে, স্মৃতিকে আবার লাইনে দাঁড়াতে হবে। এই ক্যাম্পের বন্দিরা দুর্বল ও দুস্থ, পরনে ছেঁড়াখোঁড়া শার্ট-প্যান্ট। অল্প কয়েকজন মেয়ে আছে এই দলে। তাদের পোশাক আরও খারাপ। ছিঁড়ে গেছে ব্লাউজ। খেতে না পেয়ে শীর্ণ সবাই। চোয়ালের গর্তে বসে গেছে দুই গাল।

এক সপ্তাহ হয়নি স্মৃতি এই ক্যাম্পে এসেছে। প্রথম দিনই বুঝতে পেরেছে অন্যরা রয়েছে এখানে মাসের পর মাস। নাযি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বন্দিদের যে অবস্থা ছিল, এখানে ঠিক সেই পরিস্থিতি।

লম্বা টেবিলের পাশে আবার দাঁড়াল স্মৃতি। ওর পিছনের মহিলা বিড়বিড় করে কী যেন বলল আরবিতে।

'দুঃখিত? আমি আপনার ভাষা জানি না,' কাত হয়ে বলল স্মৃতি।

যে মহিলা কথা বলেছে, সে এক সময়ে ভারী গড়নের মানুষ ছিল, গলা থেকে এখনও ঝুলছে পুরু চামড়া। সরাসরি স্মৃতির চোখে চাইল সে, তারপর নীরবে টেবিল দেখিয়ে দিল। বোধহয় বোঝাতে চাইছে, গার্ডদের দিকে চাইতে যেয়ো না, নিজের কাজে ব্যস্ত থাকো। স্মৃতির পাশ দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরছে এক বন্দি, হাতে টিনের বাসন ও স্টিলের মগ।

পাঁচ মিনিট পর বাসনে সুরুয়া ও মগে পানি পেল স্মৃতি। সরে

এল ওখান থেকে। দু' মিনিট পর ওর পাশে এসে থামল মোটামত মহিলা। বন্দিদের খাবার খেতে হবে মাটিতে বসে। ক' জনের কপাল ভাল, তারা একটা দালানের পাশে পিঠ ঠেকিয়ে বসতে পেয়েছে। এই দালানগুলো বেশ পুরনো, দুইতলা বা তিনতলা। ছাত হিসাবে জং ধরা লোহার পাত। দেয়াল বলতে ক্ল্যাপবোর্ড, সূর্যের তাপে ফেটে বাঁকা হয়ে গেছে। দালানের আরেক পাশে রেল সাইডিং। ওখানে রয়েছে কয়েকটা রেলকার ও ছোটবড় দুটো লোকোমোটিভ। ছোটটার আকৃতি বড়জোর একটা ট্রাকের সমান। দালান বা রেলকারের চেয়ে অনেক নতুন মনে হলো লোকোমোটিভ দুটোকে। তবে তা-ও এখন ধুলোয় ধূসরিত। খানিক দূরে প্রধান লাইন, আধ মাইল গিয়ে পাহাড়ি বাঁকের ওপাশে হারিয়ে গেছে। ওখানে রয়েছে জং ধরা লোহার বিশাল এক আকৃতি, সঙ্গে পুরনো কনভেয়ার বেল্ট ও ধাতব শ্যুট, যত্ন না নেয়ায় সব এখন ধসে পড়ছে।

এখানে আসবার পর স্মৃতির বুঝতে দেরি হয়নি, এটা অনেক আগের এক পুরনো খনি। বন্দিদেরকে দিয়ে নতুন করে চালু করা হচ্ছে এটা। যাদের গায়ে এখনও যথেষ্ট শক্তি, প্রতি ভোরে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তর দিকে লাইন মেরামত করতে। অন্যদেরকে কাজ দেয়া হয় উপত্যকায়, দিঘির মত গভীর ওই গর্তে। ইকুইপমেন্ট হিসাবে ভারী যন্ত্র দেয়া হয় না। ওখানে রেল ফ্ল্যাটবেডে রয়েছে এক ক্রেন, ওটা রেল লাইন বসানোর কাজ করে। এ ছাড়া রয়েছে দুটো বুলডোজার। বন্দিদের খালি হাতে কাজ করতে হয়। সর্বক্ষণ তাদের উপর নজর রাখে গার্ডরা। একটু এদিক ওদিক হলে নেমে আসে লাঠির বাড়ি বা ঘুসির বৃষ্টি। গত পরশু এক লোককে চোখের সামনে পিটিয়ে মেরে ফেলতে দেখেছে ও। লাশটা ফেলে রাখা হয় শকুনের জন্য। মানুষটার দোষ ছিল, সে কাজ থামিয়ে গার্ডদের কাছে পানি চেয়েছিল।

চুপচাপ সুরুয়া গিলছে বন্দিরা, হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। দূর থেকে ফিসফিসে আওয়াজ আসছে। সবার চোখ চলে গেল উপত্যকার পুবে। প্রচুর ধুলো তুলে এগিয়ে আসছে ট্রাক, চাকাগুলো পুরু ও প্রকাণ্ড।

ওরকম আরেকটা ট্রাক স্মৃতি ও সবুরকে এখানে ধরে এনেছে। ছাতের উপর মেশিনগান, দ্রুত আসছে ট্রাক। হুডের উপর বস্তার মত কী যেন। যন্ত্রদানব কাছে আসতেই বোঝা গেল ওটা বস্তা নয়, একটা লোক। পরনে পোশাক নেই, দেহের কালচে ত্বক এখন পুড়ে লালচে। যেন ছিলে নেয়া হয়েছে চামড়া। বুক-পেট খুবলে খেয়েছে কোনও জন্তু। হাত-বুক-পেট রক্তাক্ত। ক্ষত-বিক্ষত মুখ ফুলে আছে লাল বেলুনের মত।

আজ ভোরে পলাতক বন্দিকে ধরতে পাঠানো হয় গার্ডদের।

লম্বা টেবিলের পাশে এসে থামল ট্রাক, সঙ্গে সঙ্গে ঝটাং করে খুলে গেল প্যাসেঞ্জার দরজা, লাফ দিয়ে নামল এক গার্ড। কথা বলছে গার্ডদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। তার কথা শেষ হতেই গলা উঁচু করে ঘোষণা দিল ক্যাপ্টেন। বন্দিদের জড় করা হবে। লোকটার ভাষা না বুঝলেও সবই বুঝল স্মৃতি, জানে সে কী বলতে পারে। *এই কুকুরটাকে দেখে নাও, তোমাদের ভিতর কেউ পালাতে চাইলে এই একই পরিণতি হবে।* কোমরের খাপ থেকে ছোরা বের করল ক্যাপ্টেন, যে দড়ি দিয়ে দেহটাকে জড়িয়ে রাখা হয়েছে, সেটা কাটতে লাগল। আধ মিনিট পর লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল। ভেজা 'থপ্' ধরনের আওয়াজ তুলে মাটিতে পড়ল লাশ। চারপাশের হাজারো মাছি পলকের জন্য সরে গেল, পরক্ষণে লাশটা পালিয়ে যাচ্ছে না দেখে খুশি হয়ে আবার এসে বসল লোভনীয় খাবারের উপর।

স্মৃতির পেটে খাবার নেই যে বমি করবে, তবে উবু হয়ে গেল কোমরের কাছ থেকে, দু'হাত রেখেছে দুই হাঁটুর উপর, বার

কয়েক ঝাঁকি খেল—যেন পেটের ভিতর কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছে মস্ত কোনও সাপ। কিছুক্ষণ পর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল স্মৃতি। হাত থেকে পড়ে গেছে বাসন ও মগ। কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে চাইল এক গার্ড। বুঝতে চাইছে এ মেয়ের সমস্যা কী।

আধ ঘণ্টা পর খাওয়া শেষ হলো। পুরো সময় চুপ করে বসে রইল স্মৃতি। পুরুষ বন্দিরা বাসন-মগ রেখে চলে গেল। ওসব ধোয়ার কাজ দেয়া হয়েছে মেয়েদেরকে, সে কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল ওরা। মুঠো ভরা বালি ফেলল বাসন-মগের উপর, তারপর মাজতে শুরু করল। বন্দিরা খাবারটুকু চেটে খেয়ে গেছে, না মাজলেও চলে। দিনে এই একবার ভাল খেতে পায় বন্দিরা। তাও যদি না দেয়া হতো, উঠে দাঁড়াতে পারত না কেউ।

হাঁটু মুড়ে বসে গামলা পরিষ্কার করছে স্মৃতি, এমন সময় ওর উপর এসে পড়ল কালো এক ছায়া। মুখ তুলে চাইল ও। অন্য মহিলারা চুপচাপ কাজ করছে, ভুলেও কোনওদিকে চাইছে না। হঠাৎ ডানহাত ধরে হ্যাঁচকা টানে স্মৃতিকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। এ সেই তরুণ গার্ড। এ-ই ওকে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। ঝুঁকে এসেছে মুখের উপর। শ্বাসে তামাকের কটু গন্ধ পেল স্মৃতি। তরুণের বয়স হবে বড়জোর বিশ, তবে চোখ দুটো মরা মাছের মত। মনে হলো না স্মৃতিকে মানুষ ভাবছে। ও যেন চাবি ঘুরিয়ে চালু করা কোনও পুতুল।

মহিলাদের উপর চোখ রাখা গার্ডদের দায়িত্ব, তবে তারা এ মুহূর্তে চোখ সরিয়ে রেখেছে অন্য দিকে। কাজটা করা হচ্ছে যুক্তি করে। নিশ্চয়ই একটা চুক্তি হয়েছে তাদের ভিতর। যতক্ষণ ইচ্ছে স্মৃতিকে আটকে রাখবে তরুণ। এর বেশি কিছুও করতে পারে।

এক হাঁটু তুলে তরুণের তলপেটে গুঁতো দিতে চাইল স্মৃতি। তবে ঢের সতর্ক সে, কাত হয়ে ধাক্কাটা নিল ঊরুর উপর। তরুণের ঠোঁটে টিটকারির হাসি, পরক্ষণে চড়াৎ করে চড় পড়ল

স্মৃতির গালে। টলে উঠল স্মৃতি, ওর মনে হলো মুহূর্তে ফুলে গেছে গাল।

চেঁচিয়ে উঠল না, পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিল। মাতালের মত টলছে, বন বন করে ঘুরছে মাথা। কয়েক মুহূর্ত পর পরিষ্কার হলো দৃষ্টি। হাড্ডিসার গার্ড খপ করে ওর কাঁধ ধরল, ঘুরিয়ে দিল। এত জোরে ধরেছে, কাঁধের মাংসে বসে গেল আঙুলগুলো। অন্য গার্ডদের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

গজ পঞ্চাশেক দূরে পুরনো এক ছাউনি, অর্ধেক চাল নেই, সেদিকে নিয়ে চলেছে ওকে গার্ড। দেয়ালগুলো ফুলে বাঁকা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। মাত্র একটা কবজা থেকে ঝুলছে দরজাটা। স্মৃতিকে ধাক্কা দিয়ে দরজা পার করে দিল তরুণ। এত জোরে ঠেলেছে, সামলাতে পারল না স্মৃতি, মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বুঝতে পারছে এবার কী ঘটতে চলেছে। একবার কলেজে ওর উপর হামলে পড়েছিল এক সহপাঠী। সেবার ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে পালাতে পারে। কিন্তু এবার কী পারবে? উপুড় হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, ধড়মড় করে চিত হলো স্মৃতি, মেঝে থেকে এক মুঠো বালি তুলে নিল।

ঝড়ের মত এল গার্ড, লাথি দিল স্মৃতির ডান মুঠো লক্ষ্য করে। ঝটকা খেয়ে খুলে গেল মুঠো। অবশ হয়ে গেল বাহু। একমাত্র অস্ত্র হারিয়ে বসেছে স্মৃতি। আরবিতে কী যেন বলল তরুণ, তারপর শেয়ালের ডাকের মত করে হাসতে শুরু করল।

হাঁ করল স্মৃতি, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। কিন্তু সে সুযোগও পেল না, ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে নেমে এল তরুণ। নোংরা হাতে চেপে ধরেছে নাক-মুখ। অন্য হাতে খামচে ধরেছে বাম স্তন। ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইল স্মৃতি, কিন্তু বুকের উপর ওজন ওকে উঠতে দিল না। ঘ্যাঁচ করে লোকটার আঙুলে কামড় দিতে চাইল। পাগল হয়ে উঠেছে মুক্তি পাওয়ার জন্য।

কিন্তু তরুণ গার্ড ঠেসে ধরেছে ওকে মেঝের সঙ্গে। শ্বাস নিতে পারছে না স্মৃতি, লোকটা ওর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় ফুসফুসে ব্যথা পেয়েছে। তা ছাড়া, লোকটা এক হাতে ওর নাক-মুখ চেপে ধরেছে! চরকির মত ঘুরছে মাথা। আর কয়েক সেকেণ্ড মুক্তি পেতে চাইল স্মৃতি, তারপর সমস্ত শক্তি হারিয়ে বসল। জ্ঞান হারাতে শুরু করেছে। টের পেল এক হাতে ওর কাপড় টেনে খুলছে লোকটা। চোখের সামনে কালো হয়ে এল ছায়াটা।

তারপর কটাস্ করে জোর আওয়াজ শুনল। মনে হলো ফেটে গেল কোনও গাছের শুকনো ডাল। এখন আবার শ্বাস নিতে পারছে। দৃষ্টি পরিষ্কার হতেই দেখতে পেল এক লোকের হাত সরে গেল গার্ডের ঘাড় থেকে। স্মৃতির উপর থেকে সরিয়ে নেয়া হলো তরুণ গার্ডের দেহ। ফিরে এল দীর্ঘ লোকটা, স্মৃতিকে উঠিয়ে বসিয়ে দিল। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে বেচারি। ধর্ষক গার্ড একটু দূরে পড়ে আছে, মোটেই নড়ছে না। চোখদুটো খোলা, তবে আর মরা মাছের মত চেয়ে নেই। মৃত্যু যেন তাকে এক ধরনের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে!

বাবুর্চির কাছ থেকে খাবার নেয়ার সময় যে গার্ড ওর হয়ে তর্ক করেছিল, সে হাঁটু গেড়ে বসে আছে পাশে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল স্মৃতি। মানুষটা কীভাবে খালি হাতে ঘাড় ভাঙল তরুণ গার্ডের!

নরম স্বরে কথা বলল লোকটা। স্মৃতির বুঝতে এক সেকেণ্ড লাগল মানুষটা পরিষ্কার বাংলা বলছে। 'আপনি এখন নিরাপদ। আর কখনও আপনাকে এ জ্বালাবে না।'

'কে? কে আপনি?' জানতে চাইল স্মৃতি।

মুখ থেকে কাফিয়ে সরিয়ে নিল লোকটা। মুখের ত্বক শ্যামলা। খাড়া নাক। ঠোঁটে মৃদু হাসি। চোখের মণি দুটো দুই রঙের। একটা কুচকুচে কালো, অপরটা সবুজ। দু'চোখে আশ্চর্য

এক মায়া।

'আমার নাম মাসুদ রানা। বাংলাদেশ থেকে এসেছি। জলদি সামলে নিন। বাঁচতে চাইলে এখান থেকে পালাতে হবে এখুনি।'

কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল স্মৃতি। ভাবছে, এই অদ্ভুত সুপুরুষের সঙ্গে পালাতে পারলে খুশি হবে যে-কোনও মেয়ে!

'আপনি কেন আমাকে... ঠিক বুঝতে পারছি না...' থমকে গিয়ে চেয়ে রইল স্মৃতি।

দু'হাত ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল যুবক, 'এখন কিচ্ছু বোঝার দরকার নেই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন।'

চাঁদের আলোয় মস্ত উপত্যকা পেরুনো কঠিন নয়। গার্ডদের উপর নির্দেশ রয়েছে, বন্দিদেরকে আটকে রাখতে হবে এই কারাগারে। কিন্তু যাদের পরনে গার্ডদের পোশাক, তাদের ব্যাপারে কড়া কোনও বিধি-নিষেধ নেই।

গত ভোরে নামাজের পর গার্ডদের নাস্তার টেবিলে রানাকে জিজ্ঞাসবাদ করা হয়েছে। উত্তরে ও বলেছে, অবস্ট্যাকল কোর্সে ফেল করেছে বলে ওকে শাস্তি হিসাবে অন্য ক্যাম্প থেকে পাঠানো হয়েছে। যে অফিসার জেরা করেছে, রানার জবাব তার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়েছে। এরপর আর কিছু বলেনি।

পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে রানা, আর সব আরবের মতই পরনে ডেজার্ট ফেটিগ। মুখের অর্ধেক ঢাকা কাফিয়ে দিয়ে। খুব সাবধানে চলাফেরা করেছে। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পর শরীরে টনটনে ব্যথা ছিল, সেটাকে পাত্তা দেয়নি।

পুরো সকাল চারপাশ ঘুরে দেখেছে। তবে গার্ডদের কাছ থেকে বেশি দূরে যায়নি। কারও মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। বুঝতে দেরি হয়নি, এটা সত্যিই বন্দিশালা। এখানে গায়ের জোরে মানুষগুলোকে খাটানো হচ্ছে। তাদের শারীরিক অবস্থা

থেকে মনে হয় বহুদিন ধরে বন্দি, অথবা যখন এসেছে তার আগে থেকেই দুর্বল ছিল। শেষটা হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। প্রচুর কাজ চলছে খনিতে, এখন যে-কোনও দিন শুরু হবে উৎপাদন।

তবে এখানে কয়েক ঘণ্টা থাকবার পর রানা বুঝেছে, এরা কয়লা উৎপাদনের জন্য কাজ করছে না। উপত্যকার নীচের দিকে যেসব গর্ত খোঁড়া হয়েছে, সেগুলো খননের ভিতর দক্ষতা নেই। এটা করবে না কোনও মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। রানা ধারণা করেছে, খনন শুরু করবার মূল কারণ লোকগুলোকে খাটিয়ে ক্লান্ত করা। প্রচণ্ড পরিশ্রম শেষে সামান্য খাবার পেলেই ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবে তারা। এদেরকে যে পাঠিয়েছে, সে চাইছে এরা এখনই মারা না পড়ুক।

রানা জানে না এ পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী কেমন থাকতে পারেন। তবে ওর বিশ্বাস, তিনি মারা যাননি। মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন। উপর থেকে নির্দেশ এলেই তাঁকে মরতে হবে।

গার্ডদের কথা শুনে এবং চারপাশের আবহ থেকে রানা বুঝে নিয়েছে, এখানে কেউ টুঁ শব্দ করে না ক্যাম্পের প্রধান সম্পর্কে। ক্যাম্পের স্টাফরা এসেছে আরব দুনিয়ার নানান জায়গা থেকে। মরোক্কোর বস্তিতে বড় হওয়া লোক থেকে শুরু করে সৌদি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা লোকও রয়েছে। টেরোরিস্টদের উচ্চারণ থেকে বোঝা যায় এরা এসেছে মধ্য-প্রাচ্যের প্রতি কোণ থেকে।

দুপুরের আগে একবার কমাণ্ড তাঁবুর পাশে গিয়েছিল রানা। তখন কোনও গার্ডের সঙ্গে কথা বলছিল কমাণ্ডার, অথবা রেডিওতে আলাপ চলছিল। এ-ও হতে পারে কথা হচ্ছিল স্যাটালাইট ফোনে। সঙ্গে সঙ্গে বুটের ফিতা বাঁধবার ভঙ্গি নিয়ে বসে পড়েছিল রানা। তাঁবুর সামনে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল গার্ড। বন্ধ ছিল তাঁবুর ফ্ল্যাপ, তবে ওখানেই শোনা গেল ইউনুস আল-

কবিরের নাম। আর দেরি করেনি রানা, গার্ড কিছু সন্দেহ করবার আগেই রওনা হয়ে গেছে।

দুপুরের খাবার দেয়ার সময় রানা বুঝে নিয়েছে, সব বন্দি আরব নয়, তাদের ভিতর দেখতে পেয়েছে বিসিআই-এর সবুর রহমানকে! প্রচণ্ড কড়া রোদে আরও কালো হয়ে গেছে সে। তারপর গার্ডদের একজন হঠাৎ আঘাত হানল এক মেয়ের মাথার উপর। সে মেয়ে আরব হতে পারে না। আরব বা অন্য কোনও দেশের মেয়ে ওই মমতাময় মায়াবী চোখ কোথায় পাবে? সন্দেহ নেই ওই মেয়ে বাঙালি। তবে চুলগুলো ছেঁটে ফেলেছে, মাথা ঢেকেছে স্কার্ফ দিয়ে।

এরপর থেকে মেয়েটার উপর চোখ রেখেছে ও। একবারও সুযোগ মেলেনি সবুর রহমান বা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলবার। তারপর মেয়েটির উপর প্রতিশোধ নিতে এল সেই তরুণ গার্ড। তার আগে মেয়েটিকে আঘাত করায় গার্ডদের ক্যাপ্টেন কড়া রোদের ভিতর তাকে পনেরো মিনিট পিটি করায়।

মেয়েটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার পর রওনা হয় রানা, দু' মিনিট পর পৌঁছে যায় ছাউনির ভিতর। ততক্ষণে কোমরে গোঁজা ওয়ালথার বের করেছে, তবে ওটা ব্যবহার করেনি। ওর সঙ্গে সাইলেন্সার নেই। ধরা পড়বার ঝুঁকি না নিয়ে আবারও রেখে দিয়েছে পিস্তল। খপ্ করে একহাতে চুল আর অপর হাতে চিবুক ধরেছে ছোকরার, প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে মটকে দিয়েছে ঘাড়।

'আসলে আপনার সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই আমার,' বলল স্মৃতি।

'বেশ, চলুন তা হলে।'

'কিন্তু... আপনার দুই চোখের রঙ দু'রকম কেন?' প্রশ্নটা না করে পারল না স্মৃতি।

'তাই নাকি?' হাসল। বুঝতে পেরেছে একটা কণ্ট্যাক্ট লেন্স

খসে চলে গেছে পাহাড়ি পাথর ঢলের সঙ্গে। বাকিটাও খুলে ফেলে দিল। 'এইবার এক রকম হয়েছে? চলুন এবার।'

কমপাউণ্ড থেকে বেশ দূরে ছাউনি। সরাসরি এদিকে চাইবে না গার্ডরা। বিশেষ করে এখন, তারা জানে কী ঘটছে ছাউনির ভিতর। স্মৃতিকে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা, দেয়ালের পাশ দিয়ে পৌঁছে গেল ছোট এক টিলার গোড়ায়। পাঁচ মিনিট পর চূড়া টপকে গেল ওরা, এক ফুট নেমে শুয়ে পড়ল তপ্ত পাথরের উপর। অপেক্ষা করছে। সাবধানে ক্যাম্পের দিকে চাইল রানা। মনে হলো না কেউ দেখতে পেয়েছে ওদেরকে।

নিয়ম মেনে কাজ চলছে ওখানে।

কিছুক্ষণ পেরুল, তারপর রানার মনে হলো এবার রওনা হওয়া যায়। স্মৃতিকে নিয়ে নামতে শুরু করল, চলেছে ওরা খোলা মরুভূমির দিকে। যত দ্রুত সম্ভব জঙ্গিদের ট্রেইনিং ক্যাম্প পিছনে ফেলতে চাইছে। হারিয়ে যেতে হবে রুক্ষ মরুভূমির ভিতর।

রানা আঁচ করছে এক ঘণ্টার ভিতর কেউ খুঁজবে না তরুণ গার্ডকে। পরে যখন লাশ পাবে, তারা বন্দিদের মাথা গুণবে। খুঁজবে এমন কোনও বন্দিকে যে খালি হাতে তরুণ গার্ডের ঘাড় মটকাতে পারে। মাথা গোনার পর দেখবে বন্দি কমেনি। জঙ্গিরা দ্বিধার ভিতর পড়বে, কিন্তু তখনই প্যাট্রল পাঠাবে না।

একবার ক্যাম্প থেকে সরতে পারলে আর ধাওয়া খাওয়া নিয়ে ভাববে না রানা। দুপুরে দেখেছে পলাতক বন্দির কপালে কী ঘটেছে। গার্ডরা প্রথমেই তাকে খুঁজতে যায়নি। মরুভূমিতে বন্দিকে হারিয়ে যেতে দিয়েছে। বাকি কাজ করেছে নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর মরুভূমি। লোকগুলো যখন আকাশে শকুনের দেখা পেয়েছে, ধীরে সুস্থে গেছে লাশ আনতে।

একদিন বা দু'দিন পর একটা গাড়ি পাঠাবে গার্ডদের ক্যাপ্টেন। তারা আকাশে চোখ রেখে খুঁজবে শকুন।

রানার ধারণা, ততক্ষণে মার্ভেলে পৌঁছে যাবে ও স্মৃতিকে নিয়ে। বাথটাবে শুয়ে থাকার সময় ঠোঁটে থাকবে সিগারেট, হাতে জরুরি রিপোর্ট। স্যাটালাইট ফোন খুইয়েছে, তাই ওর উরুতে থাকবে রক্তে ভেজা ব্যাণ্ডেজ।

চার

অচেনা অ্যালার্ম ডক্টর ফারার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। ওর কেবিনটা অফিস সংলগ্ন, খোলাই থাকে মাঝের দরজা। কমপিউটারের অ্যালার্মে ঘুম ভেঙেছে ওর। চট্ করে ওদিকে চাইল ফারা। মনিটরের স্ক্রিন জ্বলজ্বল করছে, ক্ষীররঙা আলো পড়েছে গোছানো ডেস্কের উপর, চকচক করছে চেয়ারের স্টিলের হাতল।

গায়ের উপর থেকে চাদর সরাল ফারা, চুলগুলোকে দু'হাতে গুছিয়ে খোঁপা করল। খুব একটা শখ নেই ওর জীবনে, তবে ঘুমানোর আগে সবসময় পরে সাদা স্যাটিনের নাইটগাউন। এখন ওটা দ্বিতীয় ত্বকের মত সেঁটে রয়েছে দেহে, কেউ চাইলে পরিষ্কার দেখবে প্রতিটি রমণীয় ভাঁজ ও বাঁক। ফারা আগেই জানত আজ রাতে হঠাৎ ইমার্জেন্সি কল আসতে পারে। সাধারণত এসব সময়ে ঘুমাতে যায় বড় টি-শার্ট পরে। দেরি না করে গাউনের উপর টি-শার্ট পরে নিল ফারা, দুধ সাদা নরম পা দুটো গলিয়ে দিল স্যাটিন চটির ভিতর। যে-কোনও সময় অপারেশন থিয়েটারে ডাক পড়তে পারে, তা-ই ওটা সবসময় পরিষ্কার থাকে।

কেবিন পেরিয়ে কমপিউটারের সামনে থামল ফারা, দ্রুত

হাতে জ্বেলে দিল ডেস্কের সঙ্গে লাগানো বাতি। তার আগেই জানা হয়ে গেছে ওই অ্যালার্ম কী হতে পারে। মার্ভেলের সবার উরুতে যে বায়োমেট্রিক ট্র্যাকিং চিপস রাখা হয়েছে, সেগুলোর একটা থেমে গেছে। এসব ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের অ্যালার্ম বাজায় কমপিউটার। ওটা থেকে বোঝা যায় কী কারণে চিপস থেমেছে। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় থামতে শুরু করেছে ইলেকট্রিক চার্জের অভাবে। তবে এখন যে শব্দ কমপিউটার করছে, তা শুনে মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নামল ওর। তীক্ষ্ণ এই অ্যালার্মের অর্থ, যেভাবেই হোক থামিয়ে দেয়া হয়েছে চিপস, অথবা মারা গেছে মালিক।

কমপিউটার স্ক্রিনে পরিষ্কার ভাবে লেখা ফুটেছে।

মাসুদ রানার ট্র্যাকিং চিপস আর ট্র্যান্সমিট করছে না!

জিপিএস স্যাটালাইট চুপ হয়ে গেছে। মাউস দিয়ে স্ক্রল করল ফারা, দেখতে চাইছে গত কয়েক ঘণ্টায় কোথায় ছিল রানা। টেরোরিস্ট ক্যাম্প ও পুরনো খনি থেকে অনেক সরেছে সে, চলে গেছে দক্ষিণে মরুভূমির দিকে। প্রতি ঘণ্টায় চার মাইল করে হেঁটেছে। প্রায় পঁচিশ মাইল গেছে, তারপর দশ মিনিট আগে থেমেছে। এবং তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেছে চিপস।

ফোনের দিকে হাত বাড়াল ফারা, সোহেলকে জানাতে হবে। কিন্তু আবার থেমে গেল অ্যালার্ম। আরেকবার ট্র্যান্সমিট করল চিপস। রানা নড়ছে না দেখে দ্রুত হাতে কি বোর্ড টিপল ফারা, সিস্টেম ডায়াগনস্টিক চাইছে। ট্র্যাকিং চিপস এখনও নতুন টেকনোলজি, খুব একটা ভুল করে না, তবে যে-কোনও সময় কাজ করতে ব্যর্থ হতে পারে। সিস্টেম অনুযায়ী রানা ঊনচল্লিশ সেকেণ্ড আগে মারা গেছে, অথবা চিপস সরিয়ে নেয়া হয়েছে দেহ থেকে। তারপর আবারও দেহে বসানো হয়েছে চিপস, পাম্প করছে, ফলে অক্সিজেনেটেড রক্ত নতুন করে সার্কিট শেষ করে

ট্র্যান্সমিট করছে।

হঠাৎ করে যেভাবে অ্যালার্ম বন্ধ হয়েছে, ঠিক সেভাবেই আবারও বাজতে শুরু করল। ত্রিশ সেকেণ্ড এভাবেই চলল, তারপর আবারও থেমে গেল অ্যালার্ম। বার কয়েক একই ঘটনা ঘটল। মনে হলো নষ্ট হয়ে গেছে চিপস।

ব্লিপ, *ব্লিপ ব্লিপ*। ব্লিপ, ব্লিপ ব্লিপ। ব্লিপ, *ব্লিপ ব্লিপ*।

বেতালা সুরে একই রকম চলছে চিপস। হঠাৎ শব্দগুলোর ভিতর একটা প্যাটার্ন খেয়াল করল ফারা। নিশ্চিত হয়ে নিল ওর কমপিউটার রানার চিপস থেকে টেলিমেট্রি রেকর্ড করছে, তারপর দ্রুত হাতে চালু করল ইণ্টারনেট কানেকশন। বুঝতে চাইছে ওর সন্দেহ ঠিক কি না। প্রায় এক মিনিট পর প্রথম শব্দগুলোর সঙ্কেত ডিসাইফার করতে পারল।

ঘুম... থেকে... ওঠো...

ফারা... ঘুম... থেকে...

চিপসের মাঝের সময়টাকে ব্যবহার করছে রানা, যেভাবেই হোক, বার্তা পাঠাচ্ছে পুরনো আমলের মোর্স কোডে!

'মাসুদ রানা, ব্যাটা!' আদর ভরা কণ্ঠে বলে উঠল ফারা। মনে মনে প্রশংসা করছে।

তারপর তারস্বরে বাজতে লাগল অ্যালার্ম। আর থামছে না।

দ্রুত ফোনের রিসিভার তুলতে গিয়ে কলমদানি ফেলে দিল ফারা, সেদিকে না চেয়ে কল দিল সোহেলকে।

জঙ্গিদের ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে প্রথম চার মাইল হেঁটেছে রানা ও স্মৃতি, তারপর পেয়েছে পছন্দমত আশ্রয়। ওখানে সূর্যের কড়া রোদ থেকে আড়ালে থাকতে পারবে। রানা ঠিক করেছে স্মৃতিকে নিয়ে ওখানেই দিনটা পার করবে, তারপর সন্ধ্যা নেমে এলে বেরুবে খোলা মরুভূমিতে। মেয়েটিকে বলেছে, চাইলে সে ঘুমাতে

পারে। নিজে ফিরবে ক্যাম্পের দিকে। তবে এক মাইল যাওয়ার পর নিশ্চিত হয়েছে, বাতাসের চাপড়ে হারিয়ে গেছে ওদের পায়ের ছাপ। তখন মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছে। মুসলিমরা সাধারণত কুকুর রাখে না সঙ্গে। এক্ষেত্রে তা ঘটলে কারও সাধ্য নেই অনুসরণ করে। আপাতত ওরা নিরাপদ।

সন্ধ্যার পর রওনা হয়েছে ওরা। রানার একমাত্র উদ্দেশ্য ক্যাম্প পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া। ওর জানা আছে একবার থামলে পরের বার দ্রুত হাঁটতে পারবে না। আড়ষ্ট হয়ে আসছে মাংসপেশি। তার চেয়ে বড় সমস্যা অন্যখানে। ভোরের পর ওদেরকে খুঁজে বের করবে শকুনগুলো, খাবারের চরম সঙ্কটে বাজপড়া পাখিগুলো দিনের পর দিন অনুসরণ করবে, মাথার উপর ঘুরবে। ওটাই গার্ডদেরকে বুঝিয়ে দেবে, এই দেখো, কোথায় পলাতকরা। টেরোরিস্টরা যদি প্যাট্রল পাঠায়, বা আকাশে তোলে কপ্টার, সেক্ষেত্রে খুব দ্রুত ধরা পড়বে ওরা।

আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে। মনে হয়েছে অন্য বন্দিদের তুলনায় স্মৃতি যথেষ্ট সুস্থ; তবে রানার জানা নেই কতক্ষণ টিকবে সে। ক্যাম্পে আগেই দুটো ক্যান্টিন জোগাড় করে পানি ভরে রেখেছিল রানা, ও-দুটো থেকে যথেষ্ট পানি দিয়েছে স্মৃতিকে। কিন্তু তাতে মেয়েটির ডিহাইড্রেশন কমেনি।

রাত তিনটের দিকে রানা টের পেল অতি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে স্মৃতি। হয়তো আরও এক মাইল যেতে পারবে, তবে তার কোনও প্রয়োজন নেই। যথেষ্ট দূরে সরে এসেছে ওরা। বেচারিকে আর কষ্ট না দিলেও চলে। এবার যোগাযোগ করতে হবে মার্ভেল টিমের সঙ্গে।

এখানে পাথুরে এক টিবির উপর উঠেছে ওরা। উপর থেকে বহু দূর চোখ চলে। নীচ থেকে দেখা যায় না, চূড়ার কাছে রয়েছে গামলার মত একটা জায়গা। বড় একটা পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে

বসল রানা। স্মৃতির মনোযোগ সরিয়ে রাখতে চাইছে, 'খুলে বলুন তো কী ধরনের খনন করেছেন?'

ক্যাম্প পিছনে ফেলতে হনহন করে হেঁটেছে ওরা। স্মৃতির সঙ্গে আলাপের সময় হয়নি। দু'জন শুধু জানে পরস্পরের নাম।

'ব্যাপারটা ছিল খুব হতাশাজনক,' ক্যান্টিনের মুখ খুলে চুমুক দিল স্মৃতি। খুব তৃষ্ণা পেয়েছে, তবে একটু একটু করে পান করছে। ক্যান্টিনের পানি ফুরিয়ে গেলে বিপদে পড়তে পারে। 'একটা চিঠিতে লেখা ছিল, সত্যিকারের ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ আছে এক গুহার ভিতর। অনেক খুঁজেছি আমরা, কিন্তু কপাল মন্দ, কিছুই পাইনি। ওদিকের জিওগ্রাফি অন্যরকম। ওখানে কোনও গুহা থাকার কথা নয়।'

'কাজেই ধারণা করছেন ভুল হিসাব কষেছে জেফ মার্টেল। অর্থাৎ আপনারা খুঁজেছেন ভিন্ন নদী খাতে।' স্মৃতির ভাবনাকে এগিয়ে দিয়েছে রানা, নিজে খুলতে শুরু করেছে প্যান্ট।

কৌতূহল নিয়ে চাইল স্মৃতি। লোকটা করছে কী? তারপর ওর মনে পড়ল কথা জুগিয়ে দিয়েছে রানা। কাজেই বলল, 'সম্ভবত ইউনুস আল-কবির মারা যাওয়ার পর চলে যায় জেফ মার্টেল। আর তারপর আবারও ওই গুহার ভিতর ঢোকে জলদস্যুরা। লুটপাট করে, যা নিতে পারেনি, ধ্বংস করে দেয়।'

'এর সম্ভাবনা খুবই কম,' দ্বিমত প্রকাশ করল রানা। বুটের খাপ থেকে থ্রোয়িং নাইফ বের করেছে। দেখলে মনে হয় সার্জিকাল স্টিল, তবে ক্ষুরের মত ধারালো এবং খুব ব্যালেন্সড। ওটা দিয়ে তিরিশ ফুট দূর থেকেও লক্ষ্যভেদ করতে পারে রানা। নিজের কথার খেই ধরল রানা, 'আপনি আগে বলেছেন জলদস্যুরা অন্ধের মত ভালবাসত ইউনুস আল-কবিরকে, শ্রদ্ধা করত। এসব ক্ষেত্রে প্রিয় নেতা মারা গেলে ভালবাসা আরও বাড়ে। সাধারণত কোনও লোকের কবর নতুন করে খুঁড়তে যায় না মুসলিমরা।'

'তা ঠিক।'

'ভক্তরা যদি জাহাজের কথা এক জেনারেশন গোপন রেখে থাকে, তা হঁলে ধরে নিতে পারেন ওটা এখনও আগের মতই আছে।'

'কিন্তু আমরা যেখানে খুঁজেছি সেখানে কিছু নেই।' চাঁদের আলোয় আস্তে করে মাথা নাড়ল স্মৃতি। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল, 'আমরা কি সবুর রহমানকে উদ্ধার করতে পারি?'

মেয়েটার দিকে চাইল রানা। 'আপনাকে হতাশ বা উৎসাহিত করছি না। আমাদের হাতে অন্য কাজ রয়েছে। তবে সে কাজ শেষ হলে ফিরব।' বলল না, সবুর রহমান বিসিআইয়ের ট্রেইনিং পাওয়া এজেন্ট, নিজের দেখভাল ভালই পারবে।

'আপনারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিমান খুঁজছেন, তাই না?' বলল স্মৃতি। 'আমরা ওটাকে নামতে দেখেছি। আর সে কারণেই সবুর রহমান, আসাদ চৌধুরি আর আমি সীমান্ত পার হই। আমরা ওটাকে খুঁজছিলাম।'

'সেই সময় ধরা পড়ে বন্দি হয়েছেন।'

'একটা প্যাট্রল আমাদের ধরে ফেলে। ওরা... ওরা আসাদ চৌধুরিকে মেরে ফেলে। বেচারা আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল।'

চাঁদের আলোয় রানা দেখল, মেয়েটার গাল বেয়ে নামছে অশ্রু। কিছু মেয়ে আশা করে এরকম অবস্থায় তাকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়া হবে, তবে স্মৃতি সে ধারার মেয়ে নয়। চিবুক উঁচু করে দূরে চেয়ে আছে। সান্ত্বনা চাই না ওর, প্রয়োজনে সাহায্য নেবে, এবং বদলে নিজের সাধ্য মত উপকার করবে। স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা খানিক বাড়ল রানার।

'সামনে জরুরি শান্তি মহাসম্মেলন,' নরম স্বরে বলল রানা। 'ধরে নেয়া যায় সেখানে প্রধানমন্ত্রী থাকলে কনফারেন্স সফল

হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বাড়বে।'

'আমিও তা-ই ধারণা করেছি। আর সেজন্য যখন দূতাবাস থেকে ডাক পেলাম, ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ খুঁজে বের করতে রাজি হয়ে গেলাম। ধারণা করা হয় ওই গুহার ভিতর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া। সেসব পাওয়া গেলে সম্মেলন সফল হতে পারে।'

'তার মানে বিষয়টা আর্কিওলজি নয়?'

মাথা নাড়ল স্মৃতি।

'প্রথম থেকে বলুন, আমি হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

মনের ভিতর সব গুছিয়ে নিতে এক মিনিট লাগল স্মৃতির। সেই ওয়াশিংটনে মিটিং থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সীমান্তের কাছে বন্দি হওয়া, সবই খুলে বলল।

ওর কথা শেষ হতে রানা বলল, 'আগেও নাম শুনেছি আহমেদ শরীফের। আমার এক ইতিহাসবিদ বন্ধু ওর প্রশংসা করেছিল। এ ছেলে নাকি কিছুদিনের ভিতর পৃথিবীর বিখ্যাত মেরিটাইম রিসার্চার হবে। আহমেদ যদি বলে থাকে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ মরুভূমিতে, খুব সম্ভব ওখানেই আছে ওটা।'

'হতে পারে। আগে কখনও শরীফ সাহেবের নাম শুনিনি। তবে উনি চেয়েছেন বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে আগ্রহী হোক।'

প্রসঙ্গ পাল্টাল রানা, 'বলতে পারেন অন্য বন্দিরা কোথা থেকে এসেছে?'

'জানি না,' বলল স্মৃতি। 'সবুর হয়তো বলতে পারতেন। উনি আরবি বলতে পারেন। খাওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময়ে পুরুষদের ধারেকাছে যাইনি। কোনও মেয়ের সঙ্গেও কথা হয়নি। ওরা কেউ ইংরেজি বা স্প্যানিশ বলে না।'

'এ আরেক রহস্য,' বিড়বিড় করে বলল রানা। বাকল খুলে প্যান্ট নামিয়ে দিয়েছে। বেরিয়ে এসেছে উরুর উপর অংশ। 'ঠিক

আছে, এবার আমার দলকে ডাকতে হবে।'

'কী করছেন?' অবাক হয়ে বলল স্মৃতি। দেখছে রানার উরুর উপর এক ইঞ্চি দীর্ঘ একটা কাটা চিহ্ন।

জবাব দিল না রানা, শান্ত ভাবে ছুরি বসাল পুরনো ক্ষতের উপর, চিরচির করে কেটে ফেলল মাংস। ক্ষত থেকে ছিটকে বেরুল তাজা রক্ত।

'এ কী করছেন?' চমকে গেছে স্মৃতি।

'আমার পায়ে একটা ট্র্যাকিং ডিভাইস আছে,' বলল রানা। 'ওটা দিয়ে সিগনাল দেব। আমার সেল ফোন পড়ে গেছে পকেট থেকে। খুব বেশি দেরি হবে না আমার লোকদের চলে আসতে।'

কাটা মাংসের ভিতর দুই আঙুল ভরল রানা, কী যেন খুঁজছে। চোখ নির্বিকার, তবে চোয়াল শক্ত। যেন ভুলে গেছে ব্যথা বলে কিছু আছে। তিন সেকেণ্ড পর হাত সরিয়ে নিল। কালো প্লাস্টিকের ডিভাইস পেয়ে গেছে। জিনিসটা দেখতে কম পয়সার ডিজিটাল ঘড়ির মত। শার্টে মুছে নিল চিপসের নীচের অংশ। আন্দাজ তিরিশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, তারপর চিপসটা বসিয়ে দিল কাটা অংশে। তিরতির করে বেরুচ্ছে রক্ত। একই কাজ দ্বিতীয়বার করল রানা। তারপর আবারও। এবার আগের চেয়ে দ্রুত কাজটা সারছে। রক্তে ভিজছে চিপস, আবার সরিয়ে নিচ্ছে। দু'হাত নড়ছে ওর।

'ওঠো ফারা,' ট্র্যান্সমিট করবার সময় মুখে প্রতিটা শব্দ বলছে রানা।

এদিকে মরুভূমি সমতল থেকে উঠে এসেছে কোনও বদ জিন, উঠে গেছে চূড়ার কাছে। রানা ও স্মৃতি গামলার ভিতর, কিন্তু এক পাশের পাথর থেকে ঝাঁপ দিল সে। পিছন থেকে পাখির মত নেমে এল রানার বুকে। ধাক্কা খেয়ে চমকে গেল রানা, অন্ধকারে হাত থেকে পড়ে গেল পিচ্ছিল ট্র্যান্সমিটার। হাড়ের মত

শুকনো দুটো হাত চেপে ধরল রানার কণ্ঠ। গেঁথে বসছে তীক্ষ্ণ নখগুলো!

রক্তাক্ত ঊরু থেকে প্যান্ট নামিয়ে দিয়েছে রানা হাঁটুর কাছে, বেকায়দা অবস্থায় পড়ল। নোংরা জিন কিঁচকিঁচ করে কী যেন বলল, দুই হাঁটু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইল রানার পাঁজর। বিড়াল যেভাবে শিকার ধরে, ঠিক সেভাবে পা দুটো খামচি দিচ্ছে রানার দেহে। পাথরের মত শক্ত নখগুলো চিরে দিতে চাইছে কণ্ঠ।

রানার প্যান্টের সঙ্গে নেমে গেছে ওয়ালথার, ওটা আছে এখন ওর কোমরের নীচে। ছোরাটাও হাতের বাইরে। ঝট্ করে মাথা পিছনে নিল রানা, পরক্ষণে সামনে বাড়াল। ওর কপাল ঠাস করে নামল লোকটার নাকের উপর। আঘাতে জোর নেই, হাড় ভাঙল না, তবে ছিটকে বেরুল রক্ত। চমকে গেছে আক্রমণকারী, কাতরে উঠল ব্যথায়।

বুকের উপর চড়ে বসেছে লোকটা, সোজা হয়ে বসে তাকে নামাতে চাইল রানা। ঝটকা খেয়ে বুক থেকে পিছলে পড়ল শত্রু। একই সঙ্গে আধবসা হলো ওরা। দু'জনের ভিতর রানা দ্রুত, ওর ডান হাতি ঘুসি পড়ল লোকটার বুকের উপর। ছিটকে পড়ল সে। গামলার দেয়ালে প্রচণ্ড বাড়ি খেল মাথা। ততক্ষণে উবু হয়ে দাঁড়িয়ে ছোরা তুলে নিয়েছে রানা। দুটো বিষয় খেয়াল করেছে। প্রথম কথা, আক্রমণকারী অস্বাভাবিক হালকা। দ্বিতীয়ত, এর যে ধরনের ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক, এমনই দেখেছে টেরোরিস্ট ক্যাম্পে বন্দিদের পরনে। মেঝের উপর নিথর শত্রু, তবে রানার হাত থেকে ছিটকে বেরুচ্ছে থ্রোয়িং নাইফ। শেষ মুহূর্তে সামান্য অ্যাঙ্গেল বদলে দিল রানা। লোকটার মাথার পাশে নরম স্যাণ্ডস্টোনে গাঁথল ছোরা।

সাত সেকেণ্ড হলো আক্রান্ত হয়েছে রানা। এ সময়ে ওকে সাবধান করতে দু'হাত উপরে তুলেছে স্মৃতি, তবে কিছু বলতে

পারেনি। এবার ফোঁস করে শ্বাস ফেলল।

'হায় খোদা, সবুর বলেন, ক' দিন আগে ওখান থেকে দুই বন্দি পালিয়েছিল। তাদের একজনের লাশ ফেরত নিয়ে গেছে গার্ডরা।'

রানা আঁচ করল, বিশ মাইলের ভিতর ওরা ছাড়া একমাত্র মানুষ এ। ক্যাম্প পিছনে ফেলে সরাসরি এগিয়েছে ওরা, বেছে নিয়েছে সবচেয়ে সহজ জমিন। ঠিক একই কাজ করেছে এই লোকও। ওদের মত দ্রুত চলতে পারেনি দুর্বলতার কারণে। এ পর্যন্ত যে আসতে পেরেছে, তা-ই আশ্চর্য। এই ঢিবি বেছে নিয়েছে অবজার্ভেশন পোস্ট হিসাবে। দেখেছে ওরা এদিকে আসছে। তখনই লুকিয়ে পড়েছে। তারপর হামলা করেছে রানার দুর্বল মুহূর্তে।

বন্দির পাশে থামল রানা, হাত বাড়িয়ে দিল স্মৃতির দিকে। 'ক্যান্টিন দিন।'

গুঙিয়ে কী যেন বলল লোকটা।

স্মৃতির কাছ থেকে ক্যান্টিন নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। আরবিতে বলল, 'পান করুন। আমরা আপনার কোনও ক্ষতি করব না।'

ধুলো-ময়লায় লোকটার চেহারা চেনা কঠিন, তবে রানা আন্দাজ করল বয়স হবে ওর কাছাকাছিই। বড়সড় নাক, চওড়া কপাল। দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত থেকেছে। গাল দুটো চোয়ালের গর্তের ভিতর বসে গেছে। চোখে ভোঁতা দৃষ্টি। মরুভূমিতে একা এত দূরে এসেছে, বিপদ হতে পারে ভেবেও হামলা করেছে। আশা করা যায় সুস্থ হয়ে উঠবে।

'বন্ধু, আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন,' বলল রানা। 'আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব।'

'আপনি সৌদি,' ক্যান্টিনের অর্ধেক পানি শেষ করল সে।

'উচ্চারণ তা-ই বলে।'

'ঠিক তা নয়, তবে সত্যিকথা আরবি শিখেছি রিয়াদে। আমি আসলে বাংলাদেশি।'

'আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন। এবার হয়তো উদ্ধার পাব আমরা।'

'আমরা! মানে?'

পাঁচ

ট্র্যান্সমিট করবার পর আর যোগাযোগ করেনি রানা। তাই ওই কোঅর্ডিনেটস অনুযায়ী নিশাত, স্বর্ণা, নবীকে পাঠিয়েছে সোহেল। দু' ঘণ্টা কঠিন পথ পাড়ি দেয়ার পর ওরা পৌঁছে গেছে ওই এলাকায়।

অপারেশন্স সেণ্টারে অপেক্ষা করছে সোহেল। জাহাজের কমপিউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সব। এ মুহূর্তে অল্প কয়েকজন ডিউটিতে আছে। তবে অপারেশন্স সেণ্টারে সারাক্ষণ হাজির বারোজন পুরুষ ও নারী কমাণ্ডো। ভেণ্টের হিসহিস বাদ দিলে চারপাশে কোনও আওয়াজ নেই। হেলম-এ অপেক্ষা করছে ভিনসেণ্ট গগল। একটু পিছনে রায়হান। ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ নিজ চেয়ারে বসে গোঁফ মুচড়ে চলেছেন। ওটা থেকে বোঝা যায় তিনি বিচলিত। যে ভঙ্গিতে গোঁফ পাকানো চলছে, আর দুই ঘণ্টা পর ঠোঁটের উপর একটা রোম থাকবে না।

কিছুক্ষণ পরেই মেইন মনিটরে ধূসর হতে শুরু করবে রাতের

অন্ধকার, ভোর হতে খুব বেশি দেরি নেই। ছোট একটা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে সুন্দরীকে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে জ্বলজ্বলে একটা বিন্দু। রানার শেষ অবস্থান আর মাত্র এক মিলিমিটার দূরে।

ফোন বাজতেই হঠাৎ চমকে গেল সবাই। কমিউনিকেশন্স সেন্টার থেকে সোহেলের দিকে চাইল টেকনিশিয়ান।

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহেল। হেডসেট পরে নিল, মুখের সামনে মাইক্রোফোন। চেপে রেখেছে উদ্বেগ। কোনও ভাবেই রানাকে ঠাট্টা করতে দেবে না।

'সোহেল বলছি।'

'হ্যাঁ, সোহেল। আমি।'

ভারী কণ্ঠ শুনে চমকে গেল সোহেল। 'জী, স্যর!'

প্রায় ধমকে উঠলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান, 'রানা কোথায়? এখনও ওকে পাওয়া গেল না?'

'গেছে, স্যর। ওরই জন্যে অপেক্ষা করছি, এখনই যোগাযোগ করবে।' চট্ করে ঘড়ি দেখল সোহেল।

'কেমন আছে ও?' গলার উত্তাপ নেমে গেছে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 'নতুন কোনও খবর আছে?'

'নেই, স্যর। কিছু জানতে পারলেই জানাব।'

'বিসিআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছ না কেন!' আরও একটু নরম হলো কণ্ঠ, 'ও কতক্ষণ পর যোগাযোগ করবে?'

বুড়ো একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে, রানার প্রসঙ্গ ছাড়তে চাইছে না, খানিক হিংসা নিয়ে ভাবল সোহেল। 'আধ ঘণ্টার ভিতর ওর কল পাব আশা করছি, স্যর।'

'ওকে বোলো, লিবিয়ান সরকার জানিয়েছে, নাইট টাইম ট্রেইনিঙে তাদের এক ফাইটার জকি বিশেষ এক এলাকা দেখে। জায়গাটা লিবিয়া আর তিউনিশিয়ার বর্ডারে। লিবিয়ানরা প্যাট্রল পাঠায়। ওখানে টেরোরিস্টদের গোপন বেস ছিল। রাখা ছিল হিন্দ

হেলিকপ্টার। তবে সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে কেউ বাঁচেনি।'

'জী, স্যর। আমিই বলতাম আপনাকে। আমাদের টিমই হামলা করে ওখানে। ওটা মডিফায়েড হিন্দ ছিল। এয়ার টু এয়ার মিসাইল ব্যবহার করত। দক্ষ ছিল এপেক্স মিসাইলে।' সাহস করে জানতে চাইল সোহেল, 'স্যর, কপ্টার বা ক্যাম্প বিষয়ে কী বলছে লিবিয়ান সরকার?'

'বলছে প্রধান তাঁবুর নীচে চাপা পড়ে একটা কমপিউটার। জিনিসটা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।'

চুপ থাকল সোহেল। ওর মনে পড়ে গেছে নিশাত-স্বর্ণা এবং নবী বেশি খুঁজতে যায়নি। 'স্যর, কমপিউটারের ভিতর কী আছে?'

'ওই কপ্টার ছিল ইউনুস আল-কবিরের। ওরা লিবিয়ানদের নাকের ডগায় বসে চালু রেখেছে জঙ্গি ক্যাম্প। ডামি কোম্পানি গড়ে পুরনো এক কয়লার খনিও চালু করেছে।'

পরস্পরের দিকে চাইল সোহেল ও রায়হান। গত রাতে এই নিয়ে আলাপ করেছে ওরা।

ধমক খাওয়ার ভয় নিয়ে বলল সোহেল, 'স্যর, খবরটা আমরা কোথা থেকে পেলাম?'

'ত্রিপোলি থেকে। সরকারী এক এজেন্ট টাকার বিনিময়ে বিসিআইয়ের শাখা প্রধান শাকির হোসেনকে জানায়।'

'তার মানে জামাহিরিয়া সিকিউরিটি অর্গানাইযেশনের?'

'হ্যাঁ। সোর্স ঠিক আছে। জানিয়েছে লিবিয়া সরকার সত্যিই প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজছে। তাদের ভিতর ফাঁকিজুঁকি নেই।' চুপ হয়ে গেলেন রাহাত খান। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'তবে পুরো বিষয়টা চালাকি হতে পারে। আসলে হয়তো ষড়যন্ত্রে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে লিবিয়ান সরকার।'

তাঁর কথা শেষে নীরবতা নেমে এল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে

কথা বলে উঠল কমিউনিকেশন্স অফিসার, 'সুন্দরী থেকে ফোন এসেছে, সোহেল ভাই।'

ওভারহেড স্ক্রিনের দিকে চাইল সোহেল। ওই ট্রাকের বিন্দু এবং রানার অবস্থান মিশে গেছে। 'স্যর, এক সেকেণ্ড, বোধহয় যোগাযোগ করছে সুন্দরী।'

'অ্যাঁ? ...ও, আচ্ছা। কী বলে শোনো।'

হাতের ইশারা করল সোহেল। 'লাইন দাও।'

বোধহয় পিঠ-উঁচু চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন চিফ।

'কী রে!' ভেসে এল রানার কণ্ঠ। 'সব ঠিক তো?'

'স্যর লাইনে আছেন,' চাপা স্বরে জানিয়ে দিল সোহেল।

'রানা,' গুড়গুড় করে উঠল রাহাত খানের কণ্ঠ। 'ওই ক্যাম্পে ওরা কি জেএসও (জামহিরিয়া সিকিউরিটি অর্গানাইযেশন), না অন্য কোনও দল?'

'এখনও জানি না, স্যর।'

'মুশকিল হয়ে গেল।'

কৌতূহলী সবাই, তবে কোনও কথা বলল না।

দশ সেকেণ্ড পর বললেন রাহাত খান, 'লিবিয়ান সরকার ধারণা করছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যদি বেঁচে থাকেন, ওই ক্যাম্পে বন্দি হয়ে আছেন। দুই ঘণ্টা পর ওখানে হামলা করতে যাচ্ছে লিবিয়ান সেনাবাহিনী। ওদের এয়ার ফোর্স বেসে অপেক্ষা করছে শাকির। ওরা কপ্টারে করে যাবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। আরেকটা বিষয়, জঙ্গি ক্যাম্পের কমপিউটার থেকে তথ্য পাওয়া গেছে, হয়তো ধরা পড়বে ইউনুস আল-কবির। জানা গেছে হিন্দ এবং সব ইকুইপমেন্ট লিবিয়ার ভিতর ঢুকেছে এক হার্বার পাইলটের মাধ্যমে। লোকটার নাম হারিস জামান। লিবিয়ান সরকারের রেকর্ড অনুযায়ী ওই লোক পাঁচ বছর ধরে বন্দর কর্তৃপক্ষের হয়ে কাজ করছে। এর আগের কোনও তথ্য নেই। স্কুল রেকর্ড বা

এমপ্লয়মেন্ট রেকর্ড বলতে কিচ্ছু নেই। যেন আকাশ থেকে পড়েছে। লিবিয়ান সিক্রেট সার্ভিস ধারণা করছে, হারিস জামানই ইউনুস আল-কবির। এখন যে-কোনও সময়ে তাকে গ্রেফতার করা হবে।'

চট্ করে সোহেলের দিকে চাইল ভিনসেন্ট গগল। চোখে দুশ্চিন্তা। অপারেশন্স সেন্টারের সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্পে থাকতে পারেন, আবার না-ও থাকতে পারেন। কিন্তু রানারা আছে ক্যাম্প থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে। ওদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই যে লিবিয়ান অ্যাসল্ট শুরুর আগেই সরে যাবে। এদিকে মার্ভেল বন্দরে ভিড়বার পর থেকেই হারিস জামানকে অনুসরণ করছে কমাণ্ডো কাশেম বক্স এবং চায়নিজ সিক্রেট সার্ভিসের গ্যাং ফেং। ওরা লিবিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের হাতে ধরা পড়তে পারে। রানা রওনা হওয়ার আগেই নির্দেশ দেয়, হারিসের পিছু নিতে হবে, লোকটা যে-কোনও সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

এখন পর্যন্ত খবর যা মিলেছে, তাতে সে ত্রিপোলিতে চার উপ-পত্নী রেখেছে, তবে এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু করেনি। প্রথম রাতে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলির পর ধারণা করা হয়, ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় হারিস। তবে এখন সোহেল নিশ্চিত, প্রথম থেকেই লোকটা ওদেরকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছে।

ত্রিপোলির জামহারিয়া যদি হারিস জামানকে ধরতে চেষ্টা করে, জানা কথা, মস্ত বড় বিপদে পড়ে যাবে মার্ভেলের গ্যাং ফেং ও কাশেম।

'তোমাদের ট্যাকটিকাল সিনারিয়ো বদলে গেল,' মন্তব্য করলেন রাহাত খান।

'জী, স্যর,' সায় দিল রানা।

'ঠিক আছে, নতুন কিছু ঘটলে জানাবে।'

কেন যেন সোহেলের মনে হলো রাহাত খান সন্তুষ্ট। বোধহয় রানা সুস্থ আছে বলেই। খুট করে কেটে গেল লাইন।

সোহেল বলল, 'রানা, শোন...'

'না, শুনব না,' চট্ করে বলল রানা, 'তোর সঙ্গে আড়ি।'

'মস্ত ঝামেলার ভিতর পড়লাম আমরা।'

ী ধরনের?' সিরিয়াস হয়ে গেল রানা।

নলি তো লিবিয়ানরা দুই ঘণ্টার ভিতর ট্রেইনিং ক্যাম্পে হামলা করবে। ওদের ধারণা প্রধানমন্ত্রী ওখানে থাকতে পারেন। সার্চ, ডেস্ট্রয় অ্যাণ্ড রেসকিউ মিশন নিয়ে যাচ্ছে ওরা। এদিকে হারিস জামানকে গ্রেফতার করতে চাইছে। ধারণা করছে সে-ই ইউনুস আল-কবির।'

'খনির ব্যাপারে কিছু বলেছেন স্যর?' জানতে চাইল রানা।

'তেমন কিছু না। কেন?'

কোনও জবাব দিল না রানা। ওর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল সোহেল। আঁচ করল প্রিয় বন্ধু কঠিন কোনও সিদ্ধান্ত নিল।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল রানা। পরক্ষণে বলল, 'কাশেম আর গ্যাংকে সতর্ক করে দে।'

'এখন ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে রায়হান।'

'জঙ্গিদের ট্রেইনিং ক্যাম্পে দুই শ'র বেশি মানুষ বন্দি। তাদের সঙ্গে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে মারা পড়ছেন। ক্যাম্প সিকিউর করতে বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট নেবে লিবিয়ান ফোর্স, তার অনেক আগেই একটা গুলি খতম করতে পারে প্রধানমন্ত্রীকে। কিছু করতে হবে আমাদের।'

'কী করবি?'

'জানি না। ভাবছি ওদের মনোযোগ সরিয়ে নেব। ...তোরা কোথায়?'

'উপকূল থেকে আশি মাইল দূরে।'

'হাতে মাত্র দুই ঘণ্টা?'

'কম-বেশি তা-ই।'

'ঠিক আছে। গগলকে বল ইঞ্জিনিয়ারদের যেন পাত্তা না দেয়। ফুলস্পিডে চলুক মার্ভেলের ইঞ্জিন। সরাসরি তীরে চলে আয়। ক্যাপ্টেন আলম সিরাজকে জানিয়ে দে পনেরো মিনিটের নোটিশে আকাশে তুলতে হবে কপ্টার।'

'কোলিং স্টেশনের ডকে ভিড়ব,' বলল সোহেল। বেসুরো শোনাল কণ্ঠ, 'অপেক্ষা কর, রানা, দুই ঘণ্টার আগেই পৌঁছব।'

'হেলম থেকে বলছিঃ ইমার্জেন্সি পাওয়ার দিন,' গগলের চাঁছাছোলা কণ্ঠ শুনতে পেল রানা। 'অল অ্যাহেড ফ্ল্যাঙ্ক।'

সুন্দরীর পিছনের বেঞ্চ-সিটে পা ছড়িয়ে বসেছে রানা। ক্ষতটার পাশে লোকাল অ্যানেসথেটিক দিয়েছে স্বর্ণা। এখন সেলাই করছে। সামনের সিটের দিকে চাইল রানা। গাদাগাদি করে বসেছে লিবিয়ান বন্দি ও স্মৃতি। বন্দির নাম ফুয়াদ আহমেদ, এরইমধ্যে লবণের ট্যাবলেট ও পর্যাপ্ত পানি পেয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ, সোহেল, তোরা আয়,' বিড়বিড় করল রানা। 'আমরা সবাই তৈরি থাকব।'

ছয়

মাসুদ রানা হার্বার পাইলট হারিস জামানকে অনুসরণের নির্দেশ দেয়ায় ভড়কে যায়নি গ্যাং ফেং। পাত্তা দেয়নি লিবিয়ার

বেশিরভাগ লোক আরব, সহজেই ওর চিনা চেহারা চিনে রাখবে। ওকে ভরসা দিয়েছে মোফিজ বিল্লাহ্। কাশেম বক্স ও গ্যাং ফেং দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, টুরিস্ট হিসাবে লিবিয়া দেশটা ঘুরতে এসেছে। ওদেরকে দেয়া পাসপোর্টে তা-ই লেখা।

কাশেম ও গ্যাং পরস্পরের কাছে স্বীকার করবে না, তবে দু'জনই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। খুবই সন্দেহজনক চরিত্র হারিস জামান। কখন কোন্ দিক থেকে বিপদে ফেলবে কেউ জানে না।

অবশ্য কাউকে সন্দেহ করা আর তার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

কাশেমকে বলেছে গ্যাং, পৃথিবীতে এমন কোনও শহর নেই যেখানে চায়নিজ বসতি নেই, কাজেই ভাবতে হবে না। সহজে খুঁজে নেবে অপরাধী চক্রকে। ওদের হয়ে কাজ করবে তারাই।

প্রথম রাতে কাশেম যখন হারিস জামানকে অনুসরণ করছে, সেই অবসরে শহর ঘুরতে বেরিয়েছে গ্যাং, খুঁজে বের করেছে চায়নিজ বসতি। এতে সুবিধা হয়েছে। জানা গেছে লিবিয়া, বিশেষ করে ত্রিপোলিতে দ্রুত গড়ে উঠছে আবাসন শিল্প। হংকং ও শাংহাই থেকে আনা হয়েছে হাজার হাজার চায়নিজ মজুর। এদের জন্য গড়ে উঠেছে রেস্টুরেন্ট, বার, দোকান ও পতিতালয়। বড় শহরের মতই ত্রিপোলিতেও রয়েছে আইন-মানা ব্যবসায়ী ও বেআইনী চোরাকারবারীরা। শেষের এদেরকে দরকার গ্যাং ফেঙের। চায়না টাউনে এক ব্লক যাওয়ার আগেই নির্দিষ্ট গ্যাঙের সিম্বল দেখতে পেয়েছে। এবং ওই দলকে খুঁজে নিতে লেগেছে পাঁচ মিনিট। একটা ওয়্যারহাউসের হেভি ডিউটি দরজার উপর আঁকা ছিল চিহ্ন। ওয়্যারহাউসের নীচ তলায় কোনও জানালা নেই, দোতলায় এক সারি জানালা।

শাংহাইয়ের নির্দিষ্ট এক দলের কোড ব্যবহার করেছে ফেং। একবার টোকা ও তিনবার থাবা দিয়েছে দরজার উপর। ভোঁতা

আওয়াজ হয়েছে। বুঝেছে দরজাটা নিরেট লোহার তৈরি।

আধ মিনিট পর সামান্য খুলে গেছে দরজা, মাথা বের করেছে কিশোর এক ছেলে। ফেং জানে, দরজার ওপাশে অবস্থান নিয়েছে কমপক্ষে চারজন সশস্ত্র লোক।

ছেলেটা একটা কথাও বলেনি।

গ্যাং ফেং নিজেও চুপ থেকেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে শার্টের পিঠ উঁচু করে দেখিয়ে দিয়েছে শোল্ডার ব্লেডে আঁকা উল্কি।

বড় করে শ্বাস ফেলেছে ছেলেটা, ফেং টের পেয়েছে ওর পিঠের উপর বিদ্ধ হয়েছে কয়েকটা চোখ। ধীরে ধীরে শার্ট ঠিক করে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখেছে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওই দলের সদস্যদের দু'জন। হাতের পিস্তল নামিয়ে নিয়েছে তারা।

'কে আপনি?' ডানদিকের লোকটা জানতে চেয়েছে।

'বন্ধু,' জবাবে বলেছে ফেং।

'উল্কি কে দিয়েছে?' দ্বিতীয়জন প্রশ্ন করেছে।

যথেষ্ট বিরক্তি নিয়ে বলেছে ফেং, 'কেউ দেয়নি। ওটা অর্জন করেছি।'

পিঠে কালি দিয়ে আঁকা বিস্তারিত ঝাপসা উল্কি। ওখানে ড্রাগন লড়াই করছে এক গ্রিফিনের সঙ্গে। এটা পুরনো দল নীল ড্রাগন টং-এর সিম্বল। উনিশ শ' পঁচিশ সালে শাংহাইয়ের ডক দখল করবার জন্য বিরোধী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করে দলটা। এই উল্কি পায় শুধু সিনিয়র সদস্য বা দুঃসাহসী ফুট সোলজাররা। অন্য কেউ ব্যবহার করলে তাকে মেরে ফেলা হয়। যাদের শরীরে এই উল্কি থাকে তারা চায়নিজ আণ্ডারওয়ার্ল্ডের সম্মানিত মানুষ।

গ্যাং ফেং মনে মনে প্রার্থনা করেছে, এরা যেন ভাল করে উল্কি পরীক্ষা না করে। এই উল্কি মিলেছে চিনা কারাগারের বন্দিদের কাছ থেকে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ক্যাটালগ দেখে স্টেনসিল করে ছাপ ফেলেছে মোফিজ বিল্লাহ। ক্যাটালগে ছিল বেশির ভাগ

দলের উল্কি। সেরা দলের ছাপ বেছে নিয়েছে ফেং।

'এখানে কী কাজে এসেছেন?' প্রথম জন জানতে চাইল।

'এ বন্দরে এক লোক কাজ করে, তার কাছে টাকা পায় টং। আপনাদের কয়েকজনের সাহায্য চাই। চোখ রাখতে হবে তার উপর। আদায় করতে হবে টাকাগুলো।'

'আপনার সঙ্গে টাকা আছে?'

মোটেও জবাব দিল না ফেং। পৃথিবীতে এমন কোনও লোক নেই যে টাকা ছাড়া এ কাজ নেবে। 'চার থেকে পাঁচ দিনের কাজ। আট থেকে দশজন লাগবে। পাবে দশ হাজার ডলার।'

'ওটা এখানে ভাঙানো কঠিন। ইউরো দেবেন। দশ হাজার।'

তার মানে ডলারের শতকরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট বাড়তি চাইছে। আস্তে করে মাথা দোলাল ফেং, 'ঠিক আছে।'

এরপর কোনও সমস্যা হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টা হারিস জামানের পিছু নিয়েছে চায়নিজরা। টঙের ভাঙা হোটেলের এক ছারপোকা ভরা কামরায় উঠেছে ফেং ও কাশেম। প্রতি ছয় ঘণ্টা পর পর ডিসপোযেবল ফোনে যোগাযোগ রাখছে অনুসরণকারীরা। দু' দিন পেরুনোর আগেই হারিস জামানের গতিবিধির ছক জানা গেছে।

রাতের শিফটে কাজ করে সে। তবে কোনও জাহাজ ডকে না ভিড়লে ডিউটি ফাঁকি দেয়। এসব রাতে বন্দর থেকে খানিক দূরে এক অ্যাপার্টমেন্টে যায়। ওখানে রয়েছে তার এক উপপত্নী। সে মহিলা হারিসের অন্যান্য প্রেমিকার চেয়ে দেখতে অনেক খারাপ, তবে সবচেয়ে সহজে তাকে কাছে পাওয়া যায়।

কাজ শেষে ভোরে স্ত্রীর কাছে বাড়ি ফেরে হারিস। ছয় ঘণ্টা ঘুমায়, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সহকর্মীদের বাড়িতে যায়। ওখান থেকে চা-নাস্তার পর রওনা হয় উপপত্নীদের সঙ্গে দেখা করতে। যাদের কাজে নিয়েছে তাদের বলেছে ফেং, ওই মেয়েমানুষগুলোর নাম ও ঠিকানা জোগাড় করতে হবে। করেছে

তারা। ওই তালিকা রায়হানের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে ফেং। কমপিউটার হ্যাকার জানিয়েছে, হারিস সরকারী অফিসারদের স্ত্রীদের সঙ্গে লটর-পটর করছে। বন্দরের কাছে যে মহিলা ওর প্রেমে পাগল হয়েছে, তার বোনের স্বামী এনার্জি মিনিস্ট্রির ডেপুটি ডিরেক্টর।

দেখতে মোটেই আকর্ষণীয় নয় হারিস জামান, তবে যেভাবেই হোক, পটিয়ে ফেলে মাঝবয়সী মেয়েলোকদের।

এ নিয়ে আলাপ করেছে গ্যাং ফেং ও কাশেম। ওদের ধারণা হয়েছে হার্বার পাইলট লোকটা একটু দুর্নীতি পরায়ণ, এবং এমন এক লোক যার লিবিডো বেশি সক্রিয়।

তবে একটু আগে চমকে গেছে ওরা। রায়হানকে দিয়ে নতুন তথ্য পাঠিয়েছেন সোহেল ভাই। ওটা পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা।

মার্ভেল থেকে রানাকে ব্রিফ করছে রায়হান। স্যাটালাইট ছবি পাওয়া যায়নি, তবে রানা যখন জঙ্গি ক্যাম্পে কপ্টার থেকে নেমেছিল, সেসময় রায়হান দেখেছে পাহাড়ি ওই এলাকা সাগর সমতল থেকে এক হাজার ফুট উপরে। ওর কথা মন দিয়ে শুনছে রানা। জঙ্গি ক্যাম্প থেকে উপকূল পর্যন্ত পুরো রেলপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিচ্ছে কমপিউটার বিশেষজ্ঞ। উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ। মোটমাট বিশ মাইল।

রায়হানের কথা শুনবার ফাঁকে পরিকল্পনা করতে চাইছে রানা। ওর মন বলছে, উপকূল পর্যন্ত যাওয়া খুব কঠিন হবে।

হাতে সময় নেই। দুই ঘণ্টার আগেই হামলা হবে ক্যাম্পে। লিবিয়ানদের এমন কোনও কারণ দেখাতে পারবেন না রাহাত খান, যেটা শুনে সময় কিছুটা পিছাবে তারা।

এদিকে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়েছে রানার মাথায়। আটচল্লিশ

ঘণ্টার ভিতর তিনটে ঘণ্টাও ঘুমাতে পারেনি। নিশাত, স্বর্ণা ও নবী ওর চেয়ে ঢের সুস্থ।

'কী হলো, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল স্বর্ণা। এই মাত্র তিন স্তরের ক্যাটগাট সেলাই শেষ করেছে। রক্তে মাখামাখি সার্জিকাল গ্লাভস। এখন আর সহজে কাটবে না সেলাই। লোকাল অ্যানেসথেটিক দেয়ায় এ মুহূর্তে উরুতে ভোঁতা একটা ব্যথা। তবে রানা জানে, দরকার পড়লে ঠিকই লড়তে পারবে।

'কী বিষয়ে, স্বর্ণা?'

'এইমাত্র হাসলেন আপনি।' গ্লাভস খুলল স্বর্ণা। ওগুলো চলে গেল লাল বায়োহ্যাযার্ড কণ্টেইনমেণ্ট বক্সে।

'হেসেছি, না? ভাবছি জটিল সমস্যার ভিতর পড়েছি।'

'আর তাই দাঁড় করিয়েছেন জটিল পরিকল্পনা,' বলল স্বর্ণা। 'নিশ্চয়ই আপনার কোনও সি প্ল্যান, মাসুদ ভাই?' নিশাতের চওড়া কাঁধের উপর দিয়ে সামনে চাইল সে।

'এবার সি প্ল্যানে চলবে না, আমাদের ডি, ই এমন কী এফ প্ল্যানও লাগবে।'

এখন মাত্র দুটো কাজ করতে পারে ওরা। এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। বিষয়টা সবাইকে শ্যুটিং গ্যালারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়ার মত। আর সুন্দরী হবে সিটিং ডাক।

ডাক-টেপ ও গজ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে রানার উরুর ক্ষত বুজিয়ে দিল স্বর্ণা। 'ডক্টর ফারা আপত্তি তুললে বলব, এর বেশি পারি না।'

'ভালভাবেই সেলাই করেছ।' গম্ভীর চেহারা করে উঠে দাঁড়াল রানা, পরে নিল প্যাণ্ট। ওটা এখানে ওখানে ফেঁসে গেছে। বালির বস্তার মত শক্ত। কোমরে তুলতেই কুড়কুড় আওয়াজ তুলল। ট্রাকে বাড়তি প্যাণ্ট নেই। নীচে নেমে গেল রানা, বার কয়েক বসল-উঠল। ক্ষতের উপর টান পড়ছে, তবে টিকবে সেলাই।

নিজ কাজ করছে অ্যানেসথেসিয়া।

পুব পাহাড়ের ওপাশ থেকে সূর্য উঠতে দেরি আছে। মাথার উপর জ্বলজ্বল করছে অজস্র নক্ষত্র। ওগুলোর দিকে চাইল রানা, ভাবছে আগামী সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচবে? কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'সবাই ট্রাকে ওঠো। মার্ভেল আসার আগেই নাটক শেষ হবে।'

'সামনে অনেক কাজ,' বিড়বিড় করে বলল নবী।

'একটা কথা, মাসুদ ভাই,' বলল স্বর্ণা। 'আমরা যাদের উদ্ধার করব, এরা কারা? রাজনৈতিক বন্দি, না সাধারণ অপরাধী?'

'জানি না। তবে সরিয়ে না নিলে মরবে সবাই।'

'মনের ভিতর বিশ্রী অনুভূতি হচ্ছে,' বলল নিশাত।

তিলতিল করে পেরুল পঞ্চাশ মিনিট, রানা ধারণা করল সময় হয়েছে। বন্দিদের পাহারা যারা দেয়, তাদের ট্রেইনিং কেমন আঁচ করেছে ও। লোক কম হলে সমস্যা হতো না, তবে সংখ্যায় তারা চল্লিশজন। আশা করছে এদেরকে সামলাতে পারবে। সঠিক সময় বুঝে কাজে নামতে হবে। ভাবছে, দুই শ' লোককে সরানো কঠিন, ক্যাম্প থেকে তাদেরকে নিয়ে যেতে হবে খনির দিকে। সবাইকে নিয়ে পালানো চাট্টিখানি কথা নয়।

খনির দিকে যাওয়ার আগে নিশাতকে ট্রাক থেকে নামিয়ে দিল রানা। নিশাত যাবে পাহাড়ের উপর। ওখান থেকে স্টকইয়ার্ড আর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দালান কাভার করবে। ওর সঙ্গে রয়েছে .৫০ ক্যালিবারের ব্যারেট স্নাইপার রাইফেল। ওটা দিয়ে এক মাইল দূরের টার্গেটে লক্ষ্যভেদ করা যায়। সাত শ' গজের ভিতর লক্ষ্যভেদ করবার জন্য রেখেছে আরইসি৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। রানার ধারণা, নিশাত আরও কম রেঞ্জেই পাবে টার্গেট। সুন্দরী এখন আছে ক্যাম্প থেকে খানিক দূরে, সরু উঁচু ট্রেইলের উপর। গতকাল দুপুরে গার্ডরা এই পথে নিয়ে গেছে ট্রাক। তখন বনেটের উপর ছিল বন্দির লাশ।

পুবাকাশে আবছা আলো ফুটতে শুরু করেছে। সামনে চাইল রানা, চোখে পড়ছে ঘুটঘুটে কালো গিরিখাত। বহু দূর সাগর থেকে ভেসে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া। খচখচ করছে রানার মন। স্মৃতি মাহমুদ ও ফুয়াদ আহমেদকে লড়াই থেকে সরিয়ে দিতে পারলে ভাল হতো। তবে তা সম্ভব নয়। মরুভূমির ভিতর ছেড়ে যাওয়া অমানবিক হবে। এমন হতে পারে ক্যাম্পের দিকে আর ফিরতেই পারল না ওরা সুন্দরীকে নিয়ে। স্মৃতি ও ফুয়াদকে নিজের পরিকল্পনা খুলে জানিয়েছে রানা। বুঝিয়ে দিয়েছে ওরা মস্ত ঝুঁকি নিতে চলেছে। তারা জবাবে জানিয়ে দিয়েছে, ওরা থাকছে। কোনও দায়িত্ব দেয়া হলে তা পালনের চেষ্টা করবে।

'এবারের আর্কিওলজিকাল কাজের শেষে আপনাকে একটা ফেদোরা উপহার দেব,' স্মৃতিকে বলেছে রানা।

'আর আমি ফক্কা?' মৃদু হেসেছে ফুয়াদ আহমেদ।

'আপনাকে দু' প্যাকেট টেস্টি স্যালাইন দেয়া হবে,' গম্ভীর চেহারায় বলেছে স্বর্ণা।

রেডিও কড়কড় করে উঠতে সচেতন হলো রানা।

'কম চেক,' ট্যাকটিকাল নেটে বলে উঠেছে নিশাত।

'সব ঠিক,' বলল নবী। 'ফাইভ বাই ফাইভ, আপা।'

'আমি *ওর লোডিং স্ট্রাকচারের* উপর,' জানিয়ে দিল নিশাত। 'গার্ডরা ঘুম থেকে তুলছে বন্দিদেরকে। একটু পর নাস্তা দেবে। যা করার এখনই করতে হবে।'

'ঠিক আছে,' জবাবে বলল রানা। টের পেল মরুভূমির বালির মত শুকিয়ে গেছে গলা। নবীর দিকে চাইল। নিজে বসেছে ড্রাইভিং সিটে। ওর পরিকল্পনা সফল বা ব্যর্থও হতে পারে। সুন্দরীর ওয়েপন্স সিস্টেমের উপর নির্ভর করছে সব। 'রেডি, নবী?'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন।

'তা হলে রওনা হব।'

কি বোর্ড ব্যবহার করে রুফ মাউন্টেড মর্টার চালু করল নবী। নিশাতের সাহায্য নিয়ে সাইট ঠিক করেছে। ব্যবহার করা হচ্ছে লেজার রেঞ্জ ফাইণ্ডার। শুরু হলো গোলাবর্ষণ। প্রথম রাউণ্ড এক শ' গজ যাওয়ার আগেই টিউবের ভিতর চারটে রাউণ্ড ঢুকিয়ে দিল অটোলোডার। পরক্ষণে হাস্যকর 'পুম' আওয়াজ তুলে খালি হলো টিউব। বাঁকা পথে উঠছে গোলা, ছুটে চলেছে টার্গেট লক্ষ্য করে।

দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হয়েছে। নবী চেঁচিয়ে উঠল, 'গো-গো!'

ট্রাকের ইঞ্জিনের পিকআপ তুলেছে রানা, গিয়ার ফেলেই রওনা হয়ে গেল। চরকির মত বনবন করে ঘুরল চাকাগুলো। টিলা পেরিয়ে ক্যাম্পের দিকে ছুটল সুন্দরী। রানার পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত সফল। ওরা ছাড়া কেউ জানে না কোথা থেকে আসবে মর্টারের গোলা। গমের খুদের তৈরি খাবার দেয়া হবে, কাজেই লাইনে দাঁড় করানো হচ্ছে বন্দিদেরকে। দূরে দেখা গেল এক লোককে পিটাতে শুরু করেছে গার্ড। কিডনির উপর গুঁতো খেয়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে মাটিতে পড়ল বন্দি।

গতিপথের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেল মর্টারের গোলা, এবার জমিনের দিকে নেমে আসতে লাগল। প্রতিটার ভিতর এক কিলো হাই এক্সপ্লোসিভ। তবে বেশিরভাগ শ্র্যাপনেল সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ফলে বন্দিদের আহত হওয়ার সম্ভাবনা কম।

যে গার্ড এই মাত্র মাটিতে ফেলে দিয়েছে বন্দিকে, তার উপর ক্রস-হেয়ার স্থির করল নিশাত। অর্ধেক শ্বাস আটকে রেখেছে। তারপর আস্তে করে স্পর্শ করল ট্রিগার। লোকটার মাথা বিস্ফোরিত হতেই বলল, 'আমরা পেলাম লালচে কুয়াশা।'

আরও দুই গার্ড পড়ে যাওয়ায় সচেতন হলো তাদের সঙ্গীরা। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল গার্ডদের ক্যাপ্টেন। পরনে শার্ট নেই,

ইউনিফর্ম প্যাণ্টের পায়া গুঁজে দিয়েছে কমব্যাট বুটের ভিতর। নিশাত লক্ষ করল ওই তাঁবুর ছাত ফুঁড়ে বেরিয়েছে রেডিও অ্যাণ্টেনা। ওদিকে মন না দিয়ে আরেকটা টার্গেট খুঁজে নিল।

ঠিক তখন একই সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো চারটে মর্টার। দিঘির মত উন্মুক্ত খনির উপর ছিটকে উঠল বালি ও আগুন। ক' মুহূর্ত পর ক্যাম্পের কাছে বিস্ফোরিত হলো আরও চার রাউণ্ড।

চমকে গেছে গার্ড ও বন্দিরা, পিছাতে শুরু করেছে কাঠের দালানের দিকে। নিশাত নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, একের পর এক খতম করছে জঙ্গি গার্ডদের। প্রতিটি গুলিতে কমছে একজন করে। যাদের সঙ্গে অস্ত্র রয়েছে, তাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

ক্যাম্প লক্ষ্য করে র‍্যালির ড্রাইভারের মত ছুটছে রানা, যেন একমাত্র উদ্দেশ্য ফিনিশ লাইনে পৌঁছুনো। ওর পাশে এইমিং রেটিকল ঠিক রাখতে চাইছে নবী। তারপর সুন্দরীর অনবোর্ড মিসাইলের একটা লক করে দিল টেরোরিস্ট ট্রাকের উপর। সঙ্গে সঙ্গেই ফায়ার করল।

সুন্দরীর রেইল থেকে আকাশে বক্র পথ তৈরি করে রওনা হলো রকেট, ট্রাকের ক্যাবে লেগে বিস্ফোরিত হলো। মট্ করে মাঝখান থেকে ভেঙে গেল চেসিস, মনে হলো টর্পেডোর আঘাতে টলমল করছে জাহাজ।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ভীষণ ভয় পেয়েছে বন্দিরা, ছুটল দালানের দিকে। এদিকে গার্ডদের অনেকে ছুটছে নিজ নিজ তাঁবু লক্ষ্য করে। ওখানে রয়েছে তাদের রাইফেল।

ক্যাম্প থেকে মাত্র এক শ' গজ দূরে সুন্দরী, এমন সময় তাঁবুগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল সশস্ত্র জঙ্গিরা। সবার চোখ পড়েছে ট্রাকের উপর, একে-৪৭ থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হলো। কাপোলা থেকে এম৬০ মেশিনগান চালু করল স্বর্ণা। হাতের ভিতর লাফিয়ে উঠছে অস্ত্র। কাঁধে লাগছে ঝাঁকির পর

ঝাঁকি। যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। তবে একবারের জন্যও লক্ষ্য ব্যর্থ হলো না।

গার্ডদের মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরি করল রাউণ্ডগুলো। ধুপ-ধাপ পড়ছে লোকগুলো, দু'হাতে চেপে ধরছে আহত স্থান। নিজেদের দলের গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল ক'জন। সবার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে সুন্দরী। ওটা লক্ষ্য করে নতুন উদ্যমে গুলি শুরু হলো।

'যথেষ্ট সময় পেয়েছে ক্যাপ্টেন,' ইঞ্জিনের গর্জনের উপর দিয়ে বলল রানা। 'এবার উড়িয়ে দাও কমাণ্ড টেন্ট।'

ওর পরিকল্পনার দুটো উদ্দেশ্য আছে। প্রথম কথা, যত বেশি সম্ভব মানুষকে উদ্ধার করতে হবে। এমন হতেই পারে লিবিয়ান সেনাবাহিনী শত্রু-বন্ধু বাছবে না, গুলি করে পরে কথা বলবে। দ্বিতীয় কথা, খেয়াল রাখতে হবে যত বেশি পারা যায় জঙ্গিদের শেষ করতে হবে। নইলে এরা যাবে ট্রেইনিং ক্যাম্পে। তাতে মূল হামলার সময় শত্রু সংখ্যা বাড়বে। বোধহয় ওখানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, উদ্ধার করবার আগেই এরা তাঁকে মেরে ফেলতে পারে। কাজেই তাঁর আততায়ীর সংখ্যা কমিয়ে দিতে হবে।

এবং এই কারণেই নিশাতকে জানিয়ে দিয়েছে রানা, খনি ক্যাম্পের কমাণ্ডারকে খতম করা চলবে না। লোকটা রেডিও করুক ট্রেইনিং ক্যাম্পে, এতে ওখান থেকে হাজির হবে জঙ্গিরা। এতক্ষণে লোকটা তার কাজ শেষ করেছে।

কমাণ্ড টেন্টের ফ্ল্যাপের ভিতর ঢুকল একটা মিসাইল, সোজা মাটি ছেঁচড়ে পিছনের দেয়াল ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে গেল। ক্যানভাস থেকে মস্ত অগ্নিকুণ্ড লাফিয়ে বেরুল। মিলিটারি মালপত্রের উঁচু স্তূপ ছিল বাইরে, প্রচণ্ড কংকাশনে উড়ে গেল সব। তাঁবুটা টয়লেট পেপারের মত ফস্ করে জ্বলে উঠল। নোংরা বাদামি তুষারের মত চারপাশে উড়ছে ছাই।

ক্যাম্পের ভিতর ঢুকে পড়েছে সুন্দরী। রানা ও নবীর মাথার

উপর গর্জন করছে স্বর্ণার এম৬০ মেশিনগান। ধান কাটার মত কাটা পড়ছে জঙ্গি গার্ডরা। একটু পর পর ট্রেসার রাউণ্ড ব্যবহার করছে লেফটেন্যান্ট, ওগুলো দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বন্দিদেরকে স্টকইয়ার্ডে যেতে হবে। ওখানে রয়েছে জঙ্গিদের রেলকার ও ট্রেন ইঞ্জিনগুলো।

রানা দেখল আকস্মিক এ হামলায় মন ভেঙে গেছে গার্ডদের, তাদের বড় এক অংশ ছুটে ঢুকে গেল খনি এলাকায়, অথবা টিলা পেরিয়ে চলে গেল মরুভূমিতে। আন্দাজ পঞ্চাশজন বন্দি জড় হয়েছে পুরনো খনির দালানের পাশে। হঠাৎ একটা বুলডোজারের আড়াল থেকে বেরুল এক গার্ড, নিরস্ত্র মানুষগুলোকে বাগে পেয়েছে। কাঁধে তুলে নিল আরপিজি-৭।

সুন্দরীর কণ্ট্রোল প্যানেলে মিসাইলের বদলে মেশিনগান ব্যবহার করল নবী। ট্রাকের নীচ থেকে বিশ্রী আওয়াজ তুলল .৩০ ক্যালিবারের অস্ত্র। জঙ্গি পড়ে গেল, তবে তার আগেই ফায়ার করেছে রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড। পাঁচ পাউণ্ডের মিসাইল মাত্র দশ ফুট গেল, তারপর বিস্ফোরিত হলো আকাশে।

'সর্বনাশ, আপা,' অবিশ্বাস নিয়ে বলল রানা। 'ওটা কী আপনার কাজ?'

নিশাত বলল, 'লোকটার দিকে গুলি করলাম, কিন্তু বুলেটের স্রোতের ভিতর পড়ল গ্রেনেড। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল।'

মনে মনে প্রশংসা করল রানা, মহিলা মিথ্যা বলবার মানুষ নয়। সুন্দরীকে নিয়ে দালানের কোণ ঘুরল রানা, কষে ব্রেক চাপল। রেল লাইনের উপর থামল বিরাট ট্রাক। পিছনদিক থাকল এক বক্সকারের দু' ফুট সামনে। ওই অ্যান্টিক রোলিং স্টককারের ছাতে ব্রেকম্যানের জন্য মেকানিকাল ব্রেক। সুন্দরীর চাকার চেয়ে পুরো এক ফুট সরু রেল লাইন। তিন সেকেণ্ড ধরে ড্যাশ বোর্ড হাতড়াল রানা, তারপর পেয়ে গেল কণ্ট্রোল সুইচ। ওটা দিয়ে

ট্রাকের আর্টিকুলার সাসপেনশন বদলে গ্রাউণ্ড ক্লিয়ারেন্স ঠিক করে নেয়া হয়।

ট্রাক সামনে-পিছনে নিল রানা, সুইচ টিপে দেয়ায় হুইলগুলো ভিতর দিকে ফিরছে। পরের আধ মিনিটে চাকাগুলো বসে গেল সরাসরি রেল লাইনের উপর। চেসিস উঠে এসেছে, ভাঙা পাথর থেকে দুই ফুট উপরে থাকল মেঝে।

একটা আরইসি৭ অ্যাসল্ট রাইফেল নিল রানা, বাম হাতে ওয়ালথার নিয়ে লাফ দিয়ে নামল মাটিতে। গুলি করে ডানদিকের চাকাগুলো ফুটো করে দিল। প্রচণ্ড ওজনে ভুস করে বেরিয়ে গেল বাতাস। সুন্দরীর স্টিলের রিম বসল রেলের উপর। রাবারের চাকা বাড়তি গ্রিপ হিসাবে কাজ করবে। সন্তুষ্ট হলো রানা। এটাই ছিল ওর প্ল্যানের বড় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুন্দরীকে এখন রেলরোডে ট্রেইনের মত ব্যবহার করতে চাইছে।

দালানের কোনা ঘুরল রানা, ট্রাক থেকে নেমে পিছু নিয়েছে ফুয়াদ আহমেদ। তার পরনে এখনও বন্দিদের ছেঁড়া পোশাক। দালান থেকে খানিক দূরে ক'জন গার্ডকে দেখা গেল, শত্রুপক্ষকে খুঁজছে। আপাতত বন্দিদের দিকে কোনও খেয়াল নেই।

দালানের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে রয়েছে অনেকে। তাদের কেউ কেউ রানার পরনে গার্ডের পোশাক ও অস্ত্র দেখে ভয় পেল। তারপর দেখল গার্ডের পাশে হাজির হয়েছে ফুয়াদ আহমেদ।

'আমাদের সঙ্গে চলুন,' নির্দেশের সুরে বলল সে। 'এঁরা এসেছেন আমাদেরকে সাহায্য করতে।'

কেউ কেউ অনিশ্চিত দৃষ্টিতে দেখল তাকে।

'চলুন। আমাদেরকে পালাতে হবে। এটা নির্দেশ।'

খসে পড়া শুকনো পাতার মত করে নড়ে উঠল কয়েকজন। তারপর অন্যরা অনুসরণ করল। ততক্ষণে রেলকারের দরজা খুলে ফেলেছে স্বর্ণা। বন্যার পানির মত বগিতে উঠছে বন্দিরা। এক

কোনায় অবস্থান নিল রানা, গার্ডরা হামলা করলে ঠেকাবে। দু'একজন দূর থেকে গুলি করল। রানা ও নিশাতের পাল্টা গুলি খেয়ে পড়ে গেল তারা, অথবা গা ঢাকা দিল। হাত ইশারা করে তাড়াতাড়ি রেলকারে বন্দিদেরকে উঠতে বলছে ফুয়াদ। গার্ডদের উল্টে পড়া টেবিলের আড়াল থেকে বেরুল কয়েকজন মহিলা, ছুটে আসছে সুন্দরীর দিকে। পিছন থেকে গুলি করল এক গার্ড। রানা কাউণ্টার ফায়ার করার আগেই পড়ে গেল এক মহিলা। এরপর দূরের ওই ক্রেটের পিরামিডে কয়েক পশলা গুলিবর্ষণ করল রানা।

আহত মেয়েটিকে তুলে নিয়ে রেলকারের দিকে আসতে লাগল মহিলারা। রানাকে পাশ কাটানোর সময় বলল এক মহিলা, 'আল্লাহ্ আপনার ভাল করুন।'

পাশেই থেমেছে এক বন্দি। তার দিকে না চেয়ে কম্পাউণ্ডে চোখ বোলাল রানা। লোকটা ওর আস্তিন ধরতেই সতর্ক দৃষ্টিতে তাকে দেখল। এ আর সব আরবের মত নয়। একমাথা কালো চুল, কুচকুচে কালো মুখ। রোদে পুড়ে গেছে ত্বক।

'সবুর?' এক সেকেণ্ড পর বলল রানা। নিজ হাতে তাকে ট্রেইনিং করিয়েছে।

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই।' হাত তুলে কপাল দেখিয়ে দিল। 'এবার সত্যিই কপাল পুড়েছে আমার।'

'ট্রাকে উঠে পড়ো।'

'স্মৃতি মাহমুদ, মাসুদ ভাই?'

'ভাল আছে।'

'তা হলে সত্যি কপাল ভাল। গতরাতে গার্ডরা বলল মেয়েটা পালানোর সময় গুলি খেয়ে মরেছে।' হাত বাড়িয়ে দিল সবুর। 'একটা অস্ত্র দিন।'

'সুস্থ তুমি?'

'জী।'

নবীর দিকে দেখিয়ে দিল রানা। বক্সকারের টো হুক আটকে দিচ্ছে সুন্দরীর পিছনে—ব্যাক গিয়ার দিয়ে ওটাকে ঠেলে নড়াবার ইচ্ছে। কাছ থেকে প্রকাণ্ড লাগছে বগি। শেকলটা যেন রুপার কোনও চেইন। 'নবী ওখানে, ওর কাছ থেকে অস্ত্র বুঝে নাও।'

'চললাম তা হলে, মাসুদ ভাই।'

চট করে ঘড়ি দেখল রানা। প্রথম মর্টার ফেলার পর মাত্র নয় মিনিট পেরিয়েছে। হাতে বড়জোর দশ মিনিট, তারপর ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে হাজির হবে জঙ্গিরা। এদিকে লিবিয়ান সেনাবাহিনীর হামলা হতে এক ঘণ্টাও বাকি নেই। তারা যে-কোনও চলন্ত টার্গেটে বোমা ফেলবে।

এখনও রেলকারের দিকে আসছে বন্দিরা। যতই তাড়া দেয়া হোক, দ্রুত হাঁটতে পারছে না। সামনে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা, তারপরেও ছোটা সম্ভব হচ্ছে না। রানার মনে হলো ওর কানের কাছে টিকটিক করছে হাতঘড়িটা। একবার কাঁধের উপর দিয়ে বগির দিকে চাইল। বন্দিরা এক এক করে উঠছে, পরের জনকে উঠতে সাহায্য করছে।

ক' মুহূর্ত পর রানা ভাবল: কই, ঘড়ির টিকটিক নয়, অন্য আওয়াজ! টের পেল, হুম্প-হুম্প-হুম্প শব্দটা আসছে অগ্রসরমান কপ্টার থেকে! ক্যাপ্টেন আলম সিরাজের আসতে কমপক্ষে বিশ মিনিট বাকি। সুতরাং এ কপ্টার জঙ্গিদের এমআই-৮!

বগি প্রায় ভরে গেছে। তবে এক বয়স্কা মহিলা টলতে টলতে আসছে বগির দিকে। পিছনে জ্বলছে তাঁবু ও ইকুইপমেন্ট। গোলাপি আকাশে উঠছে ঘন কালো ধোঁয়ার কলাম।

একবার মহিলার দিকে চাইল রানা, কিন্তু হাতে মোটেই সময় নেই!

সাত

বয়স্কা মহিলার পিছনের বালিতে বিঁধল এক পশলা বুলেট। যন্ত্রের মত চলছে রানার হাত। অ্যাসল্ট রাইফেলের ব্রিচ থেকে ব্যবহৃত ম্যাগাজিন ফেলে ভরে নিল নতুন একটা। শেষ গুলি খরচ করেনি বলে নতুন করে কক করতে হলো না।

দুই শ' মানুষ বক্রকারে উঠেছে, তবে এখন তা বড় বিষয় নয়। উদ্ধার করতে হবে ওই বয়স্কা মহিলাকে। হয়তো যৌক্তিক কাজ করছে না রানা। এত মানুষকে উদ্ধার করা কম নয়, কিন্তু যারা রয়ে গেল তাদেরকেও রক্ষা করতে চাইছে। ওই মহিলার প্রাণ অন্যদের চেয়ে কম মূল্যবান নয়।

কাভার থেকে বেরিয়ে গেল রানা, কোমরের পাশ থেকে গুলি শুরু করল। চমকে গেছে টেরোরিস্ট, থেমে গেল তার রাইফেল। মহিলা ভীষণ ভয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর আচরণ দেখে রানার মনে হলো, অন্ধকারে উনি হরিণী, চোখের উপর পড়েছে হেডলাইটের বাতি।

দীর্ঘ বারো পদক্ষেপে তাঁর পাশে পৌঁছল রানা, নিচু হয়েই বাম কাঁধের উপর তুলে নিল মহিলাকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেল কাঁধের উপর উনি আসলে পাহাড়। মহিলার ওজন কমপক্ষে এক শ' নব্বই পাউণ্ড। দীর্ঘ দিন অনাহারে আড়াই শ' পাউণ্ড থেকে নেমে এসেছেন বেচারি। টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফিরতি পথ ধরল। হাঁটুর কাছ থেকে

ভেঙে আসতে চাইছে পা। ভয় পেয়ে চাপা স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা, তবে বাধা দিলেন না। দালানের দিকে কোনাকুনিভাবে রওনা হলো রানা। ঘাড় কাত করে পিছনে চোখ রাখল, ডান হাতে রাইফেল।

হঠাৎ বিকট আর্তচিৎকার ছাড়লেন মহিলা। কী হলো বুঝবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে রানা। দেখল, হঠাৎ কোথা থেকে হাজির হয়েছে এক গার্ড। লোকটার হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নেই, হাতে গদার মত লাঠি। ক্ষেপা কুকুরের মত ছুটে আসছে সে। রানার রাইফেলের নল অন্য দিকে তাক করা। ঘুরে দাঁড়ানোর সময় বুড়ি মহিলার পা দুটো গার্ডের নাক থেকে আধ ইঞ্চি দূর দিয়ে গেল। অ্যাসল্ট রাইফেল তাক করতে চাইল রানা, কিন্তু অবাক চোখে দেখল, ঘুরবার সময় গার্ডের চোয়ালে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি বসিয়ে দিলেন মহিলা। যদি ওটা না করতেন, রানার খোলা গর্দানের উপর নামত গদা।

দাঁড়িয়ে পড়ে টলমল করছে গার্ড, তারপর আবারও সামনে বাড়তে চাইল। কিন্তু লোডিং টাওয়ারের উপর থেকে গুলি করল নিশাত। বুকে গুলি লাগতেই ধুপ করে পড়ল লাশ।

'ম্যাডাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে আরবিতে বলল রানা, 'আপনার ডান-হাতি ক্রস হুবহু মাইক টাইসনের ঘুসির মত!'

'কক্ষনো না,' আপত্তি তুললেন মহিলা। 'মোহাম্মদ আলীর পাঞ্চ ওর চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। সেজন্যই আমি তাঁর ভক্ত।'

হেসে ফেলল রানা। আরেকটু হলে হাসতে হাসতে ফেলে দিত মহিলাকে, কয়েক পা গিয়ে তুলে দিল বক্সকারে। হাতের ইশারা করল স্বর্ণার উদ্দেশে। রোলিং ডোর বন্ধ করে দিল স্বর্ণা।

'নবী, তৈরি?' রেডিওতে জানতে চাইল রানা। প্রতি সেকেণ্ডে বাড়ছে কপ্টারের আওয়াজ।

'জী, মাসুদ ভাই।'

'আপা?'

'জী, স্যর।'

'টাওয়ার থেকে নেমে আসুন। আমরা আধ মিনিটের মধ্যে রওনা হব।'

প্যাসেঞ্জার সিটের দিকে যাওয়ার সময় সুন্দরীর বামদিকের চাকাগুলো দুই গুলিতে ফুটো করল নবী। এরইমধ্যে ফুয়াদ আহমেদকে রিয়ার কার্গো কমপার্টমেন্টে তুলে দিয়েছে স্বর্ণা। খোলা টপ হ্যাচে দাঁড়িয়েছে সবুর রহমান।

ড্রাইভিং সিটে বসে পড়ল রানা। এক পাশে বিশাল ডিজেল-ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ, ওটা দিয়ে পাহাড়ি পথে টেনে নেয়া হয় ওর কার। রানার মনে হয়েছে, ওই লোকোমোটিভ ওদের অনুসরণ করতে পারে। তবে, ওসব ইঞ্জিন গরম হতেই কমপক্ষে আধঘণ্টা লাগে।

ডক্টর শামশের আলী সুন্দরীর জন্য ডিজাইন করেছেন চব্বিশ গিয়ারের ট্র্যান্সমিশন। রিভার্সের লো রেঞ্জের সবচেয়ে নীচের চারটে গিয়ার ফেলল রানা। অ্যাক্সেলারেটার দাবিয়ে ধরতেই শুনতে পেল ইঞ্জিনের রেভ বাড়ছে। গর্জন শুরু করল টুইন টার্বো। সুন্দরীর পিছনে রয়েছে রেলকার, এক পাশে আবছা স্টেনসিলে লেখা: আঠারো হাজার পাউণ্ড। এ ছাড়া মানুষ তুলবার পর আরও অন্তত পাঁচ টন বেড়েছে ওজন। রানা জানে না দাঁড়ানো কারটাকে সুন্দরী নড়াতে পারবে কি না।

থরথর করে কাঁপছে ট্রাক। চেপ্টে যাওয়া চাকাগুলো পিছলে গেল স্টিলের রেলের উপর।

সুন্দরীর ফ্লোর শিফটারে রয়েছে একটা সেফটি ডিভাইস, ওটার লাল বাটন টিপে দিল রানা। ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারগুলোর ভিতর ঢুকল ইনটিগ্রেটেড এনওএস থেকে নাইট্রাস অক্সাইড।

প্রচণ্ড তাপে ভাঙতে শুরু করল, কম্বাস্চনের জন্য তৈরি হলো বাড়তি অক্সিজেন।

'সুন্দরীর এত জোর নেই যে মার্ভেলকে নায়াগ্রা জলপ্রপাতে ঠেলে তুলবে,' হাসতে হাসতে বলেছেন শামশের আলী।

তবে দেখা গেল নাইট্রাস অক্সাইডের বাড়তি দুই শ' হর্সপাওয়ার নড়াতে শুরু করেছে বক্সকারকে।

প্রথমে মনে হলো শামুকের গতিতে নড়ছে ওটা, তারপর ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে লাগল। একটু একটু করে গতি বাড়ছে। ড্যাশবোর্ডের ডিজিটাল স্পিডোমিটার দেখাল: ঘণ্টায় এক মাইল। ওদের বিদঘুটে ট্রেন পুরনো কোল লোডিং স্টেশনের ভিতর ঢুকে গেছে, গতি উঠল তিন মাইলে। পাশেই কঙ্কালের মত লোডিং প্লাটফর্ম। ওটার উপর থেকে স্নাইপিং করেছে নিশাত।

রানা রেডিও করতেই জং ধরা কনভেয়ার বেল্টের উপর নেমে এসেছে নিশাত। পাশেই মুখ খোলা কয়লার শ্যুট, ওখান দিয়ে নামিয়ে দেয়া হয় কয়লা। সামনে বক্সকার দেখেই তৈরি হয়ে নিয়েছে নিশাত, নেমে পড়েছে শ্যুটের ভিতর। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে নামল বক্সকারের ছাতের উপর। এক গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোলিং স্টেশন তৈরি হয়েছে খোলা, নিচু মালগাড়ির জন্য; বক্স ফ্রেইট কার সে তুলনায় অনেক উঁচু। হঠাৎ সামনেই নিশাত দেখল এগিয়ে আসছে আরেকটা কোল শ্যুট। ওটার নীচের অংশ ক্ষুরের মত ধারাল! কচ্ করে কাটা পড়বে মাথা!

ঝুপ করে বসেই চিত হয়ে শুয়ে পড়ল নিশাত, ওর নাকের এক ইঞ্চি উপর দিয়ে গেল শ্যুট। পাথরের মত পড়ে থাকল। পরের এক মিনিটে একের পর এক শ্যুট পেরুল বগি। জং ধরা লোডিং স্টেশন পিছনে পড়তে শ্বাস ফেলল নিশাত, রেডিও করল, 'আমি বক্সকারের ছাতে।'

'গুড,' জবাব দিল রানা। 'আপা, আপনি সুন্দরীর ড্রাইভিঙে

চলে আসুন।'

খনি থেকে সামনের এক মাইল একদম সমতল, মসৃণভাবে গতি তুলছে সুন্দরী। ক্রুজ কন্ট্রোল বাটন টিপল রানা, সরে গেল ড্রাইভিং সিট থেকে। কার্গো বেড থেকে আরইসি৭-এর বাড়তি ম্যাগাজিন নিয়ে পকেটে ঢোকাল। কোমরে পরে নিয়েছে দুটো হোলস্টার। খাপের ভিতর এফএন ফাইভ-সেভেনএন পিস্তল। ফুয়াদ ও স্মৃতির উদ্দেশে বলল, 'আপনাদের কী অবস্থা?'

'গত ছয় মাসে এই প্রথম মনে কিছুটা আশা জাগছে,' বলল লিবিয়ান। 'মন বলছে, আগে কখনও এত ভাল ছিলাম না।'

'আপনি?' স্মৃতির উদ্দেশে চোখ নাচাল রানা।

'আমি এমন কোনও কাজ করিনি যে ফেদোরা হ্যাট দেবেন।'

'যথেষ্ট করেছেন।'

'আরেহ্, ট্রেন চালাচ্ছে কে?' জানতে চাইল নিশাত। এইমাত্র সবুরকে পাশ কাটিয়ে ক্যাবে ঢুকেছে। দেখতে পেল রানা সোজা হয়ে বসছে।

'প্রথম বাঁক আসতে আধ মাইল,' বলল রানা। 'আমাদের ভিতর যে কথা হয়েছে, সেই অনুযায়ী সব চলবে। কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়।' হঠাৎ ওর মনে পড়েছে অন্য কিছু। সুন্দরীর ক্যাব থেকে মাথা বের করল রানা। 'নবী, ওই বক্সকারের ওজন নয় টন। মানুষগুলোর জন্য আরও পাঁচ টন। জলদি অঙ্ক শেষ করো।'

'আগে তো ডিমেনশন জানতে হবে, মাসুদ ভাই।'

'আন্দাজ করে নাও।'

রসগোল্লার মত চোখ করল নবী। 'এ কেমন কথা হলো, মাসুদ ভাই? আপনি কি ঠাট্টা করছেন?'

'না।'

চুপচাপ চেয়ে রইল নবী। ক্যাব থেকে বেরিয়ে গেছে রানা।

প্রতি ঘণ্টায় পনেরো মাইল গতি তুলে ছুটছে ট্রেন। ধীরে ধীরে আরও বাড়ছে স্পিড। এখন পর্যন্ত কোনও বিপদ হয়নি। একবার আকাশ দেখে নিল রানা। কোনও কপ্টার পিছু নেয়নি।

ট্রাকের পিছনের ড্রামগুলো ফেলে আসা হয়েছে মরুভূমিতে। রানা জানে, নীচে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই উঠতে হবে বক্সকারের ছাতে। হঠাৎ এম৬০ দিয়ে গুলিবর্ষণ করল সবুর রহমান। ঘুরে চাইল রানা। একটা ক্যামোফ্লেজ্‌ড্ ট্রাক বাঁক নিয়েছে স্টকইয়ার্ডে। ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে হাজির হয়েছে টেরোরিস্টরা। ট্রাকের পিছনের রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে বারো জঙ্গি। গুলি করছে সুন্দরীকে লক্ষ্য করে।

ওই ট্রাক যে পথে আসছে সেটা পাহাড়ের কাঁধে উঠেছে। পাশেই রেললাইন। সবুর দেরি করেনি মেশিনগান চালু করতে। ট্রাকের সামনের চাকাগুলো ওর লক্ষ্য। ড্রাইভার বুঝবার আগেই গুলি লাগল সামনের দুই চাকায়, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো রাবার। স্টিলের রিম বেরুতেই ছিটকে উঠল অজস্র লাল-সাদা-হলুদ-নীল ফুলকি।

তীক্ষ্ণ বাঁক নিল ট্রাক, চেপে বসতে চাইল রেললাইনের বাঁধের উপর। পিছনের লোকগুলো চিৎকার শুরু করেছে। আরও কাত হলো ট্রাক, বিপজ্জনক ভাবে ছুটছে। লাফিয়ে নেমে গেল কয়েক জঙ্গি। অন্যরা রয়ে গেল ভিতরে। তারপর হঠাৎ করেই উল্টে গেল ট্রাক। পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে। একবার ডিগবাজি দিয়ে নরম মাটিতে গভীর দাগ তৈরি করে নামতে লাগল। ধুলোর মেঘ থেকে ছিটকে উঠছে ভাঙা ইস্পাত ও মানুষের বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গ।

ওই ট্রাক নীচে গিয়ে পড়তেই দেখা গেল আরেকটা ট্রাক। ওটা ডেযার্ট প্যাট্রল। ড্রাইভার অনেক সতর্ক, কড়া ব্রেক কষে থামতে চাইল। অ্যামিউনিশন বেল্টের শেষ বুলেট ওটার উপর খরচ করল সবুর, তারপর অসহায় চোখে চারপাশে চাইল। জানে

না এই নতুন মেশিনগান কীভাবে রিলোড করতে হবে। স্বর্ণা দেখিয়ে দিল। পাহাড় থেকে নেমে একটা লোকোমোটিভের আড়াল নিল ট্রাক। রেঞ্জ অনেক বেশি, তারপরও ওখান থেকে গুলি চলছে। দু'চারটে কাছ দিয়ে যাওয়ায় লুকিয়ে পড়ল সবুর ও স্বর্ণা।

এ দৃশ্য দেখতে গিয়ে সময় অপব্যয় করেছে রানা, নিজের উপরেই রেগে গেল। ওর মাথা থেকে চার ফুট উপরে বক্সকারের ছাত। তবে দূর থেকে দৌড়ে গিয়ে উঠতে পারবে। কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রাইফেল, খানিক পিছিয়ে দৌড় শুরু করল রানা, শেষ মুহূর্তে উড়াল দিল, দু'হাতে ধরতে চাইল ছাতটা। মসৃণ ইস্পাতে ধাক্কা দিল বুক। তবে দু'হাতে খপ্ করে ধরেছে ছাতের কিনারা। কয়েক সেকেণ্ড ঝুলে শরীর দুলিয়ে উঠে গেল উপরে। দেখতে পেল, সিকি মাইল দূরেই প্রথম বাঁক। বক্সকার এখন কমপক্ষে বিশ মাইল গতি তুলে ছুটছে।

ই-মেইল করে মানচিত্র পাঠিয়েছে রায়হান। চোখের সামনে দীর্ঘ বাঁক। উঁচু পাহাড়ের কিনারা ঘিরে পাক খেয়ে উপত্যকায় নেমেছে রেললাইন। সেখানে পৌঁছলে গতি অনেক বাড়বে। ফলাফল হতে পারে ভয়ঙ্কর। শেষে হয়তো বক্সকারের নিয়ন্ত্রণই হারাবে ওরা।

বগির পিছনের এই অংশে রয়েছে জং ধরা ধাতব হুইল। ওটা আটকে দেবে মেকানিকাল ব্রেক। বহু বছর আগে নিউম্যাটিক ব্রেকিং সিস্টেম আবিষ্কার করেন জর্জ ওয়েস্টিংহাউস। তখন বগিগুলোর উপর উঠত ব্রেকমেন, তারাই হুইল ঘুরিয়ে ব্রেক কষত। চাকাগুলোকে আটকে দিত ব্রেক-শু'র লোহার প্যাড। কখনও কখনও সামঞ্জস্য থাকত না ব্রেককারীদের ভিতর, ঘটত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। দু'হাতে শক্ত করে হুইল ধরল রানা, মনে মনে প্রার্থনা করল যেন জঙে জমে না থাকে প্যাড। আরেকটা ঘটনা

ঘটতে পারে, হয়তো বছরের পর বছর এই লাইনে চলতে চলতে খয়ে গেছে ব্রেকের প্যাড।

রানা ভেবেছে হুইল ঘোরাতে পুরো জোর লাগবে, কিন্তু ওটা ঘুরতে লাগল মসৃণ ভাবে। মনে হলো না কোনও কিছু স্পর্শ করছে। তারপর শুনল শুরু হয়েছে বিশ্রী ধাতব আওয়াজ। লোহার সঙ্গে লোহার ঘর্ষণ চলছে। চাকাগুলোর উপর অংশকে চেপে ধরেছে ব্রেক-শু। সব ঠিক ভাবেই চলছে। গত কিছু দিনের ভিতর যন্ত্রাংশে গ্রিজ দেয়া হয়েছে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে আরও আধ পাক হুইল ঘোরাল রানা। পরক্ষণে হতাশ হলো। হুইল ঘুরলে যে বাড়তি চাপ তৈরি হবে, তা নেই। কাজ করছে না ব্রেক। ঘর্ষণের আওয়াজ আর বাড়েনি।

ব্রেক কাজ করছে। তবে তা পর্যাপ্ত নয়।

সুন্দরী বাঁক ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে বক্সকারটাকে। পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল ওর লোডিং সুপারস্ট্রাকচার। ডানদিকে আরেকটা উপত্যকা দেখল রানা। ওদিকে রেললাইন আছে। পড়ে আছে এক সারি ওর কার। হয়তো এক শ' বছর আগে পরিত্যক্ত হয়েছে। এত দূর থেকে খেলনা গাড়ি মনে হচ্ছে। ওখানে যে স্টিম ইঞ্জিন দেখা গেল, ওটার শক্তি সুন্দরীর হর্সপাওয়ারের কমপক্ষে পাঁচগুণ।

'আপা?' রেডিও করল রানা।

'বলুন, স্যার।'

'আমাদের গতি কত?'

'আটাশ মাইল।'

'ঠিক আছে, তবে তিরিশ যেন পার না হয়। বক্সকারের ব্রেক ঠিক ভাবে কাজ করছে না।'

'অবস্থা খুব খারাপ?' জানতে চাইল নিশাত।

'ভাল বলা যায় না।'

বগির পিছনে ঝালাই করা লোহার মইয়ের ধাপ। ওটা বেয়ে নামতে লাগল রানা, নেমে এল সরু প্ল্যাটফর্মে। পাশেই একটা শাফট, ওটার সঙ্গে যুক্ত উপরের হুইল। ওই দুটো দিয়ে ব্রেক আটকানো হয়। ঠিক ভাবেই কাজ করছে, কিন্তু ব্রেক ধরছে না। একবার সুন্দরীকে দেখে নিয়ে সাবধানে কাপলিঙে বাম পা রাখল রানা, শক্ত করে স্টানশন ধরে উঁকি দিল বগির নীচে। রেললাইনের টাইগুলো কয়লার কারণে কুচকুচে কালো। ওর নাক থেকে খানিক নীচে সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে চলেছে টাইগুলো। খয়ে যাওয়া গিয়ার ও টার্নিং রডের মাঝখানে আটকা পড়েছে একটা পাথর। রানা যখন হুইল ঘুরিয়েছে, ওই পাথর আটকে দিয়েছে গিয়ারের দাঁত, অ্যালাইনমেন্ট নষ্ট হওয়ায় ব্রেক কাজ করছে না। বামহাতে আরও জোরে স্টানশন ধরল রানা, সাবধানে সামনে বাড়ল। ওর বুক ঢুকে গেল বগির নীচে। পুরনো রেললাইনের মাঝে জন্মেছে ঝোপঝাড় ও ঘাস, চাবুকের মত লাগছে মুখে।

গিয়ারের গ্রিজে মাখামাখি হয়ে গেল হাত। বিস্কুটের মত পাথরটা ধরল বটে, কিন্তু ওটা খুব শক্ত হয়ে আটকেছে।

ডানহাত ফিরিয়ে কোমর হাতড়াল রানা, পিস্তল বের করবে। প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় একটু একটু দুলছে ও। সামনের রেললাইনের মাঝে চোখ যেতেই চমকে গেল। আগে যাওয়া কোনও ট্রেন থেকে পড়েছে ধাতব জেরি ক্যান। অথবা ফেলেছে অসতর্ক কোনও ওঅর্ক ক্রু। দুই লাইনের মাঝখানে বসে আছে। তিরিশ মাইল গতি তুলে ওটার দিকে ছুটছে রানা। হাতে সময় নেই যে বগির নীচ থেকে বেরুবে। কাত হয়ে ঝুলছে, ঝটকা দিয়ে পিস্তল বের করেই গুলি শুরু করল জেরি ক্যান লক্ষ্য করে। এফএন ফাইভ-সেভেনএন-এর হাই ভেলোসিটি বুলেটগুলো ফুটো করে দিল ক্যানের পাতলা টিন। একটুও নড়ল না ক্যান। আর দশ ফুট

গেলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাবে রানার মুখ। এমন সময় কপালগুণে কণ্টেইনারের কোণে লাগল একটা বুলেট। জোড়ার উপর আঘাত পড়তেই লাফ দিয়ে সরল ক্যান। দুই ইঞ্চির জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যু এড়ানো গেল। এক সেকেণ্ড ঝুলে থাকল, তারপর শেষ গুলিটা খরচ করল রানা গিয়ারের উপর। ছিটকে বেরিয়ে গেল পাথরটা।

'আপনি গুলি করছেন, স্যর?' জানতে চাইল নিশাত।

'বোধহয় ব্রেক ঠিক করা গেল,' বলল রানা। বগির নীচ থেকে বেরিয়ে এল, বেয়ে উঠতে লাগল মই। 'আমাদের গতি কত?'

'বত্রিশ মাইল। সুন্দরীর ব্রেক কাজে লাগিয়েছি। তবে দ্রুত প্যাডের উপর থেকে খসে পড়ছে কার্বন ফাইবার।'

'ওটা বড় সমস্যা করবে না।'

'এরই জন্য সুন্দরী পিছনে চলছে?'

'হ্যাঁ। আপনি গিয়ার ডাউন করুন, ইঞ্জিনের শক্তি দিয়েই অনেকটা কমিয়ে আনা যাবে গতি। আমি বক্সকারের ছাতে উঠে দেখি ব্রেক কাজে লাগে কি না। দু' দিক থেকে বাধা পড়লে গতি কমবে।'

বক্সকার নিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে এক শ' ফুট নেমে এসেছে সুন্দরী। ঘুরে ঘুরে নামছে মালগাড়ি। ক্যাম্পের দিকে মুখ করে পিছিয়ে চলেছে সুন্দরী, পিছনে বক্সকার। উপরের পাহাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে জন্মেছে ঝোপঝাড়। ছাতে উঠল রানা। রেললাইন থেকে খানিক উপর দিয়ে গেছে একটা সড়ক। ওটা চোখেই পড়ত না, কিন্তু বাঁক ঘুরে হাজির হয়েছে বাদামি একটা ট্রাক।

মাথায় কাফিয়ে পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকের পিছনে। চট্ করে পিছনে চাইল রানা। ব্রেক মেরামত করতে যাওয়ার আগে বক্সকারের ছাতে রেখেছে রাইফেল। ঝুঁকে পড়ে ওটা তুলে নিতে চাইল, কিন্তু বগির পাশে চলে এসেছে দ্রুতগামী ট্রাক। ওটার ছাত থেকে ঝাঁপ দিল জঙ্গি।

বাতাসের তোড়ে হারিয়ে গেল লোকটার হুঙ্কার। ঠিক একই সময়ে খপ করে রাইফেলের ব্যারেল হাতে পেল রানা। কিন্তু লোকটা নেমে এসেছে বক্সকারের ছাতে। তার পা লাগল আরইসি৭-এর বাঁটে। ছিটকে গিয়ে ছাতের কিনারায় থামল রাইফেল। ভয়ঙ্কর রণহুঙ্কার ছাড়ল জঙ্গি, পরক্ষণে কারাতে কিক্ চালাল রানার মুখ লক্ষ্য করে।

চেষ্টা করেও আঘাতটা এড়াতে পারল না রানা। ঘাড়ে লাথি খেয়ে ব্যথায় অন্ধ হয়ে গেল ও, উপুড় হয়ে ধুপ করে পড়ল। তবে আবছা ভাবে বুঝল, কী ঘটতে চলেছে। পিঠ থেকে একে-৪৭ নামিয়ে তাক করতে শুরু করেছে লোকটা। সচেতনতা ফিরছে রানার, পিঠের নীচে রোদে তপ্ত ইস্পাতের অনুভূতি। গা মুচড়ে চিত হয়েই লোকটার দুই পা লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়ল রানা। ওর কপাল ভাল, জঙ্গির ডান শিন বোনে লাগল বাম পায়ের লাথিটা। রানার মাথার পাশে চারটে গর্ত তৈরি করল একে-৪৭। বগির ভিতর কে যেন কাতরে উঠল গুলি খেয়ে।

খপ্ করে রাইফেলের সামনের গ্রিপ ধরল রানা, গায়ের জোরে টান দিল। পায়ের ব্যথায় টলমল করছে জঙ্গি, তারই ভিতর দ্রুত পিছাতে চাইল। শক্ত করে গ্রিপ ধরেছে রানা, সহজেই উঠে দাঁড়িয়ে গেল। অস্ত্র ছেড়ে দিয়েই শত্রুর মুখে দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল। কিছুতে অস্ত্র ছাড়বে না জঙ্গি, কাজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। আরও দুটো জোরালো পাঞ্চ পড়ল নাকের উপর। লোকটার কাঁধের উপর দিয়ে রানা দেখল আরও দুই জঙ্গি এখনই উঠে আসবে বক্সকারের ছাতে।

প্রথম জঙ্গির পেটে কনুইয়ের গুঁতো পড়তেই উবু হয়ে গেল সে। তাকে চরকির মত ঘুরিয়ে দিল রানা। পাশ থেকে থাবা দিল ডানহাতের তর্জনীর উপর। একে-৪৭-এর মাযল ট্রাকের দিকে তাক হতেই বেরিয়ে গেছে এক পশলা বুলেট। এক লোক লাফ

দিতে গিয়ে ছিটকে পড়ল ট্রাক থেকে। ট্রেসার বুলেট খুবলে নিয়েছে বুক। ট্রাকের পিছন চাকার তলে পিষে গেল লোকটা। সামান্য লাফিয়ে উঠল সাসপেনশন।

তৃতীয় জঙ্গি ট্রাক থেকে উড়ে এল পাখির মত। সহজে বিড়ালের মত নামল বক্সকারের ছাতে।

দু' কাঁধ ধরে প্রথম জঙ্গিকে ঘুরিয়ে নিল রানা, পরক্ষণে বুকের পাঁজরে জোর ধাক্কা দিল। দুই পা পিছিয়ে গেল লোকটা, তবে সামলে নেয়ার আগেই পিছলে গেল। ট্রেনের ছাতের কিনারা থেকে ডিগবাজি দিয়ে নীচের দিকে রওনা হলো সে। মাথা থেকে খুলে গেল কাফিয়ে, ওটা বিরক্ত প্রজাপতির মত ডানা মেলে রওনা হলো আরেক দিকে।

হোলস্টারে থাবা দিল রানা, পিস্তল তুলেই ট্রিগার টিপল। পিস্তল খালি। দেরি না করে ছুঁড়ে মারল ওটা তৃতীয় জঙ্গির মুখ লক্ষ্য করে। এক সেকেণ্ড পর নিজেও ছুটল লোকটার উদ্দেশে। কাঁধ থেকে ক্যানভাসের স্লিং খুলছে জঙ্গি, তবে রাইফেল তুলবার আগেই পৌঁছে গেল রানা। লোকটার পেটে দুটো ঘুসি মেরেই কোমর জড়িয়ে ধরল, তুলে ফেলল উপরে, ছুঁড়ে দিতে চাইল ছাত থেকে। তিন ফুট উড়ে ছাতের উপরই ধুপ্ করে পড়ল জঙ্গি। চিত হয়ে পড়ে বুক থেকে ভুস্ করে বেরিয়ে গেল বাতাস। মেরুদণ্ড না ভেঙে থাকলেও আপাতত নড়তে পারবে না।

বোধহয় সুন্দরী থেকে কেউ দেখেনি বক্সকারের ছাতে কী ঘটছে। রানার কান থেকে খসে পড়েছে রেডিওর ইয়ার বাড, কোনও সময় পায়নি দলের সবাইকে সতর্ক করতে। গতি কমিয়ে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সুন্দরী। তবে বক্সকারের ব্রেক কাজ না করলে কিছুই করতে পারবে না। রানা আন্দাজ করল, ওরা চলেছে ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল গতিবেগে। সামনে ধীরে ধীরে বাঁক নিয়েছে রেললাইন, ক্রমশ নেমে গেছে। তবে সামনে যখন

চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ বাঁক পড়বে, উল্টে যাবে বক্রকার।

বগির উপর লাফিয়ে উঠতে চাইল আরও তিন জঙ্গি। তাদের দু'জন নেমে এল ছাতের উপর। তৃতীয়জন বাড়ি খেল বগির পাশে, পড়ে যাওয়ার আগেই খপ্ করে ধরতে চাইল ছাতের কিনারা।

রানার কাঁধে বাড়ি খেল সশস্ত্র জঙ্গিদের একজন। পরমুহূর্তে প্রচণ্ড ঘুসি এসে লাগল ওর কিডনির উপর। তীব্র ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলল রানা। খুশি হয়ে উঠল জঙ্গি, পর পর কয়েকটা ঘুসি মারল পেটে। রানা টের পেল ওর দ্বিতীয় পিস্তলটা বের করে আনা হচ্ছে হোলস্টার থেকে। ঝটকা দিয়ে সরে যেতে চাইল ও, কিন্তু ওর মেরুদণ্ড লক্ষ্য করে গুলি করেছে লোকটা। পিঠের উপর ছ্যাঁকা খেল রানা, আড়াআড়ি ভাবে পুড়ে গেল শার্ট। ও সরে যাওয়ায় দ্বিতীয় টেরোরিস্টের কণ্ঠনালীতে লেগেছে বুলেট, তপ্ত গুলি বেরিয়ে গেল সেভেন্থ ভার্টেব্রা ছিঁড়েখুঁড়ে। দু' দিকের ক্ষত থেকেই ছিটকে বেরুল রক্ত। কাত হয়ে পড়তে শুরু করেছে লোকটা।

তাকে এভাবে মরতে দেখেই বোধহয় হতবাক হয়েছে প্রথম জঙ্গি। সুযোগটা নিল রানা, তার ডানহাত খপ্ করে ধরেই মোচড় দিয়ে কেড়ে নিল পিস্তল। এক পা পিছিয়ে গুলি করল হৃৎপিণ্ড বরাবর।

প্রায় একই সঙ্গে ছাতের উপর পড়ল দুই লাশ।

'স্যর, শুনছেন?'

কানে ইয়ারপিস পরে নিল রানা, চোয়ালের পাশে থাকল মাইক। যোগাযোগ করল, 'হ্যাঁ, আপা। কী ব্যাপার?'

'আমাদের ব্রেক দরকার, স্যর,' জানাল নিশাত। 'এবং এখনই।'

মুখ তুলে চাইল রানা। ওরা দীর্ঘ বাঁক শেষ করছে। সামনে

নীচের দিকে গেছে রেললাইন, তারপর এক শ' গজ গিয়ে ডানদিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে। চরকির মত ঘুরেই হুইলের দিকে পা বাড়াল ও। তবে যে জঙ্গির মেরুদণ্ড ভাঙার কথা, সে পা বাড়িয়ে ল্যাং মারল। হুড়মুড় করে পড়ল রানা। উঠে বসল জঙ্গি, রানা কিছু করবার আগেই একলাফে চেপে বসল বুকের উপর। একের পর এক ঘুসি মারছে বুকে-মুখে। তবে তার ঘুসিতে জোর নেই। ধড়মড় করে উঠে বসতে চাইল রানা। বড় বেশি দ্রুত বাঁকের দিকে চলেছে বক্সকার।

পিঠের নীচে রানা টের পেল, ঢালু হয়ে গেছে রেললাইন। ঝটকা দেয়ার ফাঁকে গুটিয়ে নিল পা দুটো, ঠেকাল জঙ্গির বুকে, পরক্ষণে জুডোর মুভে থ্রো করল ওকে মাথার উপর দিয়ে। ছিটকে গিয়ে চিত হয়ে পড়ল জঙ্গি। শুয়েই চরকির মত ঘুরল রানা, ডানহাতের জোরে উঁচু হয়েই বাম কনুই নামিয়ে আনল লোকটার কণ্ঠার উপর। ছেঁচে গেল কার্টিলেজ, সিনিউ ও টিশ্যু।

উঠে দাঁড়িয়েই ধাতব হুইল খপ করে ধরল রানা, বন বন করে ঘোরাতে লাগল। বাঁক ঘুরতে শুরু করেছে বক্সকার। গতিবেগ কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল। এই বাঁকে চলবার কথা তিরিশ মাইল বেগে। কর্কশ আওয়াজ শুরু করেছে ব্রেকগুলো। চারপাশে ছিটকে পড়ছে রঙিন ফুলকি। তবে রানা জানে, বড্ড দেরি হয়ে গেছে ওদের।

দ্রুত গতি তুলে বাঁক নিচ্ছে বক্সকার। সেণ্ট্রিফিউগাল ফোর্সের কারণে বামদিকের চাকাগুলো উঠে আসতে চাইছে লাইন থেকে। যে-কোনও সময় উপড়ে আসরে ইস্পাতের রেল, বক্সকার ও সুন্দরীকে নিয়ে ছিটকে পড়বে। ব্রেকের হুইল ঘুরিয়ে চলেছে রানা, দশ সেকেণ্ড পর আটকে গেল ওটা। ব্রেকের শুগুলো থামিয়ে দিয়েছে চাকাগুলোকে। পিছন থেকে সুন্দরীর ইঞ্জিনের গর্জন শুনল রানা। সিলিণ্ডারগুলোর ভিতর নাইট্রাস অক্সাইড দিয়েছে নিশাত।

চেপ্টে যাওয়া চাকা থেকে ছিঁড়ে পড়ছে রাবার। পিছানোর বদলে উল্টো সামনে ঘুরছে রিমগুলো, কর্কশ আওয়াজ তুলছে ইস্পাতের ট্র্যাকের সঙ্গে। ফ্রেইট কারের বামদিকের চাকাগুলো প্রতিটি ঝাঁকির সঙ্গে উঠে আসছে। বিড়বিড় করে বলল রানা, যদি মানুষগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতাম! এখন বক্সকার বাঁচাতে হলে তাদের ওজনটা দরকার!

অসহায় বোধ করছে রানা, তারপর হঠাৎ মনে বুদ্ধি এল। টেরোরিস্টদের একটা একে-৪৭ তুলে নিয়ে দাঁড়াল ছাতের ডানদিকে। সামনে শুধু আ-দিগন্ত উপত্যকা নেমে গেছে। বক্সকারের পাশে গুলি করল রানা, এমন একটা অ্যাঙ্গেল বেছে নিয়েছে, ইস্পাতের দেয়ালে লেগে ছিটকে বেরুবে বুলেট। দেখতে না দেখতে ফুরিয়ে গেল ম্যাগাজিন। বগির ভিতর হুলুস্থুল শুরু হয়েছে। ডানদিক থেকে সরে বামদিকে চেপে গেছে মানুষগুলো। বাড়তি ওজনের কারণে বামদিকের চাকাগুলো আবারও বসে পড়ল রেলের উপর, ভারসাম্য ফিরে পেল বক্সকার।

বিদ্যুদ্বেগে বাঁক ঘুরল ওরা। সামনে আবারও দীর্ঘ রেললাইন। বিপদ কেটে যেতেই রানা টের পেল, এতক্ষণ আটকে রেখেছে শ্বাস। ফোঁস করে দম ফেলল, ঠিক করল এবার একটু বসে বিশ্রাম নেবে। কিন্তু ঠিক তখনই নিশাতের আতঙ্কিত কণ্ঠ শুনতে পেল: 'স্যর, ব্রেক খুলে দিন! জলদি!'

হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে রানা, তারই ফাঁকে পিছনে ফেলে আসা পথের দিকে চাইল। অন্য দিকে গেছে সড়ক, দেখা গেল না ডেযার্ট ট্রাক বা জঙ্গিদেরকে। কিন্তু পিছন থেকে তেড়ে আসছে আরেকটা ট্রাক। ওটা মডিফায়েড, ট্র্যাক ধরে ছুটে আসছে রেলগাড়ির মত! বক্সকার, দুই শ' মানুষ বা সুন্দরীর ওজন বহন করতে হচ্ছে না ওটাকে, ছুটে আসছে তীব্র গতি তুলে। ক্যাবের উপর দাঁড়িয়ে পড়েছে কয়েক জঙ্গি, হাতে অস্ত্র। শুধু রাইফেল নয়,

তাদের সঙ্গে রয়েছে রকেট-প্রপেল্ড গ্রেনেড লঞ্চারও!

সুন্দরীর উইণ্ডশিল্ডে আগেই অসংখ্য বুলেট লেগেছে, এখন একে-৪৭ থেকে কয়েক পশলা বুলেট এলে চুরচুর হয়ে ভাঙবে কাঁচ। তার চেয়ে বড় বিপদ, ক্যাবের ভিতর আরপিজি ঢুকলে ছিন্নভিন্ন হবে সবাই!

নিশাত আবারও গিয়ার বদল করে পিছাতে চাইছে। লো রেঞ্জের গিয়ারের কথা ভুলে গেছে, আশা করছে উপরেরগুলো ওদেরকে যথেষ্ট গতি দেবে। এখন হাতে সময় পাওয়া খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। ভাবছে, ওরা যদি রেললাইন ধরে দ্রুত পিছাতে পারে, টেরোরিস্টরা গুলি বা গ্রেনেড ছুঁড়তে পারবে না।

'আমাদের পরের কঠিন বাঁক কোথায়?' জানতে চাইল রানা। ওর জানা আছে, এখন ল্যাপটপে সুন্দরীর জিপিএস ট্র্যাকার থেকে মানচিত্র দেখছে নবী।

'দুই মাইল, মাসুদ ভাই।'

'মিসাইল?'

'অবশিষ্ট মাত্র একটা।'

'ওটা রেখে দাও। অন্য কিছু করতে হবে।'

একবার সুন্দরীর পিছন দিক দেখে নিল রানা, তারপর পাখির মত নেমে এল ট্রাকের বেড়ে। স্বর্ণা এম৬০ থেকে সরিয়ে দিয়েছে সবুর রহমানকে। বিসিআই এজেন্ট এখন কার্গো এরিয়ায় ফুয়াদ ও স্মৃতির সঙ্গে বসে আছে। ক্লান্ত লাগছে তাকে।

ওদের দিকে চাইল না রানা, ঢুকে পড়ল সুন্দরীর ক্যাবে। পিছন-দেয়ালের কেবিনেটের হিঞ্জ পিন খুলে ফেলল। দরজাটা তিন ফুট বর্গাকারের, ওজন কমপক্ষে ষাট পাউণ্ড। স্বর্ণার সাহায্য নিয়ে দরজাটা হ্যাচ দিয়ে গলিয়ে দিল, নিজে আবারও ফিরল ক্যাবের ভিতর। ওর সঠিক সময় বেছে নিতেই হবে এমন নয়, আসলে কপালের জোর থাকতে হবে পরিকল্পনা সফল করতে।

সিকি মাইল দূর থেকে ছুটে আসছে ট্রেন-ট্রাক, গতি আরও বাড়ছে। ওখান থেকে কে যেন খেয়াল করেছে ক্যাবের ভিতর রানা। ওকে লক্ষ্য করে একে-৪৭এর গুলি এল। তার আগেই বুকের সামনে বর্মের মত করে দরজার কবাট তুলে নিয়েছে রানা, মুষল বৃষ্টির মত এল বুলেটগুলো, ছিটকে চলে গেল আরেক দিকে। রানার মনে হলো স্লেজহ্যামারের আঘাত পড়ছে হাতের উপর।

সামান্য প্যাঁচানো একটা বাঁক পেরুতে শুরু করেছে সুন্দরী। কিছুক্ষণের জন্য ওদেরকে দেখতে পাবে না পিছনের ওরা। এই সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেছে রানা, ক্যাবের জানালা খুলে সাবধানে বের করল কবাট, ফেলে দিল রেললাইনের উপর।

ঠন-ঠনাৎ আওয়াজ তুলে ডানদিকের রেলের উপর পড়ল কবাট। কয়েক সেকেণ্ড পিছলে থেমে গেল একটা টাই-এর সঙ্গে। আর নড়ছে না।

আধ মিনিট পর বাঁক ঘুরল ট্রেন-ট্রাক। গতি কমপক্ষে ঘণ্টায় ষাট মাইল। সুন্দরীকে সামনে দেখল জঙ্গিরা, লোভনীয় টার্গেট। আরপিজি নিয়ে তৈরি হলো কয়েকজন।

আট

দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাল হাইব্রিড ট্রেন-ট্রাকের ড্রাইভার। নিজের জান তো রক্ষা করলই, বাঁচিয়ে দিল রানা ও অন্যদের প্রাণও। ট্র্যাকের উপর স্টিলের পাত চোখে পড়তেই বুঝে ফেলেছে কী

ঘটতে চলেছে। ইস্পাতের উপর ট্রাক চড়ে বসলে ছিঁড়ে বেরুবে রেললাইন। ফলাফল হবে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। কষে ব্রেক করল সে। মেঝের উপর রয়েছে একটা লিভার, বাম হাতে ওটা টান দিল। হাইড্রলিকস তুলে নিল ট্রেনের লোহার চাকাগুলোকে, ট্রাকের চেসিসের সঙ্গে সব সেঁটে গেল। রেললাইনের বাইরে দ্রুত ঘুরছে রেগুলার চাকা, ট্র্যাকের টাইয়ের উপর দিয়ে ছুটল।

দ্রুত খটা-খট শব্দ তুলে কমল ট্রাকের গতি, ক্যাবের উপর দাঁড়ানো জঙ্গিরা কোনও সুযোগই পেল না। নিজেদের স্থির রাখাই কঠিন, লক্ষ্যভেদ দূরের কথা। ট্রাক থেকে নানাদিকে ছুটল তাদের রকেট। কোনওটা গেল আকাশের দিকে, স্ক্রুর মত প্যাঁচ মারতে মারতে বিশাল আতসবাজির মত ফেটে পড়ল। কিছু গেল নীচের উপত্যকার মরুভূমিকে খুন করতে।

ধাতব পাত পেরিয়ে গেল ট্রাক, এবং সঙ্গে সঙ্গে গতি আরও কমিয়ে আনল বুদ্ধিমান ড্রাইভার। নতুন করে ট্র্যাকের উপর বসিয়ে নিল ট্রেনের লোহার চাকাগুলোকে।

তেমন কাজে আসেনি রানার বুদ্ধি। তবে ওদেরকে দিয়েছে আধ মাইল দূরত্ব। সামনে পড়বে তীক্ষ্ণ বাঁক। আবারও বক্সকারের উপর উঠে ঘোরাতে হবে ব্রেকের হুইল। সুন্দরীর পিছনে চলে গেল রানা, পোড়া রাবারের দুর্গন্ধে কুঁচকে গেল নাক। ছিঁড়ে পড়ছে চাকাগুলো। আবার চল্লিশ মাইল গতি তুলে ছুটছে ওরা। রানাকে উড়িয়ে নিতে চাইছে হু-হু বাতাস। ওটার জন্য বক্সকারের ছাতে ওঠা কঠিন হবে। বক্সকার ও সুন্দরীর মাঝের সংকীর্ণ অংশ দেখে নিল। নীচে চোখ পড়তেই দেখল সাঁই-সাঁই করে পিছিয়ে চলেছে কয়লা মাখা কালো টাইগুলো।

আপাতত উপরের দিকে উঠছে রেললাইন, একটু সামনে পড়বে বাঁক। কমে এল ট্রেনের গতি। তবে এটা চলবে কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর আবারও নীচের দিকে রওনা হবে ট্র্যাক।

সুন্দরী বা বক্সকারের গতি এখনও ঢের বেশি। বাঁক ঘুরতে শুরু করলে রেললাইন উপড়ে ছিটকে পড়বে ওরা। দু'দিকের দুই রেল অসমতল হয়ে গেল, লাফাতে লাফাতে ঢাল বেয়ে উঠছে বক্সকার। ছাত থেকে রেললাইনের পাশে খসে পড়ল দুই টেরোরিস্টের লাশ। ছাতের উপর থাকল কেবল এক জঙ্গির দেহ। তার কণ্ঠার হাড় চুরমার করে দিয়েছে রানা।

পাহাড়ি ঢালের চূড়ায় উঠে এল বক্সকার, সুন্দরীর প্রচণ্ড শক্তি কোনও কাজেই এল না, আবার নীচের দিকে ট্র্যাক নামতে শুরু হওয়ায় বাড়ল গতি।

কয়েক সেকেণ্ড ঝুলে থেকে বক্সকারের ছাতে উঠে এল রানা, একবার চেয়ে দেখে নিল জঙ্গির লাশটা, তারপর দুই হাতে ধরতে চাইল ব্রেকের হুইল। আর ঠিক তখনই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লাশটা! বড় দেরি করে ফেলেছে রানা। ওর মনে পড়ল, যাকে খুন করেছে, তার মাথায় ছিল নীল কাফিয়ে। এর মাথারটা লাল। খানিক আগে ছাতে নামতে গিয়ে লাফ দিয়েছিল তিন জঙ্গি। তাদের একজন ছাতে উঠতে পারেনি। এ-ই সেই লোক, ছাতের কিনারা ধরে ঝুলছিল! ও সুন্দরীতে ফিরতেই উঠে এসেছে। লাশ ফেলে ভঙ্গি নিয়েছে সে নিজেই সেই মৃত।

পলকের মধ্যে এসব ভাবল রানা, দুই পা দিয়ে জড়িয়ে ধরল লোকটার হাঁটু—পড়তে শুরু করেছে তাকে নিয়ে। লোহার ছাতে আছড়ে পড়ল। ওর দুই ঊরুর উপর পড়ল লোকটা। নতুন করে চমকে গেল রানা। আক্রমণকারী বিশালদেহী লোক, ওজন ওর চেয়ে অন্তত আশি পাউণ্ড বেশি!

কোমরের পিছনে খোঁচা দিচ্ছে ওয়ালথার। ওটা বের করতে পারবে না। রানা বের করতে চাইল হোলস্টারের পিস্তলটা। তবে সবই বুঝতে পেরেছে জঙ্গি, তার প্রকাণ্ড থাবা পড়ল রানার হাতের উপর। ঝট্‌কা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল রানা, শরীর মুচড়ে সরে

যেতে চাইল। তারই ফাঁকে সামনের দিকে চলে গেল চোখ। দ্রুত কাছিয়ে আসছে বিপজ্জনক বাঁক!

লোকটা যেন মস্ত পাহাড়! নড়ছে না!

মরিয়া হয়ে বলল রানা, 'যদি না ছাড়ো, দু'জনই মরব।'

'তা হলে একইসঙ্গে মরছি,' হিসহিস করে বলল জঙ্গি। আনমনে একই কথা বলল উর্দু ভাষায়। তার ডান কনুই আচমকা নামল রানার ঊরুর উপর। পাকিস্তানি সবই বুঝেছে। শত্রুকে উঠতে দেবে না। গেঁথে রেখেছে ছাতের সঙ্গে। ঠিক করেছে, ওপারে যাবে শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে।

বাইন মাছের মত মুচড়ে কাত হতে চাইল রানা। ছিঁড়ে পড়তে চাইল পিঠের পেশি। বামে কাত হতে পেরেই গায়ের সমস্ত জোর ব্যবহার করে ডানহাতি ঘুসি মারল লোকটার চোয়াল লক্ষ্য করে। করোটি ও চোয়াল যেখানে যুক্ত, সেখানে লাগল ঘুসি। বিশ্রী খট্টাস্ আওয়াজে খুলে গেল চোয়ালের জয়েন্ট। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিহ্বল হলো লোকটা। ঝটকা-ঝটকি শুরু করেছে রানা, সে সঙ্গে লাথি দেয়ার চেষ্টা করছে। ডান হাঁটুর গুঁতো পড়ল লোকটার পিঠে। অজান্তেই গড়িয়ে নেমে গেল পাকিস্তানি। লাফ দিয়ে উঠে বসল রানা, পরক্ষণে ওর ঘুসি নামল আগের সেই খোলা জয়েন্টের উপর। তীব্র ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, ব্রেকের হুইল ধরেই বনবন করে ঘোরাতে শুরু করেছে। মাত্র কয়েক পাক ঘুরিয়েছে, তখনই চোক হোল্ডে আটকা পড়ল। গলা পেঁচিয়ে ধরেছে পাকিস্তানিটার রোমশ হাত। হাঁটু ভাঁজ করে ফেলেছে রানা, ছাতে ঠুকে উপরের দিকে তুলতে চাইল দুই পা। পরক্ষণে এক পা রাখল হুইলের উপর, আবারও ঝটকা দিল। খুলে গেল হোল্ড। উল্টো ডিগবাজি দিয়ে পাকিস্তানির পিঠ ডিঙিয়ে চলে এল পিছনে। সামনের লোকটার উচ্চতা কমপক্ষে এক মাথা বেশি। জঙ্গি পাক খেয়ে ঘুরে

দাঁড়াতেই রানার তৃতীয় ঘুসি পড়ল আবার ওর আহত চোয়ালের উপর। এবার মড়াৎ আওয়াজে ভেঙে গেল হাড়।

প্রচণ্ড ব্যথায় পাগল হয়ে উঠেছে জঙ্গি, দু' হাতে ভালুকের মত জড়িয়ে ধরতে চাইল শক্রকে। প্রায় বসে পড়ে এড়িয়ে গেল রানা, দু' হাতে ঘুসি মারল লোকটার পেটে, পরক্ষণে আবারও ফিরল হুইলের দিকে। বুঝতে পারছে বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আরও দুই পাক ঘুরিয়ে দিল হুইল, চাকাগুলোকে চেপে ধরছে উত্তপ্ত ব্রেক।

কোনও শব্দ পেল না রানা, তবে ওর মন জানিয়ে দিল, আবার হামলা আসছে। এবার ঘুরবার আগেই শিরদাঁড়ার কাছে গোঁজা ওয়ালথারটা তুলে নিল, পরক্ষণে ঘুরে দাঁড়াল। ওর ওয়ালথার সহ হাতটা খপ্ করে ধরেই বগলের নীচে নিয়ে গেল জঙ্গি, অপর হাতে কনুইটা ধরে ঠেলা দিল উপর দিকে। রানা টের পেল দুই পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পরমুহূর্তে রানার কনুই ছেড়ে নিজের কনুইটা চালাল ওর কাঁধের উপর—ভাঙতে চাইছে কলার বোন। আঘাতটা কাঁধ ঝাঁকিয়ে এড়াতে চাইল রানা। তবু ব্যথা লাগল, তবে নাজুক ক্ল্যাভিকলে না লেগে আঘাত পড়েছে সকেট জয়েন্টের উপর। হাত থেকে পিস্তল পড়ে গেল বগির ছাতে।

শক্রকে ব্যথায় মুখ কোঁচকাতে দেখে খুশি হয়ে উঠছে জঙ্গি, পুরু ঠোঁটের আড়াল থেকে বেরুল হলদেটে দাঁতের কোদাল। লোকটার গ্রিপের ভিতর শিথিল হয়ে গেল রানা, পরমুহূর্তে হাঁটু তুলেই গুঁতো মারল ওর কুঁচকির উপর। সেইসঙ্গে হোলস্টার থেকে ঝটকা দিয়ে তুলে নিল এফএন ফাইভ-সেভেনএন পিস্তল। ওটা আগে থেকেই কক্ করা, ট্রিগার টিপে দিতেই ভারী বুলেট ছোবল দিল লোকটার বুকে। ছিটকে দুই পা পিছাল পাকিস্তানি জঙ্গি, তারপর দড়াম করে পড়ল ছাতের উপর চিত হয়ে।

পুরো ব্রেক আটকে দিতে না দিতেই বাঁক ঘুরতে লাগল

বক্সকার। গতবারের সেই বিপদ আবারও হলো। ডানদিকের চাকা উঠে আসছে ট্র্যাক থেকে। বগি একবার কাত হলে রেললাইন ছিঁড়ে ছিটকে পড়বে, সঙ্গে নেবে সুন্দরীকে। তবে বক্সকারের ভিতর কেউ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে পরিস্থিতি। হঠাৎ ট্র্যাকের উপর নেমে এল চাকাগুলো। বিপুল কাউন্টারওয়েটকে কাজে লাগিয়ে ভারসাম্য রাখছে লিবিয়ানরা।

ব্রেকের হুইল থেকে চোখ তুলে চাইল রানা। একটু আগে যে ঢিবি পেরিয়ে এসেছে, এইমাত্র তার চূড়া পেরুল টেরোরিস্টদের ট্রেন-ট্রাক। সুন্দরীর ক্যাবের নীচ থেকে বেরুল ধূসর ধোঁয়া। মুহূর্ত পর অটোফায়ারের আওয়াজ শুনল রানা। সুন্দরীর টার্গেটিং কমপিউটারটা ঢিবির উপর লক করেছে নবী। এতক্ষণ অপেক্ষা করেছে কখন দেখা দেবে মানুষ-শিকারীরা।

ধেয়ে আসা আনআর্মড ভেহিকলের সামনের দিক ছিঁড়তে শুরু করেছে ৭.৬২ এমএম রাউণ্ড। মুহূর্তে উধাও হলো উইণ্ডশিল্ড, হাজার টুকরো কাঁচ ঢুকল ক্যাবের ভিতর। কয়েকটা বুলেট ফুটো করে দিল রেডিয়েটারকে। গ্রিল দিয়ে বেরুনো বাষ্পের তপ্ত মেঘ ঘিরে ফেলল পুরো ট্রাককে। ইঞ্জিন কমপার্টমেণ্টে ঢুকল অজস্র বুলেট। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ভঙ্গুর ডিসট্রিবিউটার, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ইঞ্জিন। একটা রাউণ্ড কেটে দিল হাইড্রলিক লাইন, ফলে আর বিস্তৃত রইল না ট্রাক-ট্রেনের লোহার চাকা। ওগুলো এত দ্রুত কাত হলো যে ড্রাইভার কিছুই করতে পারল না। হঠাৎ রেলরোডের টাইয়ের উপর নেমে এল টায়ারগুলো, ঝাঁকি খেয়ে আকাশে উঠল ট্রাকের পিছন দিক। দুই জঙ্গি কার্গোবেড থেকে গিয়ে পড়ল ক্যাবের ছাতে, সেখান থেকে ছিটকে গেল সামনের রেললাইনের উপর। মুহূর্তে ট্রাকের নীচে পিষে গেল তারা।

সামনের সাসপেনশন মড়াৎ করে ভাঙল, প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে বাবারে বলে বসে পড়তে চাইল ট্রাক। চারদিকে ছিটকে পড়ল

ব্যালাস্ট পাথর। হঠাৎ গতি থামল গাড়িটার, ওটাকে ঘিরে ফেলল বাষ্প ও ধুলো।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে চেয়ে আছে রানা, ঠিক তখন কানে এল উপত্যকার দূর থেকে ভেসে আসা গম্ভীর গর্জন।

ওটা বোধহয় এয়ার হর্নের হুঙ্কার, ডিজেল-ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের না হয়েই যায় না। রানার ধারণা ছিল এত কম সময়ে ওটা চালুই হবে না। কিন্তু নিজ চোখে দেখল, উঠে এসেছে ওটা টিবির উপর, দ্রুত ছুটে আসছে! রেলবেড থেকে পনেরো ফুট উঁচু এক-চোখওয়ালা ভয়ঙ্কর দানব। ইঞ্জিনটার ওজন হবে এক শ' টনের অনেক বেশি। এগযস্ট থেকে বেরুনো তেলতেলে কালো ধোঁয়া বলছে, মোটেই মেইনটেন্যান্সের জন্য সময় দেয়া হয় না। তবে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ওই দানবীয় রেলইঞ্জিন বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে সুন্দরী বা বক্সকারের।

ট্রেন-ট্রাকের কার্গোবেডে যারা ছিল, তাদের ভিতর কয়েকজন ভাগ্যবান, লোকোমোটিভ ছুটে আসবার আগেই লাফিয়ে নেমে পালাতে লাগল তারা। ধসে পড়া ট্রাকে প্রচণ্ড গুঁতো দিল রেলইঞ্জিন, যেন বিস্ফোরিত হলো ট্রাকে রাখা বোমা, সব চুরমার হতে লাগল। ধাতব পাত, ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশ এবং চেসিস ছিটকে সরে গেল। কিছুই হলো না রেলইঞ্জিনের, যেন পাখির পালক সরিয়ে দিল। ট্রাকের চেপ্টে যাওয়া গ্যাস ট্যাঙ্ক থেকে ভলকে বেরুল কমলা আগুন, তার ভিতর দিয়ে ছুটে এল লোকোমোটিভ।

আগুন পিছনে ফেলে আসছে। ভাঙারির মাল মনে হলো ভাঙাচোরা ট্রাক-ট্রেইনকে। এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

দানবটাকে এক পলক দেখে নিয়ে ব্রেকের হুইল খুলতে শুরু করল রানা। সামনে তীক্ষ্ণ বাঁক থাকুক বা না থাকুক, মূল কথা: ওদেরকে লেজ তুলে পালাতে হবে, নইলে বাঁচবে না একজনও!

সুন্দরীর পাশ থেকে ছিটকে বেরুল সাদা আলোর বর্শা, দেখা

গেল আগুনের মস্ত লেজ নিয়ে ছুটতে শুরু করেছে মিসাইল। শেষ রকেট ফায়ার করেছে নবী। শ্বাস আটকে ফেলল রানা। লোকোমোটিভের দিকে ছুটছে ক্ষেপণাস্ত্র। কয়েক সেকেণ্ডে গন্তব্যে পৌঁছে গেল রকেট। ট্রাক ও রেলইঞ্জিনের সংঘর্ষের সময় যে বিস্ফোরণ হয়েছে, তার শতগুণ আলো চারদিকে ছিটকাল। রেলইঞ্জিনকে গিলে ফেলল প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ডুলি। চারপাশ কেঁপে উঠল বিস্ফোরণের আওয়াজে। দূর থেকে মনে হলো একটা উল্কা ওটা, রেললাইন ধরে ছুটে আসছে। গনগনে আগুন ও পাক খাওয়া ধোঁয়া চাটছে ওটার শরীর।

নিজ কাজ করেছে মিসাইল, কিন্তু মোটেই পাত্তা দিল না দুই লাখ পাউণ্ডের দৈত্যটা। রেলইঞ্জিন যেন ছুটন্ত যুদ্ধরত সামরিক ট্যাঙ্ক, এবং ওটার দিকে ছোঁড়া হচ্ছে গুলতির মার্বেল! সুন্দরীর দিকে হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসছে লোকোমোটিভ, যেন এক গ্রাসে গিলে নেবে!

রানাদের ছোট্ট কারাভাঁ আবারও গতি ফিরে পাচ্ছে। তবে ডিজেল-ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের চেয়ে ওদের স্পিড ঢের কম। দ্বিগুণ গতি তুলে আসছে লোকোমোটিভ। সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক মুহূর্তে রানার মন চাইল, লাফিয়ে নেমে যায়। কিন্তু চিন্তাটাকে মনের ভিতর ডানা মেলতে দিল না। সঙ্গীদের ফেলে কখনও পালাবে না ও।

সুন্দরীর ষাট গজ পিছনে তেড়ে আসছে রেলইঞ্জিন, এখন আর গা চাটছে না লেলিহান আগুন। ইঞ্জিন কাভারের নীচের দিকে পুড়ে যাওয়া একটা গর্ত, জ্বলে গেছে রং। ওই অংশ না দেখলে কেউ বুঝবে না ওখানে আঘাত হেনেছে চার পাউণ্ডের সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল।

তবে রানার দেখবার কথা নয়, লোকোমোটিভের নীচে কী ঘটছে। ওখানে স্টিলের ফ্রেমের সঙ্গে আটকানো হুইল ট্রাক।

সেখানে সরাসরি মিসাইলের ওয়ারহেডের প্লাজমা লেগেছে মাউন্টিং পিনগুলোর উপর। পুরনো রেললাইনের উপর আরেকবার ঝাঁকি খেল লোকোমোটিভ, আর তারপরই খসে পড়ল পিনগুলো। সামনের চারটে হুইল একইসঙ্গে ডিরেইল হলো। লোহার চাকা ছিন্নভিন্ন করল পুরু গুঁড়ির টাইগুলোকে। চড়চড় করে উপড়ে এল ট্র্যাকের তিরিশ ফুট লাইন।

সামনে রেললাইন নেই যে ইঞ্জিনটাকে আটকে রাখবে, পুরো পাগল হয়ে উঠল লোকোমোটিভ। কয়েক ফুট গিয়েই স্লো মোশনে কাত হতে লাগল। দড়াম করে পড়ল ডানদিকে, ছেঁচড়ে চলেছে। চারদিকে ছিটকে উঠল ব্যালাস্ট পাথর, উপড়ে গেল কয়েক ডজন টাই। মাটি-পাথরের সাধ্য নেই ভারী জিনিসকে থামিয়ে দেবে। লোকোমোটিভের মৃত্যু ঘনিয়ে এলেও গতি এখনও প্রচণ্ড, সুন্দরীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানো যাবে না।

সুন্দরীর নাকের সামনে মাত্র বিশ ফুট দূরে রেলইঞ্জিন, মোটেই কমেনি গতি। রানার মনে হলো, নিশাত মেঝের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে অ্যাক্সেলারেটার, মনে আশা, যদি সবাইকে রক্ষা করা যায়! এখনও বাঁক ঘুরছে সুন্দরী ও বক্সকার। ট্র্যাক স্পর্শ করে ছুটছে, তবে যে-কোনও সময়ে পাহাড়ি বাঁক থেকে ছিটকে পড়বে।

সামনে নির্ধারিত ট্র্যাক নেই, তারপরেও সরাসরি ওদের দিকে ছুটে আসছে লোকোমোটিভ। বিপুল ওজন ও গতি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। তারপর সুন্দরীর মাত্র এক ফুট সামনে দিয়ে ট্র্যাক পেরিয়ে ছেঁচড়ে চলে গেল রেলইঞ্জিন খাড়া উপত্যকার কিনারায়। ওখানে কোনও গার্ডরেইল নেই, থাকলেও উড়ে যেত ধাক্কা খেয়ে। লোকোমোটিভের নাক নীচের দিকে তাক হলো, তারপর শুরু হলো গভীর খাড়াইয়ে পতন। সঙ্গে চলল বৃষ্টির ফোঁটার মত অজস্র পাথর। খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে গিয়ে ডিগবাজি খেতে শুরু

করল লোকোমোটিভ।

সুন্দরীর ক্যাব থেকে নীচের দিক দেখতে পেল না নিশাত ও নবী, তবে বক্সকারের ছাত থেকে সবই দেখছে রানা। কাজেই ব্রেকের হুইল আটকাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। পাহাড়ি ঢালে গড়িয়ে নামছে লোকোমোটিভ, পতনের গতি আরও বাড়ছে। হঠাৎ ফেটে গেল ওটার প্রকাণ্ড পেটটা, জ্বলে উঠল ফিউয়েল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। চারপাশে উড়ছে প্রচুর ধুলো, দেখা গেল না ইঞ্জিনের শেষ পরিণতি। তবে পাথুরে উপত্যকার উপর আছড়ে পড়ার বিকট আওয়াজ শোনা গেল পরিষ্কার।

ডানদিকের চাকাগুলোর উপর ভরসা করে বাঁক নিল বক্সকার। রানার মনে হলো, বগি আর কোনওদিন সোজা হবে না। তবে অ্যান্টিক বক্সকার নিরাপদে বাঁক শেষ করল, বামদিকের চাকাগুলো আবারও বসে গেল ট্র্যাকের উপর। ব্রেক হুইলে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল রানা, হতক্লান্ত।

ওর মনে পড়ল, মাত্র মাইল দশেক গেলেই পৌঁছবে কোলিং স্টেশন ও ডকে। ওখানে ওদের জন্য মার্ভেলকে নিয়ে অপেক্ষা করছে সোহেল।

আরেকটা কথা ভাবতেই ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। কোথায় গেল এমআই-৮ কপ্টার? বয়স্কা মহিলাকে উদ্ধার করবার আগে শুনেছে রোটরের আওয়াজ। তা হলে? ওটা নিয়ে এল না কেন জঙ্গিরা? অ্যাসল্টের জন্য স্থির প্ল্যাটফর্ম নয় কার্গো কপ্টার, তবে ওদেরকে ধরতে যে চেষ্টা করেছে জঙ্গিরা, তাতে এমআই-৮ নিয়ে হামলা করাই স্বাভাবিক ছিল।

পরের পাঁচ মিনিট একের পর এক মসৃণ বাঁক পেরুল ওরা। মাত্র একবার ব্রেক করতে হলো। বিশ্রামের ফাঁকে কমিউনিকেশন নেটে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল রানা। বড় একটা বাঁক ঘুরছে সুন্দরী ও বক্সকার, ওপাশ দেখা গেল না।

কিন্তু মোড় ঘুরতেই চমকে গেল রানা। হৃৎপিণ্ডের ভিতর হিমশীতল হয়ে এল রক্ত।

এতক্ষণ পাহাড়ি পথে চলেছে রেললাইন, কিন্তু সামনে বুনো-পশ্চিমের রেল-সেতুর মত একটা। যেন প্রাচীন আমলের কাঠের রোলার কোস্টার। অসংখ্য বিম দিয়ে তৈরি জটিল আকৃতি। এতই পুরনো, রোদে ও বাতাসে সাদাটে হয়ে গেছে কাঠ। উপত্যকার বহু নীচে মেঝে, কমপক্ষে এক শ' ফুট উপরে সেতু। তার মুখের কাছেই একপাশে নেমে বসে আছে এমআই-৮, এখনও সামান্য ঘুরছে রোটর।

রানা দেখল, সেতুর ফ্রেমওঅর্কে উঠেছে কয়েক জঙ্গি। বুঝতে দেরি হলো না, এরা বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে সেতু।

নয়

জঙ্গি ক্যাম্পের কমাণ্ডার রহমত শরীফুল্লাহ্ অনেকক্ষণ ধরে ডায়াল করছে। এইমাত্র ওই প্রান্তে পাওয়া গেল সেল ফোনের সংযোগ। শরীফুল্লাহ্ জানে না ভয় পেতে হবে, না খুশি হওয়া উচিত।

'শুনছি,' রাগী অশুভ কণ্ঠ বলল। যেন গভীর কোনও কূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে শব্দটা। গলার আওয়াজ এমনই, যে-কোনও মানুষের বুক কেঁপে উঠবে।

নিজের নাম বলবার প্রয়োজন নেই রহমত শরীফুল্লাহ্‌র। মাত্র কয়েকজন লোক যোগাযোগ করতে পারে ওই স্যাটালাইট ফোনে। কলটা যে ধরেছে সে জানে ও কে, আর ও-ও ভাল করেই জানে

ওই ভয়ঙ্কর গলার আওয়াজটা কার। ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'উনি ব্যস্ত। আমাকে বলো।'

শরীফুল্লাহ্র ভাবতেই খারাপ লাগে এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছে ঘৃণিত ইজরায়েলিরা। তবে এটা ঠিক, এর উপকারিতার কোনও শেষ নেই। মুহূর্তে পৌঁছে যাওয়া যায় কাছে-দূরে যে-কোনও জায়গায়। তা ছাড়া এক শ' ভাগ সিকিউর। ও-প্রান্তে আবছা আওয়াজ শুনছে। জাহাজের ভেঁপু বেজে উঠল, সঙ্গে বয়ার ঘণ্টির ধাতব ঠনাঠন আওয়াজ। ভুরু কুঁচকে ভাবল, কোথায় লোকটা? নীরবে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল শরীফুল্লাহ্, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। ইমামকে বলবেন বন্দিরা পালিয়ে যাচ্ছে।'

'কীভাবে?'

'মনে হচ্ছে প্রহরীদেরকে কোনভাবে কাবু করে উঠে পড়েছে একটা বক্সকারে। চুরি করা ছোট একটা ট্রাক ওটাকে রেললাইনের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' ওদিক থেকে কোনও কথা নেই। শরীফুল্লাহ্ আবার শুরু করল, 'কয়লার খনিতে ওদেরকে ঠেকানো যায়নি। আমাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প থেকে কয়েকজন ভাই যায়। কিন্তু তারাও ঠেকাতে পারেনি ওদেরকে। শেষে হেলিকপ্টারে করে কয়েকজনকে পাঠিয়েছি। তারা কাঠের সেতু উড়িয়ে দেবে। আর পালাতে পারবে না বন্দিরা।'

শরীফুল্লাহ সশব্দে ঢোক গিলল। একটু থেমে আবার শুরু করল, 'আমি... ভাবছি... এখানে খোঁড়াখুঁড়ি করে কোনও লাভ নেই। আমেরিকান আর্কিওলজিস্ট জানিয়েছে আদি ইউনুস আল-কবিরের গোপন আস্তানা এই উপত্যকায় ছিল না, দক্ষিণে থাকবার কথা 'কালো কিন্তু জ্বলে' এমন পাহাড়। আল-কবিরের রণতরী ছিল তিউনিশিয়ার একটা নদীতে। ওখানে লোক পাঠানো হয়েছে, যে-কোনও সময়ে পেয়ে যাবে জাহাজটাকে।'

ওপাশ থেকে নীরবতা। ঠং-ঠং করছে বয়া, মাঝে মাঝে আসছে এয়ার হর্নের আওয়াজ।

'আপনি এখন কোথায়?' অধৈর্য হয়ে বলল শরীফুল্লাহ্।

'এ নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। বলতে থাকো।'

'এখন তো আমাদেরকে নতুন করে খনি চালু করতে হচ্ছে না। জানাই হয়ে গেছে এই খনির ভিতর নেই জাহাজটা। তাই মনে হয়েছে সেতু উড়িয়ে দিলেও ক্ষতি নেই। তাতে সব দিক থেকে ভাল হবে। আমরা বন্দিদেরকেও শেষ করতে পারব, আবার এখানকার ক্যাম্পও গুটিয়ে নিতে পারব।'

'আমাদের এলিট ফোর্সের কতজন আছে ক্যাম্পে?'

জবাব দিতে দেরি করল না শরীফুল্লাহ্, 'পঞ্চাশজনের মত।'

'বন্দিদেরকে খতম করার মত সামান্য কাজে এলিট ফোর্সকে কাজে লাগাবে না। ওই কাজ করতে সাধারণ ভাইদের পাঠাও। ওদেরকে জানিয়ে দাও: যদি শহীদ হয়, তাদেরকে ভাবতে হবে না, আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহ করবেন জান্নাতে। স্বয়ং ইমাম এ কথা বলেছেন।'

কথা শুনে দমে গেল শরীফুল্লাহ্। আগেই ক্র্যাক ট্রুপ পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন সময় নেই যে তাদেরকে সরিয়ে আনবে। বদলে জানতে চাইল সে, 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কী ব্যবস্থা?'

'আধ ঘণ্টার ভিতর তোমার ওখানে পৌঁছে যাবে কপ্টারগুলো। তার একটা সরিয়ে নেবে মহিলাকে। এখন মূল কাজ বন্দিদেরকে শেষ করা। তোমার নিশ্চিত হতে হবে আমাদের এলিট ফোর্স যেন ঠিকঠাক মত পৌঁছে ত্রিপোলিতে। মিটিঙে অনেক সিকিউরিটি পারসোনেল থাকবে, তাদেরকে শেষ করে ঢুকতে হবে মেইন হলে। একবার ভিতরে ঢুকতে পারলে সমস্যা হবে না, সরকারী অফিসারদের কাছে অস্ত্র থাকবে না। ওখানে বিধর্মীদের নাপাকী রক্ত ঝরবে, শেষ হবে শান্তি মহাসম্মেলনের নামে কাফেরদের

সঙ্গে মাখামাখি। শেষ হয়ে আসছে মুয়াম্মার গাদ্দাফির সময়। কিছু দিনের ভিতর দেশের ক্ষমতা নিয়ে নেব আমরা।'

আগে কখনও এই লোককে এত কথা বলতে শোনেনি রহমত শরীফুল্লাহ্। তার মনে হলো, মানুষটা হয়তো সত্যিই আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা, ইমাম ইউনুস আল-কবিরের সত্যিকারের অনুসারী। শরীফুল্লাহ্ কখনও স্বীকার করবে না, তবে বারবার তার মনে হয়েছে ইমামের ভিতর রয়েছে চরম ফ্যানাটিসিজম।

যেসব ছেলেদের সে রিক্রুট করে, তারা অনেক কথাই বলে। ওদের বেশিরভাগ এসেছে বস্তি থেকে। তবে রিক্রুটদের ভিতর ধনী লোকের ছেলে যে নেই, তা-ও নয়। এরা সবাই ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে ইসলামের শত্রুদেরকে, এসবের মাধ্যমে বাড়িয়ে নিতে চায় নিজ মনোবল। একে অপরকে সাহস দেয়। অনেক বছর আগে নিজেও লেবানিজ সিভিল ওয়ারে শরীফুল্লাহ্ তা-ই করত। তবে স্বীকার না করলেও নিজের অন্তরে প্রত্যেকে জানে বিধর্মীদের অত্যাচার করা একটা বাহানা, তাদের ঘৃণা করার মাধ্যমে আরও অনুগত হতে চায় ইসলাম ধর্মের প্রতি। কিন্তু শেষে, বেশিরভাগই হয়ে যায় পাথরের মত। পরে আর ভালভাবে পিস্তলও ধরতে পারে না। বাধ্য হয়ে ওদেরকে নকল ভেস্ট পরিয়ে পাঠাতে হয় সুইসাইডাল মিশনে। তখন এসব গাধা নিশ্চিন্ত থাকে, আর সবার যা হয় হোক, আমার কিচ্ছু হবে না।

তবে ফোন লাইনের ওই প্রান্তে যে লোক, সে অন্য ধাতু দিয়ে তৈরি। শরীফুল্লাহ্ জানে, ওই লোক দিনের পর দিন তলোয়ার দিয়ে কতল করেছে বিধর্মীদেরকে। চেচনিয়ার দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ে রাশান সৈনিকদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে। বাগদাদে আমেরিকান সৈনিদের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ টুকরো টুকরো করে তার দিয়ে গেঁথে দিয়েছে। আপন ভাতিজাকে পর্যন্ত কাজে লাগিয়েছে। ষোলো বছরের ছেলেটা ছিল অটিস্টিক। দুই বছরের বাচ্চার মত

মগজ ছিল, দশটা ভুট্টার দানার সঙ্গে একটা পাথর দিলে তফাৎ ধরতে পারত না। ছেলেটাকে পাঠানো হয় বসরা শহরের সুন্নী লণ্ড্রোম্যাটে। বুকে-পেটে বেঁধে দেয়া হয় চল্লিশ পাউণ্ড বিস্ফোরক ও থলি ভরা পেরেক। উদ্দেশ্য ছিল শিয়া ও সুন্নীদের ভিতর বিরোধ তৈরি করা। ওই বিস্ফোরণে মারা যায় পঁয়তাল্লিশজন মহিলা ও তরুণী। এর ফলে যে রায়ট হয় তাতে মারা পড়ে শ' দুয়েক লোক।

রহমত্ত শরীফুল্লাহ্ জানে নিজ দায়িত্ব পালন করবে ও, এবং তা নিজের জন্য নয়, শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্র জন্য। ইমামের কাছের মানুষের কাছেই শুনেছে, ইমাম ইউনুস আল-কবিরের দেহরক্ষী শুধু আনন্দের জন্য মানুষ খুন করে। এটা ইমামের সংগঠনে গোপন তথ্য নয় যে ওই লোক নিজে কখনও ধর্মের বিধান মেনে চলে না। মুসলিম পরিবারে জন্ম বটে, তবে কখনও প্রার্থনা করে না। কোনও ধর্ম বিশ্বাস করে না সে। কেউ শোনেনি যে কোনদিন রোজা রেখেছে। নিষিদ্ধ সব কিছুই খায়।

কেউ জানে না কেন ইমাম এই অধার্মিককে কাছে রেখেছেন। শরীফুল্লাহ্র মত সিনিয়র কমাণ্ডাররা নিজেদের ভিতর এ নিয়ে আলাপ করে। তবে সেসব কথা কখনও ইমামের কানে পৌঁছে না। কিছুদিন আগে চার কমাণ্ডার ইমামের দেহরক্ষীর বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। তাদের জিভ ও নাক কেটে নেয়া হয়। উপড়ে নেয়া হয় চোখ ও নখ। পেরেক দিয়ে ফুটো করা হয় কানের পর্দা।

এরপর সবাই বোঝে কী করা যায়, এবং কী করা যায় না। কারও সাহস নেই ইমামের পিছনে কথা বলবে। আর বলেই বা কী হবে?

শরীফুল্লাহ্ টের পেল কথার জবাব দিতে হবে, সুতরাং দ্রুত বক্তব্য শেষ করল, 'ইমামের ইচ্ছা-পূরণ হবে, আল্লাহ্ তাঁর ভাল করুন।'

ততক্ষণে কেটে গেছে লাইন।

'স্বর্ণা, উঠে এসো বক্সকারের ছাতে,' রেডিওতে নির্দেশ দিল রানা। 'সঙ্গে আনবে এম৬০। যেন গুলির অভাব না হয়। নবী, বক্সকার থেকে সুন্দরীকে আলাদা করতে হবে।'

'জী?' বলল নবী। 'কেন, মাসুদ ভাই?'

'কারণ, পিছন ফিরে দ্রুত দৌড়ানো যায় না।'

ট্যাকটিকাল নেটে এল নিশাত। 'স্যর, আমরা তো ভেবেছি গতি কমানোই মূল সমস্যা।'

'সে যুগ শেষ। এবার সত্যিকারের গতি লাগবে।'

আধ মিনিট পর ছাতে উঠে এল স্বর্ণা, সঙ্গে এনেছে সুন্দরীর ক্যাবের উপর রাখা মেশিনগান। ধপ্ করে ছাতের উপর রাখল। লেফটেন্যান্টকে সাহায্য করতে এগুলো রানা। অ্যামিউনিশনের বেল্ট নিয়ে স্বর্ণার পিছনে এল স্মৃতি। মালার মত গলা থেকে ঝুলছে বুলেটের ফিতা। দুই হাতে আরও দুই বাক্স গুলি।

বুলেটের বেল্ট ও বাক্স নিল রানা, মৃদু হাসল। 'ফেদোরা হ্যাট আদায় করতে ব্যস্ত?'

শুকনো হাসি দিল স্মৃতি। ভারছে, সবুর রহমান সাহায্য না করলে বক্সকারে উঠতেই পারত না ওরা। মানুষটা আবারও ফিরে গেছে ট্রাকে। আগে কখনও এত সাহসী মানুষ দেখেনি স্মৃতি। আনমনে মাথা নাড়ল। না, দেখেছে। ক্যাম্পে এবং মরুভূমিতে। তার নাম মাসুদ রানা।

প্রথমবারের মত কাঠের সেতুর উপর চোখ পড়ল স্বর্ণার, সঙ্গে সঙ্গে বুঝল কেন মাসুদ ভাই ভারী ফায়ারপাওয়ার চেয়েছেন। বক্সকারের সামনের দিকে চলে গেল স্বর্ণা। ছাতের শেষ মাথায় নামিয়ে রাখল এম৬০-র গোদা পায়ের বাইপড, শুয়ে পড়ল তার পিছনে । পাশ থেকে মেশিনগানে প্রথম বেল্ট পরিয়ে দেবে রানা।

কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েছে স্মৃতি, দ্বিতীয় এক শ' রাউণ্ডের বেল্ট নিয়ে তৈরি। হাতের কাছে রাখা হয়েছে বুলেটের বাক্স। এম৬০ লোড করল রানা, খটাং করে আটকে দিল রিসিভার। বোল্টে জোর টান দিল স্বর্ণা, তৈরি হয়ে গেল মেশিনগান।

অস্ত্রের আওতার প্রায় বাইরে কাঠের সেতু। তবে দু' চারটে বুলেট আঘাত হানলে টেরোরিস্টরা ভয় পাবে। নেমেও পড়তে পারে ট্রেস্‌ল্‌ থেকে। তারা যদি কাভার নেয়, মার্ভেল টিমের ওরা বাড়তি সময় পাবে।

গুলিবর্ষণ শুরু করল স্বর্ণা। থরথর করে কাঁপছে দেহ। মনে হলো বিদ্যুৎ-বাহী তার ধরে ফেলেছে। মায্‌ল থেকে এক ফুট দূর পর্যন্ত ছিটকে বেরুচ্ছে লাল আগুন। বহু দূরে চলে যাওয়া ট্রেসার বুলেটের দিকে চাইল স্বর্ণা, উঁচু করে নিল ব্যারেল, তারপর দেখল ফসফরাস টিপ্‌ড্‌ রাউণ্ড গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছে। এত দূর থেকে রানা দেখল সাদাটে কাঠের উপর বুলেটগুলো ধুলোর বিস্ফোরণ তুলছে। প্রথম বেল্টের চার ভাগের তিন ভাগ শেষ হওয়া পর্যন্ত জঙ্গিরা টেরই পেল না কী ঘটছে। রেলবেডের কাজে ব্যস্ত ছিল, কারও গায়ে গুলি লাগেনি। কিন্তু কাছ দিয়ে গুলি যেতে ভয় পেল সবাই, ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটল চারদিকে, আড়াল নিল ক্রস বিমের জঙ্গলের ভিতর।

নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে গুলি করছে স্বর্ণা। চাইছে না অতি উত্তপ্ত হোক ব্যারেল। জঙ্গিদেরকে নিজ নিজ আড়ালে আটকে রাখছে। কপালের জোরে একটা বুলেট লাগল এক জঙ্গির গায়ে, জটিল ট্রেস্‌ল্‌ থেকে টুপ করে খসে নীরবে নীচের দিকে রওনা হলো সে। কোনও আওয়াজ নেই, পড়ছে যেন সিনেমার দৃশ্যের মত। নীচের এক বিমের উপর পড়ল, তারপর ডিগবাজি খেয়ে রওনা হলো মাটির দিকে। নিঃশব্দে লাশ স্থির হলো মাটিতে, ভুস্‌ করে ছিটকে উঠল ধুলো, অলস হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কণাগুলো।

.৩০ ক্যালিবারের গুলির আওয়াজ শুনেছে নবী, তবে জানে না কী উপলক্ষে চলছে গুলি। সেফটি স্ট্র্যাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সুন্দরীর পিছনে চলে এল সে। ঝুঁকে পড়ল রিয়ার বাম্পারের উপর, নীচের দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাখল। কয়লা মাখা টাইগুলো পিছিয়ে চলেছে বিদ্যুদ্বেগে।

রওনা হওয়ার আগে বাম্পারে কয়েকবার পেঁচিয়ে দিয়েছে টো লাইন। ওটা গেছে রেলকারের কাপলিঙে। নিশাত এখন বক্সকারের চেয়ে খানিক গতি তুলে সুন্দরীকে পিছিয়ে নিতে চাইছে। ফলে ঢিলা হয়ে গেছে লাইন। বড়সড় বোল্ট কাটার দিয়ে পাকানো ইস্পাতের কেবল কাটতে শুরু করল নবী। কাজটা শেষ হতে না হতেই ছিটকে সরতে হবে। হঠাৎ বক্সকারের গতি বেড়ে গেলে অর্ধেক কাটা তার পটাং করে ছিঁড়বে। কাটা পড়তে পারে দুই হাঁটু।

একটা বাঁক ঘুরছে ওরা। নবী খেয়াল করল, থেমে গেছে এম৬০ মেশিনগান। একটা টিলার কারণে আড়াল হয়েছে লক্ষ্য। গতি বাড়ছে বক্সকারের। টানটান হয়ে উঠল চিকন কেবল। পটাপট ছিঁড়ছে ব্রেইডগুলো।

'আপা, গতি খানিক বাড়ান,' তাড়াহুড়ো করে বলল নবী।

সুন্দরীর ইঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দিল নিশাত।

কেবলের টানটান ভাব চলে যেতেই আবার কাজে নামল নবী। দুই কবজির সমস্ত জোর ব্যবহার করল।

'নবী, কেবল কাটা হলে সুন্দরীর বেড়ে উঠবে না,' রেডিওতে বলল রানা। 'হাতে সময় নেই। নেমে পড়বে কাপলিঙে।'

আস্তে করে ঢোক গিলল নবী। জানে না জং-ধরা কাপলিং ধরে ঝুলে থাকা ভাল, না মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক করা। বড় করে শ্বাস ফেলে ভাবল, কাপলিংই সই।

'আপা?' বলল রানা। 'নবীর কাজ শেষ হলেই ঘুরিয়ে নেবেন

সুন্দরীকে, তারপর ঠেলতে শুরু করবেন বক্সকারকে।'

নিশাত কিছু বলবার আগেই বলল নবী, 'আমার কাজ শেষ।'

সুন্দরীর ক্যাবের ভিতর ব্রেক প্যাডেলে প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল নিশাত। ফুরিয়ে আসা ব্রেক প্যাডের উপর ধুলোর ঝড় তৈরি করল কার্বন। গতি কমতেই স্টিয়ারিং হুইল বনবন করে ঘোরাতে লাগল নিশাত। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েই আবার উঠে এল রেললাইনের উপর। ফাটা চাকা নিয়ে রিমগুলো টাইয়ের উপর উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল গোটা ট্রাক। একদিকে কাত হয়ে গেল সুন্দরী। প্রথম গিয়ার ফেলে লাইনের উপর উঠতে চাইল নিশাত। পিছনে ছিটকাল ব্যালাস্ট গ্র্যাভেলের স্রোত। জোরালো ঠং আওয়াজ তুলে রিমগুলো বসল রেললাইনের উপর। ফ্রেইটকারের দিকে লাফ দিল সুন্দরী। বক্সকারকে ধাওয়া শুরু করল নিশাত।

তীব্র গতি তুলছে সুন্দরী। দু' মিনিট পেরুনোর আগেই রিনফোর্সড বাম্পার ঠেকল বক্সকারের কাপলিঙে। অবাক হলো নিশাত, কাপলিঙের উপর এক পা রেখেছে নবী, অন্য পা রাখল বাম্পারের উপর। ঝুঁকে পড়ে সুন্দরীর সামনের উইঞ্চ থেকে খুলে নিল টো লাইন। সোজা হয়ে কাপলিঙের সঙ্গে ভাল ভাবে পেঁচিয়ে দিল কেবল। দুটো দানব এখন যেন আটকা পড়েছে ওই সরু কেবলের বাঁধনে। নিশাত আগে ভাবেনি ক্যাপ্টেন নবী এতটা দুঃসাহসী মানুষ। নিজে হয়তো এ ধরনের সাহস দেখাতে হলে দুইবার ভাবত ও।

'স্যর,' ডাকল নিশাত। 'আমরা ঘুরে এসে ধাক্কা দিতে শুরু করেছি। নবী ট্রেনের বগির সঙ্গে উইঞ্চ আটকে দিচ্ছে।'

'নবী, তোমার অঙ্ক করা শেষ?' জানতে চাইল রানা। এসে দাঁড়িয়েছে ওয়েপন্স এক্সপার্টের মাথার কাছে, ছাতের কিনারায়।

কেবলে দুটো লূপ তৈরি করে উইঞ্চের হুকে আটকে দিল নবী, হেঁটে উঠে পড়ল সুন্দরীর বনেটের উপর। ঘুরে দাঁড়ানোর

আগেই রানার উদ্দেশে বলল, 'জী। আপনার কথা মত অঙ্ক শেষ। বক্সকার কিছুক্ষণ ভাসবে। তবে জানি না পানি কত দ্রুত ডুবিয়ে দেবে ওটাকে।'

'মার্ভেলের ডেরিক ক্রেনটা কাজে লাগাতে হবে সোহেলকে।'

'মাসুদ ভাই, খুব ভাল হয় সাধারণ হুকের বদলে ম্যাগনেটিক গ্র্যাপল ব্যবহার করলে।'

ঠিক বলেছে নবী, ভাবল রানা। ইলেকট্রোম্যাগনেট ব্যবহার করলে ক্রেনের সঙ্গে ফ্রেইটকারকে ঝোলাতে হবে না ক্রুদের। এতে সময় বাঁচবে।

বোধহয় রানার পিছনে সরে গেছে টিলাসারি, আবার গুলি শুরু করল স্বর্ণা। এম৬০-র করডাইটের গন্ধ পেল রানা। তীব্র গতি তুলে ছুটছে বক্সকার। ঘুরে দাঁড়িয়ে চাইল রানা। সেতু এখনও অনেক দূরে, মনে হচ্ছে শখ করে কেউ একটা মডেল তৈরি করেছে। ট্রেস্লে বিস্ফোরক বসাতে ব্যস্ত ছিল জঙ্গিরা, সেতুর দিকে ট্রেসার বুলেট শুরু হতেই আবারও লুকিয়ে পড়ল। বক্সকারকে যে গতিতে ঠেলে নিয়ে চলেছে সুন্দরী, কয়েক মুহূর্ত পর সামনে পড়বে আরেকটা বাঁক। আবারও বোমা বসাতে পারবে জঙ্গিরা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। সরাসরি লাইন অভ ফায়ার পাবে না ওরা। ঠেকাতে পারবে না জঙ্গিদেরকে। তবে কিছু করবার নেই। না পারবে ট্রেন থামাতে, না পারবে সেতু পেরুতে। উড়ে যাবে সেতু, মানুষগুলোকে নিয়ে এক শ' ফুট উপর থেকে ছিটকে পড়বে নীচে।

নিশাতকে নির্দেশ দিতে মুখ খুলল রানা। ব্রেক চেপে থামার চেষ্টা করুক। তবে মনের ভিতর জানে, এসবে কোনও কাজই হবে না। এমন সময় হঠাৎ সেতুর ওদিকে নড়াচড়া চোখে পড়ল।

কাঠের বিম ও কলামের ওপাশে ওটা কী?

মার্ভেলের কুচকুচে কালো ম্যাকডোনেল এমডি-৫২০এন কপ্টার সেতুর উপর দিয়ে এল সগর্জনে। পিছনে কোনও রোটর নেই, সে-কাজ করে ডাক্টেড একযস্ট। ট্রেসলের আড়াল নিয়ে আচমকা এসেছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ, চমকে দিয়েছেন জঙ্গিদেরকে।

রোটর ও ক্যাপ্টেনের হুঙ্কার একই সঙ্গে ইয়ারপিসে শুনতে পেল রানা। তারপর ভারী মেশিনগানের শব্দে চাপা পড়ে গেল আওয়াজটা। কপ্টারের পিছন-দরজা খোলা, সেখান থেকে গুলি হলো প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে। পুরু কাঠের সাপোর্টগুলো শত বছর টিকে আছে, মরুভূমির তাপ ওগুলোকে লোহার মত কঠিন করে দিয়েছে। তবে মেশিনগানের অজস্র গুলি খুবলে নিতে চাইল কাঠ। মনে হলো ওখানে সাদা ক্ষত তৈরি হচ্ছে। ছিটকে উঠছে ধুলো এবং বালি। মানবদেহে অবশ্য আরও অনেক বেশি ক্ষতি করল বুলেট।

'ঠিক সময়ে এসেছি, কী বলেন?' শোনা গেল সিরাজের কণ্ঠ। 'নাটকীয় ভাবে আসার জন্য দুঃখিত। গোটা পথে হাওয়ার সহায়তা পেয়েছি।'

'ওদেরকে আটকে রাখুন, আমরা আসছি,' বলল রানা। 'সেতু পেরুলে পিছু নেবেন। কাভার দেবেন ডক পর্যন্ত।' ফ্রিকোয়েন্সি বদলে নিল রানা। 'সোহেল?'

'কী খবর তোদের?' ভঙ্গি থেকে মনে হলো কিছুতে কিছু যায় আসে না সোহেলের। যেন জানেই না দুশ্চিন্তা কাকে বলে।

'তোর ইটিএ কখন?' জানতে চাইল রানা।

'তোরা ডকে পৌঁছবার দু' মিনিট আগে পৌঁছুব। সামনে পাবি ভাসমান পিয়ার। এখন যে গতি তুলে আসছিস, রেল বাম্পার পেরুলে বক্সকারের সবাই মারা পড়বে।'

'তো কী করতে বলিস? তোর প্ল্যান কী?'

'সব সামলে নেব, ভাবিস না।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। বন্ধুর উপর পূর্ণ আস্থা আছে। এখন সময় নেই যে বিস্তারিত কিছু জিজ্ঞেস করবে। যে-কোনও সময়ে শুরু হবে গোলাগুলি।

তীব্র গতি তুলে বাঁক ঘুরছে ওরা। যেসব ইঞ্জিনিয়ার এই পথ তৈরি করেছে, তারা টিলার পাশে সরু খাদ খুঁড়ে নিয়ে গেছে রেললাইনটা। ফ্রেইটকার ছুটবার সময় দু' দিকে বাড়তি জায়গা থাকছে না বললেই চলে। রানার ধারণা এই বাঁকে মস্ত লোকোমোটিভ নেবার সময় শামুকের গতি তুলত ড্রাইভার। দু' পাশে থাকছে মাত্র এক বিঘত জায়গা। দু' দিক থেকে ছিটকে পিছিয়ে চলেছে এবড়োখেবড়ো পাথরের দেয়াল।

সংকীর্ণতা রক্ষা করল সবাইকে।

বক্সকারের বামদিকের চাকাগুলো উঠে গেল ট্র্যাক থেকে। পাথরের দেয়ালকে ঘষ্টে নিয়ে চলেছে বগির ডানদিকের উপরের অংশ, তৈরি করছে গভীর খাঁজ। ছাতে বৃষ্টির মত তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো পড়ছে, একেকটা কাঁচের মত ধারালো। ওদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে আবার লাইনে বসল বামদিকের চাকা। তবে তা কয়েক মুহূর্তের জন্য, তারপর প্রচণ্ড সেণ্ট্রিফিউগাল ফোর্স আবারও তুলে নিল চাকা। বগির ডানদিকের উপর অংশটা চেঁছে তুলছে পাথরের দেয়ালকে। আগেই ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে রানা। ওর পিঠ রইল দেয়ালের দিকে। ছিটকে এসে পড়ছে পাথরের টুকরো।

'স্যর?' বলল নিশাত।

ওই কণ্ঠে আগে কখনও এই সুর শোনেনি রানা। ভয় পেয়েছে ক্যাপ্টেন নিশাত!

'ভুলেও গতি কমাবেন না!' সাবধান করল রানা। নীচ থেকে ভেসে আসছে যাত্রীদের ভীত চিৎকার। খোলা ছাতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে, মানুষগুলোর কেমন লাগতে পারে। ঘুটঘুটে

অন্ধকারে জানে না কী ঘটতে চলেছে!

আরও দু'বার পাথরের দেয়ালে ঘষা দিল বক্সকার, তারপর বেরিয়ে এল খোলা আকাশের নীচে। চাকাগুলো ঠিক ভাবে বসে গেছে ট্র্যাকের উপর। শেষ বাঁক পেরিয়ে এসেছে ওরা, এখুনি সামনে পড়বে সেতু। সোজা একটা অগভীর সরু খালের ভিতর দিয়ে গেছে পথ, তারপর শুরু হবে ট্রেস্‌ল্‌। সেতুর ওপাশে কেউ আছে, রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে বিনকিউলারের কাঁচ। দূরের ওই লোকের ভাবনা আঁচ করছে রানা: কয়েক সেকেণ্ড পর নির্দেশ দিতে হবে। যারা সেতুর উপর বোমা বসিয়েছে, এখন ট্রেস্‌ল্‌ ধরে ছুটতে শুরু করেছে। কেউ এমডি-৫৪০-র গুলি পাত্তা দিচ্ছে না।

বক্সকারের সামনে চলে গেল রানা। এম৬০-র পিছনে শুয়ে আছে স্বর্ণা ও স্মৃতি।

এমন কোনও অ্যাঙ্গেল নেই যে জঙ্গিদের দিকে গুলি করবে। তবে লোকগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন ক্যাপ্টেন সিরাজ।

'আমাদের আর কিছু করার নেই,' বলল স্মৃতি।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ বইছে বাতাস, মনে হচ্ছে ছাত থেকে উড়িয়ে নেবে। ওদের গতিবেগ কমপক্ষে ষাট মাইল। 'সবাই সুন্দরীর ক্যাবে চলো,' বলল রানা। তুলে নিল মেশিনগান, রিসিভার থেকে ঝিকিয়ে উঠছে ব্রাসের শেল।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার পিছু নিল স্বর্ণা ও স্মৃতি। দুই মিনিট পেরুনোর আগেই নেমে এল সুন্দরীর ক্যাবের ছাতে। খোলা হ্যাচ দিয়ে ঢুকে পড়ল ক্যাবের ভিতর। সবাই নেমে যাওয়ার পর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল রানা, তীব্র হাওয়ায় সরু হয়ে গেছে চোখ। চেয়ে থাকল ট্র্যাকের দিকে। কপ্টার নাচিয়ে চলেছেন সিরাজ। এড়াতে চাইছেন শত্রুর গুলি। পিছনের দরজার গানারকে চিনতে পারল রানা। জলিল। কপ্টার স্থির হলেই গুলি করছে।

হঠাৎ রেলকারের চাকার আওয়াজ বদলে গেল। সেতুর প্রথম সেকশনে উঠে পড়েছে। ফাঁপা আওয়াজ শুরু হয়েছে। বক্সকারের পাশে চাইল রানা। জমি হারিয়ে গেছে।

আচমকা সেতুর দৈর্ঘ্য ধরে বিস্ফোরণ শুরু হলো। উপত্যকার মেঝের কাছে একটা ট্রেস্‌ল্‌ সাপোর্টে ছিটিয়ে উঠল ধোঁয়া। লাফ দিল কমলা আগুন। যেন ঝটকা দিয়ে রংচঙে ছাতি খুলেছে কেউ। ক্যারের ছাতে শুয়ে পড়ল রানা। আগুন ও ধোঁয়ার ভিতর ঢুকে পড়ল বক্সকার। পরক্ষণে সুন্দরী। বিদ্যুদ্বেগে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। কোনও ক্ষতি হয়নি। শুধু জায়গায় জায়গায় পুড়ে গেছে সুন্দরীর রং।

পিছনে বিস্ফোরণ হওয়ায় সেতুর ফ্রেমওঅর্কের ল্যাটিস দুর্বল হয়েছে। তবে স্বর্ণা ও সিরাজের গুলিবর্ষণে ভাল ভাবে স্ট্রাকচারে রিগিং করতে পারেনি জঙ্গিরা। রানারা মাটিতে বসানো ট্র্যাক ছাড়বার পর দশ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, কিন্তু ধসে পড়ল না সেতু। দীর্ঘ স্প্যান ফুরিয়ে এল। পিছনে চাইল রানা, এইমাত্র খসে পড়তে শুরু করেছে প্রকাণ্ড সেতু। মস্ত সব বিম ও কলাম রওনা হলো দশতলা নীচের মাটির দিকে। উপত্যকা ভরে উঠল ধুলোয়। তারই ভিতর দেখা গেল অপেক্ষমাণ এম-৮ কপ্টার। ওটার দিকে ছুটছে জঙ্গিরা।

ডমিনোর মত খসে পড়ছে সেতু। খোলা পিয়ানোর তারের মত ঝুলে পড়ল স্টিলের রেললাইন। বোধহয় উইং মিররে পিছনে দেখেছে নিশাত। বদলে গেল ট্রাকের ইঞ্জিনের গর্জন। নিশ্চয়ই নাইট্রাস অক্সাইড ব্যবহার করছে।

অ্যাভালাঞ্চের মত হুড়মুড় করে পড়ছে কাঠ ও লোহা, যেন ধেয়ে আসছে বক্সকারের দিকে। বিস্ময় নিয়ে চেয়ে রইল রানা। পিছন থেকে উধাও হয়েছে সেতু। ওর ভয় পাওয়ার কথা, কিন্তু পেল না। কারও হাত নেই ভাগ্যের উপর। মনোযোগ দিয়েই

দেখছে রানা। গতি বেড়ে গেছে সুন্দরীর, আর পিছন থেকে ধেয়ে আসছে ধ্বংস। এক শ' ফুট পিছনে কেঁপে উঠল রেললাইন, তারপর মুহূর্তে হারিয়ে গেল ভলকে ওঠা ধুলোর ঝড়ের ভিতর।

সামনে চাইল রানা। সেতুর কত দূর পর্যন্ত এসেছে ওরা? জানে না। তবে টের পেল, নীচে বসে গেল রেললাইন। দু' পাশ থেকে হু-হু বাতাস পিছিয়ে চলেছে। ফাঁপা আওয়াজ থেমে গেল। আবারও কাঠের টাই শুরু হয়েছে! সেতুর শেষ অংশ পেরিয়ে এসেছে ওরা! এখন আর পিছনে সেতু নেই। সব ভেঙে পড়ছে উপত্যকার উপর। চারপাশে শুধু ধুলো।

'একে বলে দুনিয়ার সেরা ড্রাইভিং, আপা!' খুশি মনে বলল রানা। 'তোমরা ঠিক আছ তো?'

'কারও কোনও সমস্যা নেই, স্যর,' জবাবে বলল নিশাত।

কিন্তু নিশাতের কণ্ঠে কী যেন, খেয়াল করেছে রানা। 'কী হয়েছে, আপা?'

'শেষবার নাইট্রো ব্যবহার করতে গিয়ে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি ট্র্যান্সমিশনের। উইং মিররে দেখলাম রেললাইনের উপর গলগল করে পড়ছে তেল।'

খেয়াল করল রানা, মোটরের গর্জন নেই। গিয়ার নেই, কাজেই ইঞ্জিন চলবে কী করে?

'রায়হান বলেছে সামনের পথ সোজা, কিন্তু...' থেমে গেল নিশাত।

'বাকিটা আঁচ করতে দিন, আপা,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই আমাদের ব্রেকও নেই?'

'একটু আছে। মেঝের সঙ্গে টিপে রেখেছি প্যাডেল। এ দিয়ে চলবে, বলুন?'

চুপ থাকল রানা, সামনে চেয়ে দেখল দূরে কম্পমান ফিতার মত সুনীল সাগর। জমির বুক চিরে গেছে রেললাইন। আর

বড়জোর মাইল খানেক যেতে হবে। রায়হানের কথাগুলো মনে পড়ল রানার। ধীরে ধীরে সাগরের দিকে নেমেছে রেললাইন। ওরা যে গতি তুলে চলছে, গন্তব্যে পৌঁছবে। কিন্তু ওদের জন্য কী ব্যবস্থা রেখেছে সোহেল? ওরা থামবে কী করে? আবারও বক্সকারের ছাতে উঠতে হবে। ব্রেক হুইল ব্যবহার করে কমিয়ে আনতে হবে গতি। তবে বক্সকারের ব্রেক প্রায় শেষের পথে।

'সোহেল?' রেডিও করল রানা।

'শুনছি।'

'তোরা কোথায়?'

'পজিশনে। তোদের তুলে নেব।'

'লিবিয়ান কপ্টার স্ট্রাইক টিমের বিষয়ে কিছু জানিস?'

'না। বোধহয় দক্ষিণ থেকে আসবে। আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। তার চেয়ে বড় কথা, আমাদেরকে দেখবে না।'

'আমাদেরকে ম্যাগনেটে ধরেই গগলকে জানিয়ে দিবি রওনা হতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব আন্তর্জাতিক জলসীমায় ফিরতে চাই।'

'ভাবিস না। আমরা সবকিছুর জন্য তৈরি। সামনের হোল্ডে হাসপাতাল খুলেছে ফারা। ওখানে রয়েছে কট্, ব্ল্যাঙ্কেট ও আইভি ড্রিপ। স্যাঙাতদের নিয়ে ব্যস্ত বাবুর্চি। এদিকে জাহাজের ওয়েপন্স সিস্টেম লক্ড ও লোডেড। কেউ চাইলেই মানুষগুলোকে ফেরত নিতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। আন্দাজ তিন মিনিট পর আসছি আমরা।'

পাহাড়ি একটা উপত্যকার ভিতর দিয়ে গেছে রেললাইনের শেষ অংশ, মিশেছে গিয়ে সাগর-তীরের ডকে। সুন্দরীর ক্যাবে সিটবেল্ট বেঁধে নিল স্মৃতি, সবুর ও লিবিয়ান ফুয়াদ। বক্সকারের ভিতর মানুষগুলোকে চিৎকার করে সতর্ক করল রানা।

আর কিছু করবার নেই।

পুরনো কোলিং স্টেশনের দালানগুলো জীর্ণ। রয়েছে ধাতব

ফ্রেমওঅর্ক ও কিছু পচা কাঠ। যেসব ক্রেন আগে ফ্রেইটারগুলোতে মাল ভরত, সব বহু আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। একটা কয়লার টিলা ছিল, এখন ঢাকা পড়েছে মরুভূমির বালিতে।

মার্ভেল থেমেছে ভাসমান ডকের পাশে। নিজ পজিশনে থেমেছে মেইন কার্গো ডেরিক। পিয়ারের বিশ ফুট উপর ঝুলছে প্রকাণ্ড ইলেকট্রোম্যাগনেট।

জিনিসটা ওরই অনুরোধে আবিষ্কার করেছে ড. শামশের। তবে ওটার দিকে ঘুরেও চাইল না এখন। ওর মন পড়ে আছে অন্যখানে। বক্সকারের গতি এখন কত? জোর করে চোখ সরিয়ে রেখেছে স্পিডোমিটার থেকে। ষাট মাইল তো হবেই। ধারণা করেছিল রেললাইনে কোনও ধরনের ব্যারিয়ার তৈরি করবে সোহেল। কিন্তু, কোথায়, সামনে তেমন কিছু চোখে পড়ছে না।

হঠাৎ রানা বুঝল, পানি থেকে যতটা উপরে থাকার কথা ডকের, ওটা তার চেয়ে নীচে। শেষমাথায় উঠে এসেছে পানি।

হেসে ফেলল রানা।

দ্রুত ছুটছে বক্সকার ও সুন্দরী। রেলবেডের শেষে শুরু হলো পিয়ার। মার্ভেলের গ্যাটলিং গান দিয়ে ইন্টারলক প্লাস্টিকের পডগুলোকে ফুটো করেছে সোহেল। নিজের ওজনে ডুবতে শুরু করেছে পিয়ার। ওটার উপর বক্সকার উঠতেই আরও ডেবে গেল।

বগিকে বাধা দিতে শুরু করেছে পানি। দেখতে না দেখতে মসৃণ ভাবে গতি কমিয়ে দিল সাগরের পানি। একবারের জন্য সুন্দরীর আরোহীদের সিটবেল্ট টানটান হলো না। পিয়ারের তিন ভাগের দুই ভাগ পেরুল সুন্দরী। গতি নেমে এসেছে ষোলো মাইলে। পানি ডুবিয়ে দিয়েছে নষ্ট চাকাগুলোকে।

পিয়ারের শেষ মাথায় পানিতে নামল বক্সকার, শেষ গতিটুকুও হারাল। তবে টান পড়ছে সুন্দরীর কেবলের উপর। কয়েক সেকেণ্ড পানির ভিতর হাবুডুবু খেল বক্সকার, তারপর ওটার উপর

স্থির হলো চুম্বক। ইলেকট্রিসিটি চালু হতেই আটকে গেল বক্সকারের ছাতে। কিছুক্ষণ পর বগির কাপলিং থেকে ঝুলতে লাগল সুন্দরী। আগেই ট্রাক থেকে নেমে পড়েছে সবাই।

রানা জানে ক্রেনের কণ্ট্রোলে আছে কোন্ অপারেটর। হিসাব কষে ট্রেনের সেন্টার অভ গ্র্যাভিটি খুঁজে বের করেছে সোহেল।

বক্সকার ও সুন্দরীকে তুলে নেয়া হলো মার্ভেলের ডেকে। তখনও ঝরঝর করে ঝরছে পানি। বোট গ্যারাজে উঠেছে সুন্দরীর সবাই। এলিভেটরে চেপে উঠে এল মেইন ডেকে। একজন ক্রু দাঁড়িয়ে আছে অক্সিঅ্যাসেটিলিন টর্চ নিয়ে। সুন্দরী ও বক্সকারের মাঝের কেবল কাটতে শুরু করেছে। দ্রুত পায়ে ডক্টর ফারাকে পাশ কাটাল রানা, টান দিয়ে খুলল বক্সকারের স্লাইডিং দরজা। স্ট্রেচার নিয়ে এসেছে কয়েকজন আর্দালি, অপেক্ষা করছে অসুস্থদের নিতে।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'রোগী পেলে খুশি হয় ডাক্তার। তোমাকে দিয়েছি শত শত। নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ, ফারা?'

'সব বিনা পয়সার কাস্টমার।' রানাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ফারা। উঠে পড়ল বক্সকারে, কঙ্কালসার মানুষগুলোকে দেখে চমকে গেল। তাদের সবার চোখ বিস্ফারিত। ভিজে চুপচুপে ন্যাকড়ার মত পোশাক। 'একে একে বেরিয়ে আসুন আপনারা। কেউ অসুস্থ থাকলে শুয়ে থাকুন। আমরা নামিয়ে নেব।'

'আপনারা এখন নিরাপদ,' আরবিতে বলল রানা। 'বেরিয়ে আসুন।'

ওর পাশে থেমেছে ফুয়াদ। একই কথা ক'বার বলতেই মানুষগুলো নামতে লাগল। কয়েকজন সামান্য আহত। পা ভেঙেছে দু'জনের। একজনের কবজির ভিতর ঢুকেছে বুলেট। এদের নামিয়ে স্ট্রেচারে করে সরিয়ে নেয়া হলো।

ওয়েপন্স এক্সপার্ট নবীকে দেখতে পেল রানা। কাঁধে ঝুলছে

ওয়াটারপ্রুফ ল্যাপটপ কেস। হ্যাচওয়েয়র দিকে রওনা হয়েছে, ফিরছে নিজ কেবিনে। ওকে এবং রায়হানকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে ও। দেখা যাক ওরা কী আবিষ্কার করে।

কয়েক ডেক নীচে চালু হয়েছে ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন।

'রানা, তোমার কী মনে হয়, এরা কারা?' বগির দরজার কাছ থেকে জানতে চাইল ফারা।

'সবাই লিবিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রির অফিসার,' বলল রানা। 'এদের ভিতর রয়েছেন সাবেক মিনিস্টারও।'

'কথাটা বুঝলাম না। কেন এরা বন্দি ছিল?'

'আমার আন্দাজ ঠিক হলে, নতুন ফরেন মিনিস্টার মোহাম্মদ ফতে আলী নিজেই জঙ্গি-নেতা ইউনুস আল-কবির।'

দশ

দক্ষিণে শুধু বিস্তৃত ফাঁকা মরুভূমি। পাথর ও বালির ভিতর কোনও গাছপালা নেই, নেই কোনও শহর বা লোকালয়। মাটি ছুঁয়ে রাগী ভোমরার মত ছুটে চলেছে সবজেটে লিবিয়ান মিলিটারি কপ্টারগুলো। সামনের চারটে রাশার তৈরি যান্ত্রিক ফড়িং, কাদা রঙের ছোপ দিয়ে ক্যামোফ্লেজ্‌ড্। অন্যগুলো লিবিয়ান নেভির, ধূসর রঙের।

তিনবছর হলো বিসিআই-এ চাকরি নিয়েছে শাকির হোসেন, কখনও ভাবেনি জঙ্গিদের বেস ক্যাম্পে হামলা করবে লিবিয়ান

হেলিকপ্টার, আর সেই অ্যাসল্ট টিমে যোগ দেবে সে অবজার্ভার হিসেবে। ফরেন মিনিস্টার মোহাম্মদ ফতে আলীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ শেষে সব ব্যবস্থা করেছেন অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামাল। অবাক ব্যাপার, তবে লিবিয়ান সরকার থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। বদলে বাংলাদেশি অ্যাম্বাসেডার জানিয়েছেন, তাঁরা কৃতজ্ঞ রইলেন। এখন দুই সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সবাই জানেন, বাংলাদেশের বিমান আগেই নামানো হয়েছিল মরুভূমিতে। সরিয়ে নেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। আবার আকাশে উঠেছে বিমান। তারপর ক্র্যাশ করানো হয়েছে পাহাড়ের উপর।

এরপর একদল লোক কপ্টার নিয়ে নেমেছে ওই পাহাড়ে। নষ্ট করেছে সব প্রমাণ। বিমান বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে বলা হয়েছে: এরা ঝড়ের মত এসেছে, ধ্বংসস্তূপ তছনছ করেছে। তেমন কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

ত্রিপোলির বাইরে গোপন এক এয়ার বেসে পৌঁছে দেয়া হয়েছে শাকির হোসেনকে। ওখান থেকে রওনা হয়েছে অ্যাসল্ট টিম। স্পেশাল ফোর্সের অপারেশন্স লিডার, কর্নেলের নাম আবু হোসেন। তিনি শাকিরকে জানিয়েছেন, লিবিয়ার মরুভূমিতে রয়েছে শ' খানেক পুরনো ট্রেইনিং বেস। আগে জঙ্গিদেরকে নানা ভাবে সহায়তা দিত লিবিয়ান সরকার। তবে গত কয়েক বছর হলো টেরোরিজমকে দমন করতে চাইছে তারা। নিজেরাই ধ্বংস করে দিয়েছে বেশির ভাগ ক্যাম্প। অবশ্য স্বীকার করেছেন তিনি, এখনও মরুভূমি ও পাহাড়ে রয়েছে কমপক্ষে ডজন খানেক জঙ্গি ক্যাম্প। সেগুলোর ঠিকানা জানে না সরকার।

পাইলটের পাশে ডানদিকের সিটে বসেছেন কর্নেল আবু হোসেন। শাকির ঝাড়া ছ' ফুটি যুবক, বসেছে ককপিটের পিছনে ফোল্ডিং জাম্প সিটে। ইউটিলিটি চপারের পিছন সেকশনে হাতে গোনা কয়েকজন। অ্যাসল্ট ফোর্সের বেশিরভাগ সৈনিক অন্য সব

কপ্টারে।

হেলমেটের বুম মাইকের উপর হাত রাখলেন কর্নেল, হেলান দিয়ে বসলেন সিটে। রোটরের পাখার আওয়াজে চাপা পড়বে কণ্ঠ, কাজেই গলা উঁচিয়ে বললেন, 'আমরা এক মিনিটের ভিতর নামছি।'

একটু থমকে গেল শাকির। 'কী বললেন, কর্নেল? আমার ধারণা ছিল অ্যাসল্ট দেখতে চলেছি!'

'আপনার কথা জানি না, মিস্টার শাকির, তবে এসব জঙ্গিদেরকে দেখে নিতে চাই আমি,' হাসলেন কর্নেল।

'আমিও তাই চাই, কর্নেল, তবে ইউনিফর্মের সঙ্গে আমাকে কোনও অস্ত্র দেয়া হয়নি।'

কোমরের হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করলের কর্নেল, ওটার নল ধরে বাঁট এগিয়ে দিলেন শাকিরের দিকে। 'মনে রাখবেন, রিপোর্টে আবার লিখবেন না আমি পিস্তল সরবরাহ করেছি।'

ষড়যন্ত্রের হাসি হাসল শাকির, বাটন টিপে বের করে নিল ম্যাগাজিন। নিশ্চিত হতে চাইল ওটা পুরো লোডেড। ম্যাগাজিনের পাশে সরু ফাটল দিয়ে দেখা গেল, বসে আছে পুরো তেরোটা চকচকে ব্রাসের বুলেট। রিসিভারে আবার ম্যাগাজিন ভরে নিল শাকির। ঠিক করেছে, মাটিতে নামবার পর কক করবে পিস্তল।

ককপিটের পিছনে নিচু সিটে বসেছে, উইণ্ডশিল্ড দিয়ে আকাশ দেখতে পেল না। তবে আঁচ করল কপ্টার নেমে এসেছে মাটির কাছে। শক্তিশালী রোটরের দমকা হাওয়া তৈরি করছে ধুলোর ঝড়। আড়াল হয়েছে সব। শাকিরের মনে পড়ল, ইউএনও-র মিশনে আফগানিস্তানে কমব্যাট সিচুয়েশনে পড়েছে। তখন মনের ভিতর ছিল ভয় আর তীব্র উত্তেজনা। কখনও ভুলবে না ওই অনুভূতি।

কপ্টার নেমে পড়েছে মাটিতে। সেফটি বেল্ট খুলে ফেলল

শাকির হোসেন। কর্নেল আবু হোসেনের কাঁধের পিছন থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে চাইল। টেরোরিস্ট ক্যাম্প শ' খানেক গজ দূরে। লোকগুলো কাফিয়ে পেঁচিয়ে নিয়েছে মাথায়, হাতে একে-৪৭, দৌড়ে ছুটে আসছে। অন্যান্য কপ্টার থেকে এখনও কোনও সৈনিককে নামতে দেখল না শাকির।

হারিয়ে গেল ওর উত্তেজনা, বদলে উদ্বেগে শুকিয়ে এল গলা।

কপ্টারের দরজা খুলে ফেলল কর্নেল আবু হোসেন, ঘুরেই নেমে গেল। তাকে আর দেখা গেল না। তারপর কপ্টারের সাইড ডোর ধপ্ করে বাড়ি খেল রোলার স্টপে।

হোল্ডের ভিতর এসে পড়েছে উজ্জ্বল সোনালী রোদ।

শাকির ও কর্নেলের দৃষ্টি আটকে গেল পরস্পরের চোখে। বিসিআই এজেন্টের মনে হলো চিরকাল চেয়ে রয়েছে সে। প্রায় একই সঙ্গে নড়ে উঠল দু'জন। ঝটকা দিয়ে পিস্তল কক করল শাকির, কর্নেলের বুকে তাক করেই ট্রিগার টিপে দিল। জোরালো হৈ-চৈ শুনল। কর্নেলের পিছনে জড় হয়েছে উত্তেজিত জঙ্গিরা। অন্তত এক শ' লোক গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে।

পর পর চারবার ট্রিগার টিপল শাকির, তারপর টের পেল একটাও গুলি হয়নি। ওর মেরুদণ্ডে ঠেকল একটা মাযল। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল শাকির।

হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা কেড়ে নিল লিবিয়ান কর্নেল। 'এটার ফায়ারিং পিন নেই,' বলল আরবি ভাষায়।

জঙ্গিরা হাসছে। প্রশংসার ঝড় উঠল সবার কণ্ঠে।

মৃত্যু-মুখে শাকির হোসেন প্রতিজ্ঞা করল, লড়াই ছাড়া মরতে রাজি নয় সে। পিঠের উপর রাইফেলের মাযল, কিন্তু কপ্টার থেকে লাফিয়ে নামতে চাইল। হাতদুটো চলে গেল কর্নেলের গলা টিপে ধরতে। আর ঠিক তখনই পিছন থেকে একে-৪৭-এর এক পশলা গুলি এল। শাকিরের কিডনি থেকে শুরু করে কাঁধ পর্যন্ত

ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেল। কাইনেটিক এনার্জি কর্নেলের পায়ের কাছে ফেলল বিসিআই এজেন্টকে।

মৃত শত্রুর দিকে চেয়ে রইল লিবিয়ান কর্নেল। যোগ্য প্রতিযোগীকে প্রায় অসম্ভব অ্যাম্বুশে হারিয়ে দিয়েছে, বিবেকবান কেউ স্যালিউট জানিয়ে সম্মান জানাত; তবে লাশের মুখে থুতু ফেলল আবু হোসেন, ঘুরে রওনা হয়ে গেল আরেক দিকে।

নির্দিষ্ট তাঁবুর ভিতর পেল সে ক্যাম্পের কমাণ্ডার রহমত শরীফুল্লাহ্‌কে। উষ্ণ আলিঙ্গন করল দুজন। দু' চার কথায় কুশল বিনিময় শেষ করে মূল কথায় চলে এল তারা।

'দোস্ত, খুলে বলো বন্দিরা পালাল কী করে।'

ইউনুস আল-কবিরের জঙ্গি সংগঠনে একই পদে রয়েছে দুই অফিসার। তবে ব্যক্তিত্বের দিক থেকে আবু হোসেন অনেক বেশি দৃঢ়।

'আমরা ওদেরকে শেষ করে দিয়েছি।'

'সব ক'জনকে? ও, হ্যাঁ, শুনেছি ব্রিজ উড়িয়ে দেবে তুমি। তাতে কাজ হয়েছিল?'

'না,' স্বীকার করল শরীফুল্লাহ্‌। 'ওরা ব্রিজ পেরিয়ে যায়। তবে এত দ্রুত ছুটছিল, ডকে পৌঁছে আর থামতে পারেনি। ছিটকে পড়েছে সাগরে।'

'কেউ পড়তে দেখেছে?'

'না। তবে তার পনেরো মিনিট পর আমাদের কপ্টার পৌঁছে। কাউকে পাওয়া যায়নি। চারপাশ খুঁজে দেখা হয়। কেউ নেই। বগি থেকে নামতেও পারেনি। তীর থেকে দুই শ' গজ দূরে ছিল বগি। শুধু ভেসে ছিল ছাতটা। তারপর সবার চোখের সামনে ডুবে গেছে।'

'খুবই ভাল,' বন্ধুর কাঁধ চাপড়ে দিল আবু হোসেন। 'আল্লাহ্‌ আমাদের ইমামের মঙ্গল করুন। উনি সাবেক ফরেন মিনিস্টারকে

মরতে দেখলে খুব খুশি হতেন। তা যা-ই হোক, উনি খুশি হবেন, সলিল সমাধি হয়েছে ওদের।'

'তারপরও একটা কথা ভেবে মনের ভিতর খচ-খচ করছে,' বলল শরীফুল্লাহ্। 'আমার লোকের কাছ থেকে নিখুঁত বর্ণনা পাইনি। এমন হতে পারে বন্দিরা বাইরে থেকে সাহায্য পেয়েছে।'

'সাহায্য?'

'একটা সাধারণ ট্রাক ওটা। ক্যাবে কয়েকজন লোক ও এক মেয়ে ছিল। এরাই ক্যাম্পে হামলা করে। ওই একই সময়ে পালাতে শুরু করে বন্দিরা।'

'ওরা কারা, কী পরিচয় তাদের?'

'জানি না।'

'তাদের ট্রাক থেকে কিছু আন্দাজ করা যায়নি?'

'ধারণা করছি ওটাও বগির সঙ্গে ডুবে গেছে সাগরে। নিশ্চিত নই আমি। যারা শপথ করে বলছে নিজ চোখে দেখেছে, তাদের বেশির ভাগই নতুন রিক্রুট। হয়তো আমাদের নিজেদের কোনও ট্রাক দেখে ভুল ভাবছে।'

শুকনো হাসল কর্নেল হোসেন। 'হতে পারে। এসব ছোকরা প্রতিটা পাথর বা টিলার আড়ালে মোসাদ এজেন্ট দেখতে পায়।'

'আগামীকালের হামলার পর, গুটিয়ে নেব এই ক্যাম্প। আমাদের পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে সুদানে। যাদেরকে দিয়ে কিছু হবে, তাদেরকে নেয়া হবে। অন্যরা পড়ে থাকবে এখানে—একেকটা গাধা।'

'রিক্রুট নিয়ে আমাদের কখনও সমস্যা হয়নি। সমস্যা যোগ্য লোক পাওয়া।'

'ঠিক বলেছ।'

এক এইড একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে দু' চার কথায় কী যেন বলল শরীফুল্লাহ্। লোকটা চলে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে

এল অন্য আরেকজনকে নিয়ে। জঙ্গিদের সবার পরনে ছিল ধুলোমাখা ক্যামোফ্লেজড পোশাক ও ঘামে ভেজা কাফিয়ে; কিন্তু নতুন এ লোকের পরনে কালো ইউনিফর্ম। প্যান্টের পায়া গুঁজে নিয়েছে চকচকে বুটের ভিতর। মাথার চুলগুলো সুন্দর করে আঁচড়ানো। শেভ করা গাল। পরিষ্কার বেল্টে হোলস্টার। কাঁধের র‍্যাঙ্ক পিপগুলো সোনার মত জ্বলজ্বল করছে।

প্রায় নষ্ট পুরনো একে-৪৭ রাইফেল দিয়ে ট্রেইনিং দেয়া হয় রিক্রুটদের। সেসব রাইফেলের বয়সের অর্ধেক হয়নি রিক্রুটদের বয়স। তবে এর হাতে চকচকে রাইফেল। রিসিভারে কোনও দাগ নেই। কাঠের বাঁটে নখের আঁচড় পড়েনি।

'তোমার পরিচয়-পত্র?' কড়া গলায় জানতে চাইল আবু হোসেন।

নতুন লোকটা খটাস্ করে রাইফেল ঠুকল মাটিতে। পকেট থেকে বের করল চামড়ার বিলফোল্ড, খুলে দেখাল। সাবধানে পড়ল কর্নেল আবু হোসেন। যে সরকারী অফিস মিলিটারি আইডেণ্টিফিকেশন তৈরি করে, সেখান থেকেই এসেছে এটা। ওখানে কাজ করে তাদের এক ধর্মের ভাই। তার রয়েছে এই সংগঠনের প্রতি প্রবল সহানুভূতি। ওরা এসব আইডেণ্টিফিকেশন মিলিটারির প্রতিটি পদে ব্যবহার করছে। আর সে-কারণেই আজকের অপারেশনে পাওয়া গেছে মিলিটারি কপ্টার।

আইডির সঙ্গে রয়েছে আগামীকালের শান্তি মহাসম্মেলনের অথোরাইজেশন পাস। যে অফিস সত্যি সত্যি এসব ইশ্যু করে, সেখান থেকে এই জিনিস মিলত না। কাজেই এই ক্যাম্পেই তৈরি করা হয়েছে পাস। আর্মির ভিতর যারা আবু হোসেনের বন্ধু, তারা বিশাল ওই কনফারেন্সে সিকিউরিটি ফোর্স হিসাবে কাজ করছে। তাদের পাস মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করেছে সে, এখন চোখের সামনে দেখছে নিখুঁত একটা নকল।

কাগজ-পত্র ফিরিয়ে দিল সে, জানতে চাইল, 'আগামীকাল ওখানে কী দেখবে ভাবছ?'

'শহীদ হব আল্লাহ্‌র ইসলাম ও ইউনুস আল-কবিরের নামে।'

'তুমি কি নিজেকে অতটা সম্মান পাওয়ার যোগ্য মনে করো?'

ক' মুহূর্ত পর এল জবাব, 'এটা যথেষ্ট যে আমার উপর বিশ্বাস রেখেছেন ইমাম।'

'ভাল বলেছ,' বলল কর্নেল হোসেন। 'তুমি এবং তোমার লোক আঘাত হানতে চলেছ পশ্চিমা বিশ্বকে। এতে তাদের বন্ধুদের মন ভেঙে যাবে। কয়েক দশকের ভিতর কোমর সোজা করতে পারবে না। ইমাম ইউনুস আল-কবির ঘোষণা দিয়েছেন: ওরা এখন থেকে শাসন করবে না আমাদেরকে। নিজেদের মত করে জীবন গড়ব আমরা। যে ধরনের সিনেমা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে দুর্নীতি, গানবাজনা ও গণতন্ত্র; সবই শীঘ্রি নিষিদ্ধ হবে। এই দলের মানুষগুলো বুঝবে আমরা ওদের ওই পাপের জীবন চাই না। বেশি দিন দূরে নেই গোটা দুনিয়া শাসন করবে ইসলাম। আর সেই সঙ্গে সম্মানিত হবে তোমরা। এ সম্মান দিয়েছেন তোমাদেরকে ইমাম ইউনুস আল-কবির।'

'আমি তাঁর সম্মান রক্ষা করব,' বলল জঙ্গি। কণ্ঠ তার দৃঢ়, চোখের দৃষ্টি দীপ্ত।

'এবার তুমি যেতে পারো,' বলল আবু হোসেন। বন্ধুর দিকে চাইল। 'বন্ধু, এখানে ভাল কাজ দেখিয়েছ তুমি।'

'মিলিটারি ট্রেইনিং দেয়া সোজা ছিল,' বলল জঙ্গি কমাণ্ডার। 'কঠিন ছিল ওদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করা। একেকটা ছিল উন্মত্ত চোখের বুনো বিড়াল।'

দু'জনই জানে, একের পর এক সুইসাইডাল অ্যাটাক ব্যর্থ হয়েছে শুধু কাঁচা ট্রেইনিঙের কারণে। অপ্রশিক্ষিত জঙ্গিরা কোনও কারণ ছাড়াই ভীত হয়ে উঠেছে। বহুবার এমনও হয়েছে, তাদের

আচরণে সাধারণ মানুষ বুঝে গেছে, যে-কোনও সময়ে বোমা ফাটবে। কিন্তু আজ যে পঞ্চাশজন জঙ্গিকে তারা ত্রিপোলি শহরে পাঠাবে, এরা কঠোর মনের মানুষ, সম্পূর্ণ সতর্ক; প্রশিক্ষিত সিকিউরিটি ফোর্সের ভিতর কাজ করবে। লিবিয়ান ফোর্স সব ধরনের আক্রমণের জন্য তৈরি থাকবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না। মধ্যপ্রাচ্যের অন্তত বিশটা ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে বেছে নেয়া হয়েছে এ পঞ্চাশজনকে।

ঘড়ি দেখল আবু হোসেন। 'আগামী আঠারো ঘণ্টা পর, শত্রুদের শেষের শুরু। আবার বলতে পারি, নতুন দিনের ভোর আসছে আমাদের জন্য। মারা পড়বে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। রক্ত বইতে থাকবে প্যালেস হলে। নতুন করে আরেকবার থামিয়ে দেয়া হবে শান্তির নামে পশ্চিমাদের মিথ্যাচার ও আগ্রাসনকে। তাদের পা-চাটা সবাই মরবে। বলতে পারি, বরখেলাপ হবে না ইমামের কথার। আমরা আমাদের পছন্দের প্রিয় জীবনে ফিরব, দুনিয়াময় ছড়িয়ে দেব ইসলামের খুশ্‌বু।'

'প্রথম ইউনুস আল-কবির যে-কারণে লিখেছেন, "আমরা যখন নানা দুর্নীতির কারণে ধর্ম থেকে বিচ্যুত হই; যখন বুঝি মনের শক্তি দুর্বল হয়েছে, ঠিক তখন সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চাই—তখন আমাদেরকে করতে হবে আত্মবিসর্জন; শত্রুদেরকে দেখিয়ে দিতে হবে আমরা কখনও হারব না।"'

'অন্য একটা কথা আমার বেশি পছন্দের, "যারা ইসলাম ও আল্লাহ্‌র সামনে মাথা নত করল না, তাদেরকে বিদ্ধ করতে হবে বুলেট দিয়ে।"'

'শীঘ্রি গুলিবিদ্ধ হবে ওরা।'

'একদম ঠিক কথা, দোস্ত। এবার, ওই ঘাড় ত্যাড়া বাংলাদেশি মহিলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও আমাকে। তাকে ফ্রিগেটে তুলে দেয়ার আগে দু-চার কথা বলি।'

এগারো

মার্ভেলের হাসপাতালে লিবিয়ান বন্দিদেরকে পৌঁছে দিয়ে তাদের আরাম আয়েসের ব্যবস্থা করেছে রানা। বুঝতে পারছিল না ওদের বন্দি হবার কারণ কী। তারপর লিবিয়ান এক্স ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ফুয়াদ। জানাল, সে নিজে ছিল তাঁর ডেপুটি। তখন বাজে প্রায় দুপুর।

রানার ইচ্ছে ছিল কেবিনে ফিরে দীর্ঘ শাওয়ার নেবে। কিন্তু শাওয়ারে ঢুকতে না ঢুকতেই খটাখট আওয়াজ হলো কেবিনের দরজায়। বুঝতে দেরি হলো না রানার, ওটা বেয়াদ্দপ সোহেল না হয়েই যায় না। ব্যাটাকে দুটো গালি দেবে, সে উপায় নেই। কে জানে সঙ্গে করে কাকে নিয়ে এসেছে!

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে রোব পরেই দরজা খুলে দিল রানা।

ঘরে ঢুকেই বিছানার উপর ধপ্ করে বসল সোহেল। ওর পর পরই ভিতরে ঢুকল রায়হান ও নবী।

'বক্সকার ডুবিয়ে দেয়ার চালাকি কাজে লেগেছে,' বলল সোহেল।

'বোসো তোমরা,' রায়হান ও নবীকে বলল রানা। নিজেও বসে পড়ল সোফায়। বন্ধুর দিকে চাইল। 'আর কী জানা গেল?'

'তোরা পৌঁছবার ঠিক পনেরো মিনিট পর তদন্ত করতে আসে একটা কপ্টার,' বলল সোহেল। 'রায়হান সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিল। ঠিক সময়েই ডুবে যায় বগিটা। বগির ছাত দেখে খুশি

হয়েছে কপ্টারের আরোহীরা।'

'এরপর ইউএভি নিয়ে নজর রাখি জঙ্গিদের ক্যাম্পে,' বলল রায়হান। 'অনেক উপরে থাকতে হয়েছিল। নইলে ইঞ্জিনের আওয়াজ পেত। ক্যামেরার রেযোলিউশন খারাপ, তবে মোটামুটি দেখেছি কী ঘটছে ওখানে।'

'কী বুঝলে?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি ঠিকই বলেছেন, মাসুদ ভাই। লিবিয়ান কপ্টার নামল, কিন্তু বাধা দিতে এল না কেউ। আর কপ্টারের ভিতর সৈনিক ছিল না। মাত্র কয়েকজন নেমে এল।'

'কপ্টারগুলোকে ট্র্যান্সপোর্টের কাজে আনা হয়েছে,' বলল সোহেল।

'তাই করবে ওগুলো,' বলল রায়হান। 'এমআই-৮ কপ্টারে এত লোক আঁটত না।'

'কপ্টারগুলোর ক্যাপাসিটি কত?' জানতে চাইল রানা।

'কমপক্ষে পঞ্চাশজন নিতে পারবে।'

'অ্যাসল্ট ফোর্স হিসাবে যথেষ্ট লোক।'

'ওদের টার্গেট শান্তি মহাসম্মেলন,' মন্তব্য করল নবী।

'না-ও হতে পারে,' বলল রায়হান। 'ওখানকার সিকিউরিটি অভেদ্য। কোনও ডিগনিটারির এক মাইলের ভিতর পৌঁছুতে পারবে না কোনও জঙ্গি।'

'পারবে,' বলল সোহেল। 'যদি লিবিয়ান সরকার সুযোগ করে দেয়।'

'হাজার কোটি টাকার প্রশ্ন ওটা,' বলল রানা। 'প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফি কি জানেন মোহাম্মদ ফতে আলী আসলে ইউনুস আল-কবির?'

'জানার তো কথা,' বলল নবী। 'উনিই তো তাকে মন্ত্রীত্ব দিয়েছেন।'

‘ধরে নিলাম গাদ্দাফি জানেন,’ বলল রানা। ‘কিন্তু এটা কি জানেন আল-কবির কী করতে চলেছে?’

‘কথা তো একই হলো, মাসুদ ভাই,’ বলল নবী।

‘একই কথা না-ও হতে পারে,’ বলল রানা। ‘আমাদের জানতে হবে গাদ্দাফি কতটা জানেন।’

‘এসব আমরা জানব কীভাবে?’ বলল নবী।

‘উত্তরটা দু’ মিনিট পর দিচ্ছি, নবী। ...রায়হান, কোনও উপায় আছে কপ্টারগুলোকে অনুসরণ করার?’

‘আরেকটা ইউএভি লঞ্চ করতে পারি,’ বলল রায়হান। ‘আমাদের প্রথম ড্রোনের ফিউয়েল শেষ, আছড়ে পড়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে গেছে। তবে তার আগে পাওয়া গেছে এটা।’

রানার হাতে ঝাপসা একটা ফটো দিল সে। ওটা এসেছে ইউএভির ভিডিও ক্যামেরা থেকে। বড় অস্পষ্ট। তবে দেখা যায় দুই সশস্ত্র লোক একটা কপ্টারের দিকে এসকোর্ট করে নিয়ে চলেছে তৃতীয় কাউকে।

‘উনিই কি প্রধানমন্ত্রী?’ আনমনে বলল নবী।

‘সম্ভাবনা খুবই বেশি। দু’পাশের দুই লোকের উচ্চতা এবং মাঝের মানুষটির উচ্চতা... তা ছাড়া, মাঝের জনের দৈহিক গড়ন মিলে যায়। পরনে বোরখা। চুল বা চুলের খোঁপা নেই। এসব থেকে মনে হয়...’ থেমে গেল রায়হান।

‘খুলে বলো তোমার কী ধারণা,’ সোজা হয়ে বসেছে রানা।

‘উনিই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু যতক্ষণে ইউএভি ওখানে পৌঁছবে, তার আগেই তাঁকে সরিয়ে নেয়া হতে পারে।’

ভুরু কুঁচকে ফেলল রানা। নানা দিক ভেবেই লিবিয়ান বন্দিদেরকে সরিয়ে নিতে চেয়েছে। ওই ক্যাম্পে জঙ্গিদের সঙ্গে লড়তে গেলে বহু মানুষ মরত। একজনের জীবনের দাম যত বেশিই হোক, এক শ’ মানুষের জীবনের দামের চেয়ে বেশি হতে

পারে না। সে যে-ই হোক। তবে খচ-খচ করছে এখন মনের ভিতর। মানুষটার এত কাছে পৌঁছেও কিছুই করতে পারল না। ‘ঠিক আছে, আমরা যদি কপ্টারগুলোকে অনুসরণ করি?’ ছবি থেকে চোখ তুলল না রানা।

‘হয়তো দ্বিতীয় ইউএভি দিয়ে অনুসরণ করা যেতে পারে। মিসাইলও ছুঁড়তে পারব। কিন্তু বুঝব কী করে কোনটার ভিতর প্রধানমন্ত্রী আছেন? হয়তো ওটাই বিধ্বস্ত হলো।’

কেউ কিছু বলছে না।

সোহেলের দিকে চাইল রানা। ‘অন্য কোনও অপশন?’

‘নো অপশন।’ গম্ভীর স্বরে বলল সোহেল। ‘ওরা যদি সাগরের উপর দিয়েও আসে, মিসাইল ব্যবহারে প্রধানমন্ত্রী মরতে পারেন।’

‘সোহেল ভাই ঠিকই বলেছেন,’ বলল নবী।

‘মরুভূমির উপর দিয়েও যেতে পারে,’ বলল রায়হান।

খুকখুক করে কাশল সোহেল। ‘সেক্ষেত্রে অপশন নেই বললেই চলে। তবে আমরা চিফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। তাঁকে বললে উনি হয়তো অন্যান্য ডেলিগেটদের সঙ্গে আলাপ করবেন। তাতে কপ্টারগুলোর উপর নজর রাখা যাবে।’

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। ‘আমার বিশ্বাস, উনি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না।’

‘কেন নয়, মাসুদ ভাই?’ জানতে চাইল রায়হান।

‘দুটো কারণে। প্রথম কথা, ডেলিগেটরা যদি জানে হামলা হবে, পিস কনফারেন্স ছেড়ে প্রত্যেকে চলে যাবে নিজ দেশে। গুরুত্বপূর্ণ এতজন মানুষকে আর কখনও এভাবে জড় করা যাবে না। মহাসম্মেলন চলতেই হবে। আর এটাই চাইছেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফিও। উনি পশ্চিমাদের অনুরোধ করতে চান, তারা যেন লিবিয়ার ভিতর বিরোধীদেরকে মদত না দেয়। একই কথা বলবে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য সরকার-প্রধানরা।

পশ্চিমাদের সাহায্য নিয়ে বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ আরম্ভ করতে পারে বিরোধী দলগুলো। তাতে গোটা এশিয়ায় রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হবে। ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর।' টেবিল থেকে পানির গ্লাস নিয়ে চুমুক দিল রানা। গ্লাস রেখে বলল, 'এ প্রসঙ্গ বাদই দেয়া যাক। ...দ্বিতীয় আরেকটা কারণে কাউকে কিছু জানাবেন না বস্। কথা উঠবে: তোমাদের কাছে প্রমাণ নেই যে বলবে মোহাম্মদ ফতে আলীই জঙ্গি-নেতা ইউনুস আল-কবির, আর হামলা করতে চলেছে সে মহাসম্মেলনে। আর উনি এ-ও বলবেন, এটা তোমাদের একমাত্র সুযোগ ইউনুস আল-কবিরকে ধরার, তার সংগঠনকে ধ্বংস করে দেয়ার।'

'সেক্ষেত্রে নামকরা বহু মানুষের প্রাণের উপর ঝুঁকি নিচ্ছি আমরা,' বলল নবী।

'আসলে তা-ই,' বলল সোহেল। 'তবে এ ছাড়া বোধহয় কোনও উপায় নেই।'

'এ কথা ঠিক, আগে আমরা এত ঝুঁকি নিইনি,' বলল রানা। 'তবে এটাই চাইছেন বস। আমি কেবিনে পৌঁছেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। উনি বলেন, আমরা যদি কনফারেন্স শুরু হওয়ার আগেই ইউনুস আল-কবিরকে আটকাতে পারি, গোটা শান্তি মহাসম্মেলনের উপর জোরালো প্রভাব পড়বে। পৃথিবীর সেকেণ্ড মোস্ট ওয়াণ্টেড ক্রিমিনালকে ধরতে পারলে মহাসম্মেলনের রাজনৈতিক চুক্তিগুলো হবে দীর্ঘ মেয়াদী।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'বরাবরের মত ঠিক কথাই বলেছেন বস্।' প্রাণ-প্রিয় বন্ধুর দিকে চাইল। 'তোর কী মনে হয়, এখন কী করা উচিত?'

মৃদু হেসে ফেলল রায়হান ও নবী।

'বেশিরভাগ মানুষ কল্পনা-প্রবণ হয়,' বলল রানা, 'সুখ স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। আর সেটাকে কাজে লাগাব আমরা।'

'খুলে বল্।' নড়েচড়ে বসল সোহেল। একবার দেখে নিল রায়হান ও নবীকে, একটু রেগে আছে। ওই দুটো কী যেন গোপন করছে!

রানা বলল, 'স্মৃতি বলেছে, সত্যিকারের ইউনুস আল-কবিরের সমাধির ভিতর রয়েছে প্রাচীন জাহাজ ও আরও অনেক কিছু। আহমেদ শরীফও একই কথা বলেছে।' রায়হান ও নবীর দিকে চাইল। 'কী পেলে তোমরা?'

'আমরা হাতে সময় পাইনি,' প্রায় আপত্তি তুলল রায়হান। 'কাজেই আমাদের রিপোর্ট খুব ভাল কিছু হবে না।'

'আমরা শুনেছি,' কথা বলে উঠল নবী, 'ওই সমাধির ভিতর আছে ইউনুস আল-কবিরের শেষ দিনগুলোর বহু জিনিস-পত্র। সোনা-দানা ছাড়াও অতি মূলবান রত্নের কয়েকটা সিন্দুক। আর তার চেয়েও ঢের দামি একটা খাতা। ওটায় লিখিত ফতোয়ার কথা বলে গেছেন জেফ মার্টেল।' রানার দিকে চাইল নবী। 'তবে এসব ভুলও হতে পারে।'

'পারে, তবে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,' বলল রানা। 'ইমাম ইউনুস আল-কবিরের শেষ ক'টা দিনের কথা ভাবো। খ্রিস্ট ধর্ম এবং ইসলামের ততটা বিরোধ নেই, যতটা আছে মিল। দুই ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান খুবই সম্ভব, এবং কাম্য। লিখে গেছেন কীভাবে এটা হতে পারে। ওসব ফতোয়া হাতে পেতে হবে আমাদেরকে। সেক্ষেত্রে কোটি কোটি মুসলিম মুখ ফিরিয়ে নেবে জঙ্গিবাদ ও ফ্যানাটিসিজমের দিক থেকে।'

'কিন্তু ওসব আছে কোথায়?' মাথা নাড়ল সোহেল, 'কেউ জানে না। এই মুহূর্তে আমাদের বোধহয় বাস্তব সমস্যা নিয়েই মাথা ঘামানো উচিত। উদ্ধার করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে। ঠেকাতে হবে ইউনুস আল-কবিরের হামলা। এদিকে মনোযোগ দেয়া দরকার বলে মনে করছি।'

প্রসঙ্গ পাল্টে নিল রানা। 'একটা কথা মনে আছে তোর, সোহেল? লিবিয়ান সিক্রেট পুলিশ ধারণা করছে বন্দরের ওই পাইলট হারিস জামানই আসলে ইউনুস আল-কবির।'

'ওরা ভুল বোঝাতে চাইছে সবাইকে,' বলল সোহেল।

'গ্যাং ফেং তোকে বলেছে হারিস জামান ইউনুস আল-কবিরের সংগঠনের সঙ্গে জড়িত?'

'হ্যাঁ, বলেছে। ওরা দেখেছে দিনরাত ওই লোকের উপর চোখ রাখছে লিবিয়ান এজেন্টরা। যে-কোনও সময়ে গ্রেফতার করবে।'

'তা করতে পারে, কিন্তু পাবে শুধু একটা বুদ্ধু ছাগলকে,' বলে গম্ভীর হয়ে গেল রায়হান। মাথায়ই আসেনি সামনে মাসুদ ভাই।

'কোনও জরুরি কারণে তাকে টার্গেট করছে লিবিয়ানরা,' বলল রানা। 'সোহেল, তুই ফেং ও কাশেমের সঙ্গে যোগাযোগ কর। ওরা যেন তুলে নিয়ে আসে হারিসকে।'

'মিটিং শেষ হলেই জানিয়ে দেব,' বলল সোহেল।

নবীর দিকে চাইল রানা। ছেলেটা আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি হলো একটানা কাজ করে চলেছে। মুখে ক্লান্তি। তার বন্ধুর দিকে চাইল রানা। চকচক করছে রায়হানের চোখদুটো। 'একটা অপারেশনে যেতে পারবে, রায়হান?' জানতে চাইল রানা।

'আপনি বললে নিশ্চয়ই যাব!'

'তা হলে নিশাত আপার সঙ্গে তিউনিশিয়ায় যাচ্ছ তুমি। খুঁজে বের করবে ইউনুস আল-কবিরের সমাধি। তোমাদের সঙ্গে থাকবে স্বর্ণা, স্মৃতি এবং আরও দু'একজন।'

'আমিও ওদের সঙ্গে যাব,' জোর দিয়ে বলল সোহেল। রানা আপত্তি তুলবার আগেই চট্ করে যোগ করল, 'চেয়ারের সিটে বসে থাকতে থাকতে পিছনটা নীল হয়ে গেছে আমার!'

খুকখুক করে কাশল রানা। ছোটদের সামনে সোহেলের কথায় বিব্রত। তবে বুঝতে পারছে, জাহাজে আটকা পড়ে কী

রকম বিরক্ত হয়ে উঠেছে বেচারা। বাধা দিলেও মানবে না। কাজেই চুপ থাকল।

'আমাদেরকে সশস্ত্র থাকতে হবে,' বলল রায়হান, 'আর্কিওলজিস্টদের চতুর্থ লোকটাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'শুনেছি সুবিধার মানুষ ছিল না,' বলল সোহেল। 'এ-ও শুনেছি ওকে ধরে নিয়ে গেছে বারোজন টেরোরিস্ট। আমরা সতর্ক থাকব।'

'ওখানে একঘণ্টায় তোদেরকে পৌঁছে দেবেন আলম সিরাজ। দিয়েই আবার এখানে ফিরবেন। তা হলে এইটা ঠিক হলোঃ রায়হান আর সোহেল তো তৈরি; স্মৃতি, ক্যাপ্টেন নিশাত ও স্বর্ণা ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে নিলেই রওনা হবে দলটা। নেতৃত্বে থাকছে সোহেল। ওর পরামর্শ মত চলবে সবাই। সবুরের কাছে শুনেছি ওই সমাধিটা খুঁজছে জঙ্গি-নেতা ইউনুস আল-কবিরও। মরুভূমির ভিতর জঙ্গি ক্যাম্প করেছিল শুধু ওই সমাধি পাবার আশাতেই।' বন্ধুর দিকে চাইল রানা। 'যে-কোনও কিছুর জন্য তৈরি থাকবি।'

'তোর ভাবতে হবে না।'

ফোন বেজে উঠল। অপারেশন্স সেন্টার থেকে যোগাযোগ করছে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল রানা। 'বলো।'

'মাসুদ ভাই, রেইডার নিচু দিয়ে যাওয়া এক এয়ারক্র্যাফট ধরেছে। ওটা জঙ্গি ক্যাম্প থেকে উঠে চলে গেছে সাগরে।'

'ট্র্যাক করা সম্ভব?'

'না। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখা দিয়েই আবারও হারিয়ে গেছে। আমার ধারণা ঢেউয়ের মাথা ছুঁয়ে ছুটছে।'

'স্পিড আর বেয়ারিং?'

'কিছুই জানি না। মাত্র তিন সেকেণ্ডের ব্লিপ।'

'ঠিক আছে।' ক্রেডলে রিসিভার রাখল রানা। 'আল-কবিরের

লোক রওনা হয়েছে।'

'খুব জলদি!' ঘড়ি দেখল সোহেল।

'বোধহয় আমাদের কারণে ঝামেলা হয়েছে, তাতে ডেডলাইন বদলে গেছে,' চুপ হয়ে গেল রানা। খানিক বিরতি দিয়ে বলল, 'ওরা উপকূলের কাছে কেন?'

'প্রশ্ন তো সেটাই, মাসুদ ভাই,' বলল রায়হান। 'কেন এল সাগরের দিকে? ওদেরকে সহজে স্পট করা যাবে।'

'রওনা হওয়ার আগেই তুমি ইন্টারনেটে লিবিয়ান নেভাল ফোর্স সার্চ করবে,' বলল রানা। 'দেখবে কাছাকাছি কোথায় কী আছে। বিশেষ খেয়াল দেবে যেসব জাহাজে নামতে পারে হেলিকপ্টার।'

বারো

নিজের সিঙ্গেল খাটে বসে ছিল গ্যাং ফেং, তখনই এল ফোনটা। বড় জোর দশ সেকেণ্ড শুনল, তারপর কোনও আওয়াজ না করে সেল ফোনের ঢাকনি বন্ধ করল, নিঃশব্দে চাপল দীর্ঘশ্বাস।

তবে উত্তপ্ত ঘরের আরেক প্রান্ত থেকে কাশেম বক্স জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, ফেং?'

এরই ভিতর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে দু'জনের।

সোহেল আহমেদ আগেই ওদেরকে ব্রিফ করেছে। কাজেই এই ফোনালাপ ছিল সংক্ষিপ্ত। তবে ফেঙের চেহারা নীরবে বলছে, ওদের জন্য রয়েছে খারাপ সংবাদ।

'মাসুদ ভাই চাইছেন আমরা হারিসকে মার্ভেলে ধরে নিয়ে যাই।'

'কখন? আজ রাতে?'

'এখনই।'

'কেন?'

'জানতে চাইনি।'

চায়নিজ টঙের কাছ থেকে এই নোংরা ঘুপচি ঘরটা ভাড়া নিয়েছে ওরা। কোনও এয়ারকুলার নেই। বাথরুমের ট্যাপে পানি নেই। ঘরে ছোটাছুটি করছে ধেড়ে ইঁদুর আর প্রমাণ সাইজের তেলাপোকা। মচমচে খাটের জাজিমের ভাঁজে অযুত-নিযুত ছারপোকা, একেকটা বিশাল আকারের।

গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পোশাক খুলে ফেলেছে ওরা। পরনে শুধু বক্সার শর্টস্। গা থেকে দরদর করে ঝরছে ঘাম।

আলনা থেকে পোশাক নিয়ে পরতে শুরু করল গ্যাং ফেং। প্যাণ্ট পরবার আগে ঝেড়ে ফেলতে চাইল তেলাপোকাগুলোকে। একই কাজ করছে কাশেম। কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে উঠে আসছে নীচতলার রেস্টুরেণ্টের সুস্বাদু খাবারের সুবাস।

'আমরা তৈরি, বলা যায় না,' কপাল-মুখ মুছে বলল কাশেম।

'মাসুদ ভাই জানিয়েছেন হারিস জামানের পেট থেকে তথ্য বেরুবে, কাজেই তাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।'

'দুর্নীতি পরায়ণ লোক, কিন্তু বিপজ্জনক মনে হয়নি আমার।'

'অথচ বাড়ি ও বন্দরে তার উপর নজর রাখছে লিবিয়ান সিক্রেট এজেণ্ট।' কাঁধ ঝাঁকাল ফেং। 'কাজেই তাকে আরও বেশি সন্দেহ করা উচিত আমাদের। কালকে সোহেল ভাই বলেছেন লিবিয়ান অফিসাররা ধারণা করছে, এ লোক ইউনুস আল-কবিরের ঘনিষ্ঠ কেউ। জঙ্গিদের সঙ্গে ভাল ভাবেই জড়িত। অথচ লোকটার লাইফস্টাইল টেরোরিস্টদের মত নয়। আধ ডজন

বিবাহিত বয়স্কা মেয়েলোকের সঙ্গে বিছানায় যাবে সত্যিকারের জঙ্গি? যে-কোনও সময়ে তো পুলিশের হাতে ধরা পড়বে এই লোক ঘুষ খেয়ে। ...আমি আসলে জানি না এ কে বা কী।'

'আমার ধারণা যদি ঠিক হয়, ইউনুস আল-কবিরের সঙ্গে জড়িত নয় হারিস,' বলল কাশেম। 'কিন্তু তা হলে ওর উপর চোখ রাখছে কেন লিবিয়ান সিক্রেট পুলিশ? ধরতে দেরিই বা করছে কেন? কান ধরে নিয়ে গেলেই তো হয়!'

'নিশ্চয়ই গুটিয়ে আনছে জাল,' বলল ফেং। 'মাসুদ ভাইও চাইছেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। এই লোক সমস্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আরও কী করছে বা করেছে সেই বলতে পারবে।'

গোড়ালির কাছে বাঁধা হোলস্টারে কমপ্যাক্ট গ্লক ১৯ পিস্তল রাখল কাশেম, তারপর পরে নিল প্যান্ট। শার্ট পরতে শুরু করে বলল, 'লিবিয়ান সিক্রেট পুলিশের চোখের সামনে থেকে ব্যাটাকে নিয়ে যাওয়া কঠিনই হবে।'

'এতে দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়বে আমাদের,' বলল ফেং। হাসি-ঠাট্টার মানুষ নয় সে, সবসময় গম্ভীর থাকে মুখ। 'বয়স্ক চায়নিজরা বলেন, "নিজ খাবারের তালিকা বড় করো, খেতে শুরু করো ঘাস-ফড়িং; বিপদে পড়লে দেখবে দুনিয়া ভরা খাবার।"'

শুকনো হাসল কাশেম। 'শেষ খবর অনুযায়ী হারিস আছে তিন নম্বর প্রেমিকার বাসায়।'

'আশপাশে লিবিয়ান কর্তৃপক্ষ নেই। আমাদের খুশি হওয়া উচিত। এতক্ষণে হারিস টের পেয়েছে সিক্রেট পুলিশ তাকে খুঁজছে। হয়তো ভাববে মার্ভেলে ঠাঁই নেয়াই বুদ্ধির কাজ হবে। আমরা শুধু উৎসাহিত করব। বুঝিয়ে দেব সঙ্গে না গেলে কী ঘটতে পারে। আন্দাজ করছি, ব্যাটা সঙ্গে যাবে।'

হারিসের তৃতীয় উপ-পত্নী এক জাজের স্ত্রী। সে লোকের ফ্ল্যাট পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতে। এসব পাথুরে দালান এক

শ’ বছরের বেশি পুরনো। জানালা ও ব্যালকনিতে রট আয়ার্ন গ্রিল। সমতল ছাতে অজস্র বেকার স্যাটালাইট ডিশ। প্রায় প্রতিটি ফ্ল্যাট-বাড়ির নীচতলায় দোকান ও বুটিক। সেসব দোকান থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিস কেনে বিত্তবানরা।

পাশের ফুটপাথ চওড়া ও পরিচ্ছন্ন, তবে পেঁচানো এবং সরু পথ। তৈরি করা হয়েছিল বহু আগে ঘোড়াগাড়ি চলবার জন্য। এসব পথের কারণে এই মহল্লা নিঝুম নিরালা থাকে। নতুন কেউ হঠাৎ ঢুকে পড়লে ভাবতে পারে, বড় কোনও শহরে নয়, খুদে জনপদে হাজির হয়েছে।

চায়নিজ গ্যাঙের সদস্যরা হারিস জামানকে অনুসরণ করে এখানে অপেক্ষা করছে ভাঙাচোরা একটা ডেলিভারি ভ্যান নিয়ে। উপ-পত্নীর ফ্ল্যাটবাড়ির উল্টোদিকে থেমেছে তারা। বনেটের হুড খুলে ইঞ্জিন থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে কয়েকটা পার্টস্। সব রাখা হয়েছে ফুটপাথে তারপুলিনের উপর। আরবদের আলখেল্লা ও পশ্চিমা পোশাকের পুরুষ ও মহিলারা দ্বিতীয়বার না চেয়েই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

চায়নিজ ক্রিমিনালদের ভ্যান থেকে অনেক সামনে একটা গ্রোসারির দোকানের পাশে গাড়ি রেখেছে গ্যাং ফেং ও কাশেম। দোকানের দরজার পাশেই কমলার বিন, ওখান থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি-টক সুবাস।

গ্লাভ্স্ কমপার্টমেন্টের ভিতর ডানহাত ভরল ফেং, চোখ রেখেছে সরু পথের উপর। কোথাও কোনও অস্বাভাবিকতা দেখলে সতর্ক হবে। চারদিকে চোখ রেখেছে কাশেমও। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর তেমন কিছু চোখে পড়ল না ওদের। দুই বৃদ্ধ একটা ক্যাফের বাইরে পাতা টেবিলে ব্যাকগ্যামন খেলছেন। একটা ফার্নিচারের দোকানে ন্যাকড়া দিয়ে টেবিল-চেয়ার পরিষ্কার করছে এক ছেলে। রাস্তার উপর নজর নেই তার। কড়া রোদ

পড়েছে, তেমনি গনগনে গরম। চায়নিজ দলের ছোকরা দুটো ছাড়া এখানে কেউ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে না।

এই ব্লকের শেষে আছে বিশাল একটা কনস্ট্রাকশন সাইট। ওখানে কাজ করছে একটা ক্রলার ক্রেন। মালামাল তুলছে দশ তলায়। স্টিল ও কংক্রিটের ওই ফ্রেমওঅর্ক কিছু দিনের ভিতর হয়ে উঠবে বিলাসবহুল কণ্ডোমিনিয়াম্। ওদিকে সন্দেহজনক কিছু দেখল না ফেং ও কাশেম। নিয়মিত গেট দিয়ে যাওয়া-আসা করছে সিমেণ্ট মিক্সারের ট্রাক।

'তৈরি, কাশেম?' কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল ফেং।

নিচু স্বরে বলল বাঙালি কমাণ্ডো, 'হ্যাঁ, চলো যাওয়া যাক।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ওরা। হ্যাট ও কালো সানগ্লাস পরে নিয়েছে ফেং। কেউ চট্ করে বুঝবে না ও চায়নিজ। ওদের পরনে ঢিলা প্যাণ্ট ও শার্ট। এ পোশাক পাওয়া যায় মিডল ইস্টের যে-কোনও এলাকায়। বিপদে পড়লে দ্রুত সবার ভিতর হারিয়ে যেতে পারবে ওরা।

ডেলিভারি ভ্যান পেরুনোর আগে চায়নিজ এক ছোকরার হাতে একটা ডিসপোযেবল সেল ফোন দিল ফেং, ফিসফিস করে বলল, 'এখান থেকে সরে চারপাশে নজর রাখো। খেয়াল রেখো আমাদের লাল ফিয়াটের উপর। স্পিড-ডায়ালে দুই নাম্বার টিপলে পাবে আমাকে।'

মনেই হলো না ছোকরা শুনতে পেয়েছে। তবে তার সঙ্গী ধুপ্ করে ইঞ্জিন বনেট নামিয়ে দিল। না থেমেই ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে রওনা হয়েছে ফেং ও কাশেম।

সদর দরজা তালাবদ্ধ নয়। তবে লবির সোফায় বসে আছে কালো ইউনিফর্ম পরা এক প্রহরী, মনোযোগ দিয়ে পড়ছে খবরের কাগজ। লবিতে পাশাপাশি হেঁটে ঢুকে পড়ল ফেং ও কাশেম, ভাব দেখে মনে হলো এই মাত্র কৌতুক বলেছে ফেং। হাসছে দু'জন।

খেয়ালই করল না প্রহরীকে। তবে পেপার রেখে আরবিতে কী যেন বলল লোকটা।

বুঝবার কথা নয় ফেং বা কাশেমের।

কাশেম বুঝলও না কী মুভ নিল ফেং। ওর ধারণা, যথেষ্ট কাছে পৌঁছনো হয়নি।

ফেন্সারদের মত তীরবেগে সামনে বাড়ল ফেং। ডানহাত নড়ে উঠতেই আড়ষ্ট তালুর বাইরের কিনারা ছোবল দিল গার্ডের গলায়, অ্যাডাম্স্ অ্যাপলের ঠিক নীচে। লোকটাকে খুন করতে পারত ফেং, তবে নিয়ন্ত্রিত আঘাত হেনেছে। মস্ত হাঁ করল গার্ড, আর ঠিক তখনই আরেকটা চপ পড়ল ঘাড়ের উপর। হঠাৎ উল্টে গেল লিবিয়ানের চোখ, বেরুল সাদা অংশ। জ্ঞান হারিয়ে ধুপ করে পড়ল সোফার উপর।

কাঁচের দরজার দিকে চট্ করে চাইল ফেং। বাইরে থেকে খেয়াল করেনি কেউ। তবে যে-কোনও সময়ে আসতে পারে যে-কেউ। কাশেমের সাহায্য নিল ফেং, লিবিয়ানের ধড়টা তুলল ওরা, নিয়ে এল পিছন-ঘরে, শুইয়ে দিল মেঝের উপর। পিছন-দেয়ালে এক সারিতে মেইলবক্স।

'কখন জ্ঞান ফিরবে?' জানতে চাইল কাশেম।

'আন্দাজ এক ঘণ্টা।' গার্ডের পকেট হাতড়াতে শুরু করেছে ফেং। আইডি পেয়ে পড়ল। গার্ডের নাম মনসুর মালিক। 'এসো, যাওয়া যাক হারিস জামানের কাছে। সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় উঠেই সামনের দরজা।'

পিস্তল হাতে লবিতে বেরুল ওরা। কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। উপর থেকে নামছে না কেউ। লোকজন বোধহয় লিফট ব্যবহার করে।

পাঁচতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। সামনের হলওয়ে কার্পেট দিয়ে মোড়া। একটু পর পর বাতি জ্বলছে। এই তলায়

ছয়টি অ্যাপার্টমেন্ট। ভারী মজবুত কাঠের কারুকার্য করা দরজা। কাঠের মিস্ত্রিরা আগে অনেক যত্নে, অনেক সময় ব্যয় করে তৈরি করত এসব। খুশি হয়ে উঠল ফেং ও কাশেম: দরজায় পিপহোল নেই।

উপ-পত্নীর অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় মৃদু নক করল ফেং। কয়েক মুহূর্ত পেরুল, তারপর শোনা গেল মহিলার অস্পষ্ট কণ্ঠ। বোধহয় নামধাম জানতে চাইছে। কাজেই ফেং বলল, 'আমি, মনজুর হোসেন।'

আবারও কী বলে উঠল মহিলা। বোধহয় জানতে চাইছে, কী চাই। কাজেই প্রথমে যে কথা মনে এল ফেঙের, তাই বলল। 'আল-জারিফের মেইল। ফেডারাল এক্সপ্রেস, ম্যাডাম।' এই শহরে ওই চকচকে ট্রাক দেখেছে।

হাতের ইশারা করল ফেং, সরে যেতে বলছে কাশেমকে। অ্যাপার্টমেন্টের ভিতর থেকে শিকলের আওয়াজ এল। খোলা হলো দুটো লক। আর তখনই কাঁধ দিয়ে দরজার উপর প্রচণ্ড গুঁতো দিল ফেং। ভেবেছিল সহজে কবাট খুলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে মেঝের উপর। কিন্তু দরজা সরে যেতেই ধাক্কা খেল মহিলার মোটা দেহে, পিছলে গেল পা। মহিলাকে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল ফেং। আর সে-কারণেই বেঁচে গেল। ওর কাঁধের উপর দিয়ে গেল সাইলেন্সড্ পিস্তলের বুলেট।

মুখটা প্রকাণ্ড হাঁ করে বিকট চিৎকার ছাড়ল বিচারকের বিবি। ততক্ষণে শরীর গড়িয়ে দিয়ে সোফার আড়ালে সরে গেছে ফেং। 'হারিস, গুলি কোরো না,' শান্ত স্বরে বলতে চাইল, কিন্তু ধকধক করছে বুক। 'গুলি কোরো না, প্লিয। আমরা তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

আক্রান্ত হয়নি বুঝতে পেরে থেমে গেল মহিলা। ব্রেসিয়ার ও প্যান্টির উপর হাত রেখে ফেঙের দিকে চেয়ে আছে। গ্র্যাণ্ডফাদার

ক্লক টিকটিক করছে, আর কোনও আওয়াজ নেই।

'কে তুমি?' আড়াল থেকে জানতে চাইল হারিস।

'কয়েক দিন আগে একটা ট্রাক নামিয়েছ জাহাজ থেকে,' বলল ফেং। 'আমি ওই জাহাজের লোক।'

'নেপলস্ থেকে এসেছে ওই জাহাজ?'

'হ্যাঁ।'

'কার মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় আমার সঙ্গে?'

'বাংলাদেশি এক লোকের মাধ্যমে।'

'ঠিক আছে, উঠে দাঁড়াতে পারেন।'

সাবধানে উঠে দাঁড়াল ফেং, পিস্তলের ট্রিগারের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে তর্জনী। 'আমরা দুজন আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'.

এবার ঘরে ঢুকল কাশেম বক্স। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইল হারিস জামান, তারপর আবারও চোখ ফেরাল ফেঙের উপর। হ্যাট ও সানগ্লাস খুলে ফেলেছে চায়নিজ এজেন্ট, নিজেকে দেখতে দিচ্ছে। 'গত ক'দিন আগে আপনাকে দেখেছি, তখন হেলম্স্ম্যানের অভিনয় করছিলেন। তার পর থেকে মনে হচ্ছে আমি পাগল হয়ে গেছি আপনাদের কারণে। সর্বক্ষণ আমাকে নজরবন্দি করে রেখেছে কেউ। যেখানে যাচ্ছি চায়নিজরা পিছু নিচ্ছে। এখন বুঝতে পারছি ওরা কেন পিছু নিয়েছে। আপনার কারণে।'

'স্থানীয় কয়েকটা ছেলেকে কাজে নিয়েছি,' পিস্তলটা প্যান্টের ওয়েস্টব্যাণ্ডে গুঁজে রাখল ফেং।

এগিয়ে এল হারিস, দু'হাতে মহিলাকে উঠতে সাহায্য করছে। ভারী ওজন তুলতে গিয়ে টলমল করে উঠল সে। চোখ-নাকের অশ্রু পড়েছে ঘন গোঁফে, ডানহাতে তা মুছল উপ-পত্নী। কমপক্ষে দু' শ' পাউণ্ড ওজনের মাল, আন্দাজ করল ফেং। উচ্চতা হবে

পাঁচ ফুটের কম, ফলে তাকে লাগছে মস্ত এক বাস্কেটবলের মত।

হারিস জামান দেখতে মোটেই ভাল নয়, পাক ধরেছে চুলে, খসে পড়েছে গোটা দুয়েক দাঁত, তবে যথেষ্ট বিনয়ী। এই মোটা মহিলার চেয়ে অনেক ভাল কোনও মেয়েকে পটাতে পারত। বোধহয় ভালবাসার জন্য নয়, এখানে আসে তথ্য পাওয়ার জন্য। আর যাই হোক, মহিলা একজন বিচারকের বউ।

মহিলার বাঁধাকপির মত কানের ভিতর গুনগুন করে আশ্বাস দিয়ে চলেছে হারিস। অ্যাপার্টমেণ্ট ঘুরে এল ফেং। ফার্নিচারগুলো দামি, চামড়ার নতুন এক সেট সোফাও আছে, পাশেই মার্বেলের কফি টেবিল। ওটার উপর চকচকে ম্যাগাজিনের সব নতুন সংখ্যা। কাঠের মেঝের উপর পারস্যের কার্পেট। এক দেয়ালে কাঠের তাক, সেখানে সারিসারি চামড়া দিয়ে মোড়া আইনের বই। দেয়ালে কাঁচে ঢাকা জিয়োমেট্রিক ডিজাইন। বোধহয় ওই মহিলার তৈরি। ব্যালকনি থেকে আসা হাওয়া দুলিয়ে দিচ্ছে দামি পর্দা। নীচ থেকে জোরালো কোনও আওয়াজ আসছে না।

উপ-পত্নীর পশ্চাদ্দেশে চাপড় দিল হারিস, মহিলাকে পাঠিয়ে দিল বেডরুমে।

'খুবই ভাল মেয়ে,' মহিলা চলে যাওয়ার আগেই বলল। আর চলে যেতেই বলল, 'তবে মাথায় বুদ্ধি নেই মোটেও। দেখতে খারাপ, তবে বিছানায় একেবারে বাঘিনী।'

শিউরে উঠল কাশেম ও ফেং, চট্ করে পরস্পরের দিকে চাইল।

'কোনও ড্রিঙ্ক, জেণ্টলমেন?' জানতে চাইল হারিস। 'জাজ পছন্দ করেন জিন। তবে এনে রেখেছি স্কচ হুইস্কি। আর, সত্যিই, আমি দুঃখিত আপনাদের দিকে গুলি করেছি। ওটা রিফ্লেক্স ছিল। ভেবেছি সে এসেছে।'

'অভিনয় বাদ দিলেই ভাল হয়, মিস্টার হারিস,' বলল ফেং।

ক' মুহূর্ত পেরুল, কেউ কোনও কথা বলল না। হারিসের চোখ খেয়াল করছে ফেং। সে-ও চেয়ে আছে। যেন বুঝতে চাইছে এরা ওকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এসেছে, না ক্ষতি করতে।

একটু ঝুঁকে এল হারিসের দু' কাঁধ। 'ঠিক আছে, আর কোনও অভিনয় নয়।' এখনও ইংরেজি বলছে, তবে সুর অন্য রকম। 'আমার জীবন শেষ। কোনওভাবেই বাঁচতে পারব না। কাজেই অভিনয় করেই বা কী হবে? কারা আপনারা? ওই জাহাজে আমি ভেবেছিলাম আপনারা আইএসআই।'

'মস্ত ভুল ভেবেছেন,' বলল ফেং। 'ও কাশেম বক্স। আমার নাম গ্যাং ফেং।'

'আপনারা এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজতে।'

'হ্যাঁ। মিশন তা-ই ছিল। পরে বদলে গেছে। এখন শুধু প্রধানমন্ত্রীকে খুঁজছি না, চাই ইউনুস আল-কবিরকেও।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে, আপনারা তাকে ধরতে চান। ওই লোকের সংগঠন অক্টোপাসের মত বাহু ছড়িয়ে রয়েছে লিবিয়ান সরকারের ভিতর। ছায়ার ভিতর কাজ করছে। উঁচু পর্যায়ের অফিসারদের ভিতরও ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেদের বিষ।'

'আপনি নিজে কে এবং কেন জড়িয়ে পড়েছেন?'

'আমার নাম লিও সিলভারম্যান।'

কথা শুনে চমকে গেল ফেং ও কাশেম। ওদের মনে হলো ঘুসি খেয়েছে পেটে।

'মোসাদ?' সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল কাশেম। 'আমরা জেনেছি আপনি এখানে আছেন পাঁচ বছর ধরে।'

'ভুল ভেবেছেন। সিআই-এর সঙ্গে আছি। আমার কাভার ফাইল গেছে ওই পাঁচ বছর পর্যন্ত। নিজে ত্রিপোলিতে এসেছি আঠারো মাস আগে। সিআইএ সন্দেহ করছে কিছুদিনের ভিতর নর্থ আফ্রিকা দখল করবে ইউনুস আল-কবির। আর এই কারণেই

ডিপ কাভার এজেন্টদেরকে পাঠিয়েছে মরোক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া আর লিবিয়ায়। তারপর যখন জানা গেল প্রথম হামলা আসছে লিবিয়া দখল করতে, অন্যান্য এজেন্ট ফিরে গেল, কিন্তু আমি রয়ে গেলাম এখানে।'

'এসব মহিলাদের সঙ্গে মাখামাখির ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইল কাশেম।

গলা নিচু করল সিলভারম্যান, 'একাকী মহিলার সঙ্গে মিশতে হয়, কারণ এদের স্বামীরা ক্ষমতাধর। এসপিয়োনাজের প্রথম শর্ত তো ওটাই।'

'বন্দরে কী কাজ করতেন?' জানতে চাইল ফেং।

'কী আসছে আর কী যাচ্ছে, তা দেখতাম। আর্মস, সাপ্লাই, সবকিছুই আনিয়েছে ইউনুস আল-কবির। এসবের ভিতর একটা মডিফায়েড হিন্দ গানশিপও এসেছে পাকিস্তান থেকে। ওটা ব্যবহার করা হতো কাশ্মিরের উঁচু পাহাড়ে। অন্য কপ্টার অত উঁচুতে উঠতে পারে না। আমি বুঝতেই পারিনি হিন্দ দিয়ে কী করবে। তারপর বুঝতে পারলাম কেন ক্র্যাশ করেছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিমান।'

'আমাদের কয়েকজন ওই হিন্দ ধ্বংস করে দিয়েছে,' বলল ফেং। 'উদ্ধার করা হয়েছে লিবিয়ান ফরেন মিনিস্ট্রির শ' খানেক মানুষকে।'

'প্রথম যখন মিনিস্টার হিসাবে মোহাম্মদ ফতে আলীর নাম এল, তখন গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল। সাংবাদিকরা রিপোর্ট করে ওই মিনিস্ট্রির সবাই চলে গেছে, রিটায়ার করেছে, বা ট্র্যান্সফার হয়ে চলে গেছে সরকারের অন্য ডিপার্টমেন্টে। লিবিয়া এখনও পুলিশ স্টেট, কাজেই সবাই জানে অফিসারদের কাছে জবাব চাইলে বিপদে পড়তে হবে।'

'ঠিক আছে, পরে এ নিয়ে আলাপ করব আমরা,' বলল ফেং।

'এখন আপনাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। আপনার অফিস আর বাড়িতে ফাঁদ পেতেছে সিক্রেট পুলিশ।'

'তাই তো এখানে লুকিয়ে আছি।'

'আপনার একযিট স্ট্র্যাটেজি কী?'

'দু' তিনটা পথ ভেবে রেখেছি। তবে ধারণা করছি, আমার কণ্ট্যাক্টরা আগেই জানিয়ে দেবে কোন্ পথে বেরুতে হবে। যে-কোনও সময়ে পালাতে হতে পারে, তাই তৈরি আছি। জজসাহেব বাড়ি ফিরলেই অ্যাম্বুশ করব, বেঁধে রেখে তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাব এখান থেকে। সঙ্গে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস আছে, ওটা আমার লোকেশন জানিয়ে দেবে আমেরিকান স্যাটালাইটকে। আগেই জানিয়ে দিয়েছে, যেতে হবে দক্ষিণের মরুভূমিতে। যতটা পারা যায় সরে যেতে হবে। তারপর চাদের ডার্ফা-র রিফিউজিদের রিলিফ এজেন্সির ছদ্মবেশে আসবে সিআইয়ের কপ্টার।'

'ওদের চাইতে অনেক আগেই আপনাকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে পারব আমরা। তবে সেক্ষেত্রে এখনই রওনা হতে হবে।'

ফেঙের কথা শেষ হতে না হতেই বাজল সিলভারম্যানের ফোন। রিসিভ করল সে, তবে কথা না বলেই শুনতে লাগল। কানেকশন কেটে যাওয়ার পর বলল, 'বড় দেরি হয়ে গেল। আমার কণ্ট্যাক্ট জানাল এই এলাকায় চলে এসেছে পুলিশের দুটো ভ্যান। এদিকে আসছে হেলিকপ্টার। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলবে, তারপর জানাবে যদি বাঁচতে চাই, আত্ম-সমর্পণ করতে হবে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এই দালান থেকে একটা গোপন পথে বেরুনো যায়। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারব না। ঠিক করেছিলাম জাজ বাড়িতে ফিরলে ওই পথে পালাতে হবে।'

চট্ করে সিদ্ধান্ত নিল ফেং। 'আমরা দু' ভাগে ভাগ হয়ে যাব। কাশেম, তুমি সিলভারম্যানের সঙ্গে যাবে। কোনও এম্বাসিতে ঠাঁই নেয়ার চেষ্টা করবে। তবে বাংলাদেশ এম্বাসি বা আমার

দেশেরটায় না। সুইটজারল্যাণ্ড বা অন্য আনঅ্যালাইড দেশ হলে ভাল। ওখানে নিরাপদে থাকবে তোমরা।'

'তুমি কী করবে, ফেং?'

'তোমাদের দু'জনের উপর থেকে সরিয়ে নেব পুলিশদের মনোযোগ। সিলভারম্যান, মাস্টার বাথরুম কোনটা?'

'ওদিকে,' বন্ধ বেডরুম দেখিয়ে দিল সিলভারম্যান।

দ্রুত পায়ে গিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। সিলভারম্যান ও জাজের স্ত্রী নিচু স্বরে কয়েক মুহূর্ত আলাপ করল। মহিলাকে সান্ত্বনা দিল সিআইএ এজেন্ট। মোটা মহিলা এখনও পোশাক পরেনি। গজগজ করে অভিযোগ হানল। এদের পাত্তা দিল না ফেং, বাতি জ্বেলে দিল বাথরুমের। কাবার্ডের ডালা খুলে খুঁজতে লাগল। দশ সেকেণ্ডের আগেই পেয়ে গেল যা চাইছে।

প্রথমেই নিজের চুলগুলোকে ব্রাশ করে সিলভারম্যানের কোঁকড়া চুলের মত করে নিল। তার উপর ঢালল ট্যালকম পাউডার। দূর থেকে মনে হবে কাঁচা-পাকা চুল। ভুরু বদলে গেল কসমেটিক পেন্সিলের বদৌলতে। মুখের ভিতর চালান হলো টয়লেট পেপার, ফুলে উঠল গাল। মাসকারার বোতল পাল্টে দিল মুখ। দূর থেকে ঠিক লিও সিলভারম্যানের মতই লাগবে।

ফেং কী করছে দেখছে সে, খুলে ফেলল নিজ হার্বার পাইলটের শার্ট, ওটা দিয়ে দিল ফেংকে। বদলে পরে নিল ফেঙের খুলে দেয়া শার্ট।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল আমেরিকান এজেন্ট, পথ দেখিয়ে ঢুকে পড়ল উপ-পত্নীর ক্লজিটের ভিতর। ঝুলন্ত পোশাক সরাল সে, পিছন থেকে এল মহিলার তীক্ষ্ণ চিৎকার। তার ক্লজিটে কী করছে, জানতে চাইছে। পাত্তা দিল না সিলভারম্যান, সরিয়ে ফেলল জঘন্য দুর্গন্ধওয়ালা জুতোর র‍্যাক। দেখা গেল দেয়ালের সঙ্গে রাখা একটা তক্তা। ওটা সরাতেই দেখা গেল দুই ফুট চওড়া

ফাঁকা এক অংশ। এই ফাঁকা অংশ গেছে দালানের শেষ মাথা পর্যন্ত। উল্টোদিকে অন্য অ্যাপার্টমেন্টের পিছন-দেয়াল। মাথার উপর দুটো ধুলো ভরা স্কাইলাইট, ওখান থেকে আসছে আলো।

'বাড়িটা যখন অফিস থেকে পাল্টে ফ্ল্যাটবাড়ি করা হলো, তখন এই অংশ ব্যবহার করা যায়নি,' ব্যাখ্যা দিল লিও। 'পুরনো ব্লুপ্রিণ্টে দেখতে পাই। এই ফাঁকা অংশ নেমে গেছে নীচে। ওখানে আরেকটা তক্তা রেখেছি। ওটা সরিয়ে বেরুতে পারব গ্যারাজে।'

'ঠিক আছে, তা হলে আপনারা দু'জন নামতে শুরু করুন। কাশেম, তুমি আমাদের গাড়ি নিয়ে গ্যারাজে ফিরবে, তুলে নেবে সিলভারম্যানকে। বাড়িটা এখনও ঘেরাও করেনি পুলিশ। করবেও না, আমার পিছনে তাড়া করবে ওরা।'

'অবশ্য ওরা যদি পুলিশ হয়ে থাকে,' বলল সিলভারম্যান। 'নিশ্চয়ই জানেন ইউনুস আল-কবির গাদ্দাফির সরকারের ভিতর নিজের ছায়া সরকার চালাচ্ছে।'

'এখন কে আসছে ভেবে কী হবে?' বলে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল কাশেম। দুই পা দু'দিকের দেয়ালে রাখল, সাবধানে নামতে শুরু করল। ওর নড়াচড়ার কারণে উঠল মিহি সাদা ধুলো। হাত-পায়ের চাপে বাঁকা হয়ে গেল কাঠের দেয়াল। প্লাস্টারের টুকরো খসে পড়ছে অনেক নীচের অন্ধকারে।

জাজের বউয়ের মরণ-আলিঙ্গন থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইল সিলভারম্যান। মহিলার চোখে বৃষ্টির বান নেমেছে, ফোলা গালদুটো থেকে মেখে নামছে মেকআপ, প্রতি ফোঁপানির সঙ্গে দুলে উঠছে বিশাল দুই স্তন।

তারপর 'আহা, মেয়েমানুষ!' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারল সিলভারম্যান, রওনা হয়ে গেল কাশেমের পিছনে।

অনুসরণ করল ফেং। তবে সে নামছে না। কয়েক ফুট সরে গেল, এখন আর কাশেম বা সিলভারম্যানের মাথার উপর প্লাস্টার

পড়বে না। উপরে উঠতে লাগল সে। তাকে মাত্র বারো ফুট উঠতে হবে। তিন মিনিট পেরুল না স্কাইলাইটে পৌঁছে যেতে। শাফট থেকে এল গনগনে তাপ। ভেসে আসছে পুলিশ-কপ্টারের আওয়াজ। তিক্ত মনে ভাবল, হাতে সময় নেই। কাঁচের প্যানগুলো শক্ত করে ধরল ফেং, কিন্তু ধুলো জড় হয়ে পাথরের মত জমাট বেঁধে গেছে ধাতব ফ্রেম। কয়েকবার টানা-হ্যাঁচড়ার পর একটু ঢিলে হলো।

স্কাইলাইটের উপর দিয়ে ভেসে গেল একটা ছায়া।

কপ্টার!

ঢোক গিলল ফেং, জোর টান দিল বড় প্যানের উপর। ধুপ্ আওয়াজে খুলে গেল ওটা। দ্বিগুণ হলো কপ্টারের আওয়াজ। দুপুরের রোদ আরও কড়া হয়েছে। মনে হলো এয়ার-কণ্ডিশনারের মোটরের ভিতর ঢুকে পড়েছে ও।

স্কাইলাইট থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর শরীর গড়িয়ে দিল ফেং, তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েই চারপাশে চাইল। কয়েক ব্লক দূরে দালানগুলো থেকে এক শ' ফুট উঁচুতে ভাসছে পুলিশের কপ্টার। অপেক্ষা করল ফেং। দুই মিনিট পর ওকে খেয়াল করল স্পটার। ঘুরে গেল কপ্টার, তেড়ে এল বজ্র আওয়াজ তুলে। সাইড ডোর খুলে গেছে। ওখানে পুলিশের স্নাইপারকে দেখা গেল। কাঁধে তুলছে স্কোপওয়ালা রাইফেল।

দুই বাড়ির ছাতের মাঝখানে বুক সমান উঁচু প্যারাপেট। ওটার দিকে ছুটতে শুরু করল ফেং। দুই পা ডেবে যেতে চাইল গরম বিটুমেনে। দেয়ালের মাথার উপর কাঁচ। কপাল ভাল যে কাঁটাতারের মত ধারালো নয় ওগুলো, বছরের পর বছর বাতাসের অত্যাচারে মসৃণ। অনায়াসেই দেয়াল পেরুল ফেং, এসে নামল অন্য পাশে।

প্রথম বাড়ির মতই এই বাড়িটাও। বিস্তৃত ছাত, মাঝখানে শুধু

এলিভেটর হাউসিং, ডজনখানেক স্যাটালাইট ডিশ ও নষ্ট অ্যান্টেনা। ছাত ছুঁয়ে তেড়ে এল কপ্টার। কয়েক সেকেণ্ড ব্যয় করল ফেং। স্নাইপার নিশ্চিত হয়ে গেল ওই লোক হারিস জামান না হয়েই যায় না। দুই সেকেণ্ড পর এল তিন রাউণ্ডের গুলিবর্ষণ। ফেঙের পায়ের কাছে নরম বিটুমেন খুবলে নিল ওগুলো।

পুলিশ এখন জানে তাদের লোক ছাতে উঠেছে। সহজে সিলভারম্যানকে নিয়ে পালাতে পারবে কাশেম।

সাপের মত এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করল ফেং, শার্পশুটারকে এড়াতে চাইছে। আরেকটু হলে পড়ে যেত ছাত থেকে। শেষ মুহূর্তে টের পেল এই বাড়িতে ফায়ার এস্কেপ ঠিক জায়গায় নেই। দেয়ালে গেঁথে দেয়া হয়েছে ধাতব মই। চোখের সামনে মরণ-ফাঁদ দেখল ফেং। মই বেয়ে নামতে গেলে খুব কাছ থেকে গুলি করবে স্নাইপার।

চট্ করে পিছনে চাইল ফেং, মাথার উপর ঘুরছে কপ্টার। এইমাত্র স্থির হলো আকাশে। পাশের আরেক বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল ফেং। দৌড়ে গিয়ে দুহাতে ভর দিয়ে উঠে গেল দেয়ালের উপর। এর ফলে ঘ্যাচ করে কেটে গেল ডান তালুর মাংস। সব কাঁচ ভোঁতা হয়নি! লাফ দিয়ে পার হলো ফাঁকা জায়গাটা।

পাশের বাড়ির ছাতে লাগল কয়েকটা বুলেট। ছিটকে উঠল তপ্ত বিটুমেন। খানিক লাগল ফেঙের গালে। দৌড়ের ফাঁকে পিস্তল বের করেই পাল্টা গুলি করল। একটা গুলিও লাগল না কপ্টারে, তবে পাইলট বুঝে গেছে, বেশি বাহাদুরি ভাল না, বিপদ হতে পারে, সরে যেতে লাগল সে।

পরের বাড়ির দিকে বিদ্যুদ্বেগে দৌড়ে চলেছে ফেং, লাফিয়ে উঠল দেয়ালের উপর। নামতে গিয়ে থমকে গেল। পাশের বাড়ির ছাত একতলা নীচে। ওই ছাতের শেষে ফাঁকা জায়গা, শুরু হয়েছে

কনস্ট্রাকশন সাইট। দেয়াল থেকে ঝুলছে ফেং, কোনও ফায়ার এস্কেপ নেই। এমন কী এলিভেটরের কেব্‌ল্ হাউসও নেই।

আবার দেয়ালে উঠে অন্য পথ খুঁজতে হবে। কিন্তু ঠিক তখনই ওর দুই কবজির উপর নিশানা করল স্নাইপার। ইঁট ও সিমেন্টে এসে লাগল বুলেট। বাধ্য হয়ে দুই হাত ছেড়ে দিল ফেং। নীচের ছাতে পড়েই গড়িয়ে দিল দেহ। এতে পড়বার ঝাঁকি কিছুটা কমল, তবে বারো ফুটি পতন ওকে মুক্তি দিল না। ফাঁদ থেকে এখনও বেরুতে পারেনি। আবার তেড়ে আসছে পুলিশের কপ্টার!

তেরো

এয়ার শাফটের নীচে পৌঁছে কাশেম টের পেল, সাদা ধুলো মেখে ভূত হয়ে গেছে। কাঁধ ও হাঁটু টনটন করছে ব্যথায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, মার্ভেলে ফিরবার পর আর ফাঁকি দেবে না, এখন থেকে নিয়মিত ব্যায়াম করবে ফিটনেস সেণ্টারে। চোখের সামনে দেখেছে, কত সহজেই না দেয়াল বেয়ে উঠেছে ফেং। এখন রীতিমত লজ্জা লাগছে ওর। কমপক্ষে তিন মিনিট বাড়তি সময় নিয়েছে।

মেঝে ভরে আছে প্লাস্টারের টুকরো ও কবুতরের শুকনো পায়খানায়। লিও সিলভারম্যান শেষ দুই ফুট লাফিয়ে নেমে এল। মুখে ধুলোর কেক, মাঝ দিয়ে নেমেছে ঘামের স্রোত। চুলগুলো দেখে মনে হলো বয়স বেড়ে সত্তর হয়েছে।

'ঠিক আছেন তো?' হাঁপানোর ফাঁকে জানতে চাইল কাশেম।

গুঙিয়ে উঠল সিআইএ এজেন্ট, 'ভাল কোনও এস্কেপ রুট বেছে রাখা উচিত ছিল।' ধুলোর ভিতর শ্বাস নিতে চাইছে না। চাপা স্বরে বলল, 'আসুন। এই পথে।'

দালানের পিছন দিকে চলেছে ওরা। একটা জায়গায় থামল সিলভারম্যান, হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লাথি ছুঁড়ল ওরা কাঠের দেয়ালের দুই ফুট বর্গাকার এক অংশে। প্রথমে আঘাতগুলো দেয়ালে চিড় তৈরি করল। খসে পড়তে লাগল রং ও প্লাস্টার। এক ইঞ্চি পুরু সিমেন্ট চাপড়া দুই হাতে খুলতে লাগল সিলভারম্যান। এক মিনিট পেরুনোর আগেই তৈরি হয়ে গেল একটা পথ। এখন হামাগুড়ি দিয়ে বেরুতে হবে।

এক এক করে এপাশে বেরুল ওরা। কাশেম দেখল এটা একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজ। বেশিরভাগ লট খালি। গাড়ি যে কটা আছে, সেগুলো বোধহয় চালায় গৃহিনীরা। প্রতিটি গাড়ি নতুন। একটা নিয়ে রওনা হবে, ভাবল কাশেম। কিন্তু চিন্তাটা দূর করে দিল। এসব গাড়িতে অ্যালার্ম থাকবে।

'বাঁকের ওপাশে আমাদের গাড়ি,' বলল কাশেম। 'লুকিয়ে থাকুন এক্সিটের সামনে, আমি যাব আর আসব।'

দু'হাতে পোশাক ঝেড়ে নিল কাশেম, তারপর দ্রুত পায়ে রওনা হয়ে গেল র‍্যাম্পের দিকে। গ্যারাজ থেকে বেরুতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল কড়া রোদে। রাস্তার উপর ছুটোছুটি করছে মানুষ। হেলিকপ্টার থেকে গুলি আসছে। সবাই পালাতে ব্যস্ত। ফলের দোকানের বিনের উপর কে যেন পিছলে পড়েছে। রাস্তায় গড়িয়ে চলেছে কমলালেবু। উল্টে গেছে দুই বুড়ো ভদ্রলোকের চেয়ার। ব্যাকগ্যামন খেলোয়াড়দের দেখা গেল না। আসতে শুরু করেছে পুলিশের ভ্যান।

ভীত লিবিয়ানদের মত ছুটতে শুরু করল কাশেম। ভাড়া নেয়া

গাড়ির পাশে পৌঁছল এক দৌড়ে, দরজা খুলেই উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটে। চারপাশ থেকে সাইরেন আসছে। বাতাস কাঁপছে সেই আওয়াজে। চাপা পড়ল কপ্টারের শব্দ।

প্রথমবারেই চালু হলো ফিয়াটের ইঞ্জিন। স্টিয়ারিঙে হাত রেখেই এগুতে চাইল কাশেম। স্টিয়ারিং হুইল ফস্কে গেল ঘর্মাক্ত হাতে, সামনের গাড়ির পিছনে গুঁতো দিয়ে বসল। তীক্ষ্ণ আওয়াজে বাজতে শুরু করল ওই গাড়ির অ্যালার্ম, পুলিশের সাইরেনের সঙ্গে হারমোনাইয করছে যেন।

একটা ভ্যান থেকে নামছে কালো ট্যাকটিকাল গিয়ার পরা অফিসার। কিছুক্ষণের ভিতর এই ব্লক ঘিরবে। তবে মনে হলো সবার চোখ আটকে গেছে বাড়ির দরজায়। গ্যাং ফেঙের কৌশল কাজে লাগছে। পুলিশরা ভাবছে লোকটাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে, কাজেই কোনও প্রসিডিউর মানছে না।

বাঁক ঘুরেই গতি কমাল কাশেম, চলে এল দালানের গ্যারাজের সামনে। তবে থামল না। লিও সিলভারম্যান বেরিয়ে এসেই লাফিয়ে উঠল প্যাসেঞ্জার সিটে। রওনা হয়ে গেল কাশেম, স্বাভাবিক গতি তুলে পেরুল ব্লক। আরও তিন ব্লক যেতে না যেতেই পিছনে কমে এল আওয়াজ।

আটবার স্টপলাইটে থামল কাশেম, আবার এগুলো। এরপর নিজেকে নিরাপদ মনে হলো সিলভারম্যানের, ড্যাশবোর্ডের নীচ থেকে উঁচু করল মাথা। 'ওই যে গ্যাস স্টেশন। ওখানে থামুন।'

'চেপে রাখতে পারবেন না?'

'ওই জন্য না। সিট বদলে নিতে হবে। আপনি তো ভাল করে রাস্তা চেনেন না। স্থানীয়দের মত গাড়ি চালাতে হবে। এখানে কেউ ট্রাফিক আইন মানে না।'

গ্যাস স্টেশনের লটে গিয়ে থামল কাশেম। কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল সিআইএ এজেন্ট, আশা করছে ড্রাইভিং সিট খালি করবে

লোকটা, তখন নিজে সে পিছলে সিটে বসবে। তবে নড়ছে না কাশেম বক্স। বাধ্য হয়ে গাড়ি থেকে বেরুল সিলভারম্যান, এতক্ষণে পাশে সরে প্যাসেঞ্জার সিটে বসল কমাণ্ডো।

ড্রাইভিং সিটে বসে রওনা হয়ে গেল সিলভারম্যান, শুকনো হাসল। 'এই ধরনের পরিস্থিতিতে সিআই-এর ইনস্ট্রাকটার কী বলেন জানেন? ড্রাইভারকে গাড়ি থেকে নামতে হবে।'

কৌতূহল নিয়ে চাইল কাশেম। 'তাই? তার মানে কয়েক সেকেণ্ড খালি থাকবে হুইল। আমার মনে হয় ইনস্ট্রাকটারের সঙ্গে আপনার আলাপ করা উচিত।'

'বাদ দিন,' হাসল সিলভারম্যান। 'আমরা বিপদ পিছনে ফেলে এসেছি।' একের পর এক বাঁক নিয়ে একটা সড়কে পড়ল গাড়ি। জাজের বউয়ের বাড়ি এখন বহু পিছনে। 'দুঃখিত, আপনার নামটা যেন কী?'

'কাশেম। কাশেম বক্স।'

'আরব নাম। কোথাকার মানুষ আপনি?'

'ঢাকার। বাংলাদেশের।'

'আপনার পরিবার কোথা থেকে এসেছে? সৌদি আরব?'

সরু এক গলির ভিতর দিয়ে চলেছে গাড়ি। দুই পাশে প্রকাণ্ড ওয়্যারহাউস। 'না। তবে কয়েক শ' বছর আগে আরব থেকেই গিয়েছিলেন আমার পূর্বপুরুষ।'

'মুসলিম, না খ্রিস্টান?'

'তাতে কী যায় আসে?'

'আপনি যদি খ্রিস্টান হতেন, আমার খারাপ লাগত না... বোধহয়!'

ফিয়াটের ভিতর বিকট আওয়াজ হলো, পিস্তলের বুলেট বিঁধল কাশেমের পাঁজরে। জানালার কাঁচে ছিটকে লাগল টকটকে লাল রক্ত। দ্বিতীয়বারের মত ট্রিগার টিপল সিলভারম্যান, তবে একটা

গর্তে পড়েছে চাকা। কাশেমের দেহে লাগল না গুলি, পাশের কাঁচ চুরচুর করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এত থমকে গেছে কাশেম, পাল্টা হামলা দূরের কথা, নড়তেই পারল না। ওর মনে হলো, বুকের ভিতর ঢুকেছে উত্তপ্ত খুন্তি। তীব্র ব্যথা বুক-পেটে। টের পেল গরম চটচটে কী যেন নামছে পেট বেয়ে।

হাত বাড়িয়ে খপ করে পিস্তলটা ধরতে চাইল। স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দিল সিলভারম্যান, অস্ত্রটা পাঁজরে ঠেসে ধরে ট্রিগার টিপল। যেখান দিয়ে ঢুকেছে প্রথম বুলেট, ঠিক তার এক ইঞ্চি দূর দিয়ে ঢুকল তৃতীয় বুলেট। ভয়ানক ব্যথায় কাতরে উঠল কাশেম। তারই ফাঁকে বুঝল এ লড়াইয়ে মরতে হবে। কনুই দিয়ে চাপ দিল দরজার রিলিজে। দরজা খুলে যেতেই নিজেকে গড়িয়ে দিল বাইরে। ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল গতি তুলে চলেছে গাড়ি। নিতম্ব দিয়ে পড়ল কাশেম, ছিটকে পড়ল না, ছেঁচড়ে চলল পেভমেণ্ট ধরে। চামড়া ছড়ে গেল শরীরের নানান জায়গায়।

ফিয়াটের ব্রেক লাইট জ্বলে উঠল। গাড়িটা থামবার আগেই গোড়ালির হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে নিল কাশেম, লোকটার মাথা বেরুতে দেখেই গুলি করল। মিস করল, কাজেই আবারও গুলি ছুঁড়ল। এবার ভেঙে পড়ল গাড়ির পিছনের কাঁচ। কাশেমের মনে হলো হাতের ভিতর লাথি দিচ্ছে পিস্তলটা, লক্ষ্য স্থির রাখতে পারছে না। আরও তিন রাউণ্ড গুলি বিঁধল গাড়িতে, অন্যগুলো লাগল রাস্তার ওপাশে দালানের গায়ে। কাশেম যাকে সিআইয়ের এজেন্ট ভেবেছে, সে বোধহয় ধারণা করেছেঃ ওই লোককে খতম করতে গিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলবার কোনও মানেই হয় না।

'তুমি যদি গ্যাস স্টেশনে নামতে, স্রেফ গাড়িটা নিয়ে চলে যেতাম,' বলল সে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, রাবার

ঘষবার তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে রওনা হয়ে গেল ফিয়াট।

চিত হয়ে পড়ে রইল কাশেম। হাপরের মত হাঁপিয়ে চলেছে। দু'দিকের ক্ষত থেকে কুলকুল করে পড়ছে গরম রক্ত। শার্ট উঁচু করে ক্ষতস্থান দেখতে চাইল। ডানদিকের বুলেটের গর্তে জমছে বুদ্বুদের মত ফেনা। ডক্টর ফারার বক্তব্য না শুনেই বুঝে নিল, গুলি লেগেছে ফুসফুসে, দ্রুত হাসপাতালে না গেলে মরবে।

পথের দুই দিক দেখল কাশেম। দু'পাশে অনেক দূর পর্যন্ত শুধু এই গলি। এ পথে আসছে না কোনও গাড়ি। হিসাব কষে ফাঁদে ফেলেছে লোকটা। ওর মনে হচ্ছে অচেতন হয়ে পড়বে। বুকে তীব্র ব্যথা, দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়াল কাশেম, টলতে টলতে রওনা হলো। গলি থেকে বেরুতে চায়। লিও সিলভারম্যান যে-ই হোক, ওর নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যবস্থা করেই বিদায় নিয়েছে।

কয়েক পা এগুতে পারল কাশেম, টলছে। তারপর রাস্তার ধারে ভাঙা বোতল ও আবর্জনার ভিতর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

চেতনা হারানোর আগে এক পলক ভাবল, বোধহয় ওই বিপদ থেকে বেরুতে পারবে গ্যাং ফেং। বিদ্যুতের তারের মত টানটান ওই চায়নিজ এজেন্ট, ওকে কাবু করা সহজ নয়।

মস্ত বিপদে পড়েছে গ্যাং ফেং। তারই ফাঁকে ভাবল, এতক্ষণে সিলভারম্যানকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে কাশেম। প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে মাথার উপর এসে থামল পুলিশের কপ্টার। ওটার নীচে দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল ফেং। দ্রুত কপ্টার নিয়ে সরে পড়ল পাইলট, চলে গেল পিস্তলের রেঞ্জের বাইরে। তবে অনায়াসে ওখান থেকে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে স্নাইপার। ফেঙের মাথার পিছনের দেয়ালে বিঁধল এক পশলা বুলেট। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফেং, ঝেড়ে দৌড়াতে শুরু করল। ওকে তাক করছে মার্কস্ম্যান, গতিপথের একটু সামনে গুলি করতে চাইল। একটা

বুলেট ফেঙের ডান গোড়ালির পিছনে ছাতে বিঁধল।

নিজেকে ফাঁকা মঞ্চের একমাত্র অভিনেতা মনে হলো চায়নিজ এজেন্টের। এখনই কোনও কাভার না পেলে যে-কোনও সময়ে গুলিবিদ্ধ হবে। সামনে ছাত শেষ, আধ ফুট নীচে কারুকার্যময় এক কার্নিস। একটু দূরে কঙ্কালের মত কনস্ট্রাকশনের ফ্রেমওঅর্ক উঠে গেছে বহু উপরে। কোনও অলিম্পিক লং জাম্পার দৌড় শুরু করলেও ওই বাড়ি থেকে পনেরো ফুট আগেই পড়ে যাবে নীচে। কাশেম ও ফেং আগে যে ক্রেনের বুম দেখেছে, ওটা বেশ কাছে। তবে বুমের উপর লাফিয়ে পড়লে হাতে ধরবার মত কিছুই থাকবে না। ফলাফল: বুম থেকে ছিটকে গিয়ে পাথুরে জমিতে পড়বে।

নীলাকাশের বুকে পেন্সিল দিয়ে নিদাগ আঁকছে বুম, ড্রামের ভিতর পেঁচিয়ে চলেছে কেবলগুলো। উপরের কোনও ফ্লোরে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে মালামাল।

খিপ্র চিতার মত ছুটতে শুরু করল ফেং, যেন উড়াল দেবে আকাশে। অনেক উপর থেকে যিরোইন করল পুলিশ স্নাইপার, ফেঙের পায়ের পিছনের ছাতে বিঁধছে একের পর এক বুলেট। কার্নিসে পৌঁছুনোর আগেই ফেং দেখল, মালামাল তুলছে ক্রেন। গতি খানিক বদলে নিল ও, বাম পা পড়ল কার্নিসের উপর, একই সঙ্গে ডান পা বাড়িয়ে দিল সামনে—উড়ে চলেছে যেন। চারপাশ আঁধার হয়ে গেল ঘন ধূসর মেঘে, চারপাশে রইল শুধু ধুলো।

তারপর শুরু হলো ফেঙের পতন। চল্লিশ ফুট নীচে পাথুরে জমিন। পড়বার গতি বাড়ছে, আচমকা টান পড়ল পেটের পেশির উপর। ব্যথায় কুঁকড়ে যেতে চাইল দেহ। ঝাঁপ দেয়ার সময় বিশ ফুট নীচে মালামাল নিয়ে উঠছিল ক্রেন। ধুপ্ করে জিপসাম বোর্ডের উপর নেমে এল ফেং, পিছলে গেল ডান পা। আরেকটু হলেই পড়ে যেত।

কোনও কেবল ধরবার আগেই ওর পায়ের ধাক্কায় সরে গেল

জিপসাম বোর্ডগুলো। ব্যথায় টনটন করছে ডান গোড়ালি, মচকে গেছে। এদিকে বোর্ডগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে বাড়ি খেয়ে কাত হচ্ছে। পাল্টে গেল ওজনের অ্যাংগেল। কেবল ধরবার জন্য পাগল হয়ে উঠল ফেং, তবে বোর্ডগুলো একইসঙ্গে পড়তে শুরু করেছে। নীচের দিকে রওনা হলো দুই টন মাল। পড়বার সময় আলাদা হয়ে গেল বোর্ডগুলো। যেন বিশাল কোনও দৈত্য দুই হাতে বাঁটছে তাস।

বোর্ড পতনের ফলে থরথর করে কাঁপছে শরীর। মালামাল পড়ছে, ক্রেনচালক ভারসাম্য অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছে। দু' হাতে একটা কেবল ধরে ফেলল ফেং, বাম পায়েও জড়িয়ে নিল।

ওর কপাল ভাল, ক্রেনের অপারেটর চালাক লোক, ক্যাব থেকে সবই দেখেছে। এইমাত্র লাফিয়ে পড়েছে এক লোক। আর তার কারণে পড়তে শুরু করেছে ভারী শিটগুলো। অপারেটর ধীরে ধীরে ক্রেন নামাল না, তার বদলে লক করে দিল কেবল স্পুল। অসম্পূর্ণ দালানের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে বুমটাকে।

কেবলের শেষে ঝুলছে ভারী হুক, ওটা ধরে পেণ্ডুলামের মত দুলছে ফেং। দালানের পাশে পৌঁছেই শরীর দুলিয়ে নামল মেঝেতে। অমসৃণ কংক্রিটে পিছলাল না পা, টলমল করে সামলে নিল। কয়েক তলা উপরে রয়েছে শ্রমিকরা, তারা ফেঙের ওই স্টাণ্ট দেখেছে। এই বাড়িতে এখনও সিঁড়ি তৈরি হয়নি। মই বেয়ে নেমে আসতে তাদের কয়েক মিনিট লাগবে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে আরেক দিকে রওনা হয়ে গেল ফেং। দালানের এক পাশে রয়েছে আবর্জনা ফেলবার শ্যুট। ওটার পাশে গিয়ে নীচে চাইল। ধাতব শ্যুট দেখতে টিউবের মত, ডায়ামিটার হবে চব্বিশ ইঞ্চির চেয়ে বেশি। জিনিসটা শেষ হয়েছে প্রকাণ্ড এক সবুজ ডাস্টবিনের উপর। ওটা আবার আছে একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাকের পিঠে। শ্যুটের ভিতর নেমে পড়ল ফেং, দেয়ালে ঠেসে

রাখল বাম পা, পিছনে দু'হাত রেখে সাবধানে নিয়ন্ত্রিত ভাবে নামতে লাগল। এখন একটাই ভয়, কেউ যদি উপর থেকে আবর্জনা ফেলে, সব এসে পড়বে ওর মাথার উপর। ফলে পাথরের মত নীচে গিয়ে পড়বে।

দুই মিনিট পর ডাস্টবিনের ধুলো-ময়লায় নেমে এল ফেং। দেরি না করে সরে গেল ডাস্টবিনের এক পাশে, মাটিতে নেমে এসে রওনা হয়ে গেল কনস্ট্রাকশন সাইটের গেটের দিকে। সবাই ভাবছে পলাতক এখনও চারতলায়, কারও চোখ ওর দিকে এল না। তার চেয়ে বড় কথা: ছয়তলা উচ্চতায় ভাসছে কপ্টার, স্নাইপারকে নিয়ে বাড়িগুলোর ছাত দেখছে পাইলট। নিঃসঙ্গ কোনও লোক কনস্ট্রাকশন সাইটের উঠান পেরুলে তাদের কী!

একটু দূরেই একটা পাম্প ট্রাক। ওটার উপর একটা সিমেণ্ট মিক্সার, ডিজাইন করা হয়েছে আর্মার্ড হোস দিয়ে কংক্রিট উপরে পাঠানোর জন্য। এখন মিক্সারের পাম্প থেকে গলগল করে উপরে উঠছে কংক্রিট। ড্রাইভার কিছু বুঝবার আগেই ট্রাকের সামনের বাম্পারে লাফ দিয়ে উঠল ফেং, পা রাখল ড্রাইভারের ফেণ্ডারে, তারপর খপ্ করে ধরল বড়সড় উইং মিররের ডাণ্ডা। ড্রাইভার এখনও দেখেনি ওকে। খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল ফেং। চোয়ালের উপর প্রচণ্ড লাথি খেল ড্রাইভার, সিট থেকে ছিটকে গিয়ে পড়ল পাশের দরজার গায়ে।

ক্যাবের পিছনে গুড়গুড় আওয়াজ তুলছে মিক্সচার। সিমেণ্টের ওই ড্রামের কারণে থরথর করে কাঁপছে গোটা ট্রাক। এক লাথিতে অচেতন ড্রাইভারকে প্যাসেঞ্জার ফুটওয়েলে পাঠিয়ে দিল ফেং। ফার্স্টগিয়ার দিয়ে রওনা হয়ে গেল। বিস্মিত শ্রমিকদের চিৎকার শুনতে পেল না, তবে আয়নার ভিতর দেখল সিমেণ্ট মিক্সারের দিকে ছুটে আসছে তারা।

ট্রাক ঘুরিয়ে নিয়েই সুরকি ছাওয়া রাস্তায় উঠে এল ফেং,

পিছনের মিক্সচারের শ্যুট থেকে পড়ছে সিমেন্ট। এই ট্রাক যেন ডায়েরিয়া আক্রান্ত যান্ত্রিক কোনও দানব। বোধহয় কপ্টার থেকে গ্রাউণ্ড ফোর্সকে সতর্ক করা হয়েছে। পুলিশ ছুটে আসছে কনস্ট্রাকশন সাইটের দিকে। অন্তত ছয়জন তারা, প্রায় পৌঁছে গেছে চেইন-লিঙ্ক গেটের কাছে। আর ঠিক তখনই গেট উপড়ে সবাইকে চমকে দিয়ে বেরিয়ে এল ফেঙের ট্রাক। ছিটকে সরে গেল পুলিশ ক'জন।

বাঁক ঘুরেই এগুতে শুরু করেছে ট্রাক। স্টিলের শ্যুট এক দিকে ঘুরল, মনে হলো ফুল সুইঙে চালানো হয়েছে ক্রিকেট ব্যাট। ওটা সরবার সময় দুই লোককে ছিটকে ফেলেছে, ভেঙে দিয়েছে পার্ক করা এক সেডানের উইণ্ডশিল্ড। ফেঙের পিছু নিয়েছে পুলিশের একটা গাড়ি। সিমেন্ট মিক্সকার চেপে বসল ক্রুজারের হুডের উপর। মস্ত ট্রাক এবং কংক্রিটের ওজন পিষে দিল পুলিশের গাড়ির বনেট, চুরমার হয়ে গেল রেডিয়েটর। ট্রাকের পিছন চাকা পিছলে লাগল প্যাট্রল কারে, সরু রাস্তা জুড়ে থমকে গেল ওটা।

ট্রাক দ্রুত গতিতে রওনা হতেই ঘুরতে লাগল শ্যুট। সামনের একটা গাড়ির উইণ্ডশিল্ড চুরমার করে দিল। ধাতব লেজের মত এদিক ওদিক নড়ছে শ্যুট। চারপাশের গাড়িগুলো বিধ্বস্ত হচ্ছে। এসব গাড়ি না সরালে পিছু নিতে পারবে না পুলিশের ক্রুজার।

আয়নায় পিছনে চাইল ফেং, থেমে গেছে পুলিশের গাড়ি, লোকগুলো গুলি শুরু করেছে ট্রাকের দিকে। কিন্তু প্রকাণ্ড ঘুরন্ত ড্রামের কারণে একটা গুলিও লাগছে না ক্যাবে। ঝোড়ো গতি তুলছে ফেং, প্রতি সেকেণ্ডে বাড়িয়ে চলেছে দূরত্ব। গাড়িভরা পুলিশ নিয়ে কোনও চিন্তা নেই ওর, সমস্যা অন্যখানে। মাথার উপর ঘুরছে হেলিকপ্টার। এভাবে পালাতে দেবে না, ওর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছে পাইলট, জানিয়ে দিচ্ছে ওর পজিশন।

সামনের পথ চওড়া হয়েছে, পিছনে পড়ল আবাসিক এলাকা।

তবে দূরে দেখা গেল প্রায় সত্তর মাইল গতি তুলে আসছে আরও তিনটে পুলিশের গাড়ি, ঝিকমিক করছে মাথার উপরের বাতি। এদের সঙ্গে রয়েছে চাকাওয়ালা আর্মার্ড ভেহিকেল। ফেং আন্দাজ করল, ওই গাড়িতে রয়েছে হেভি মেশিনগান।

অ্যাক্সেলারেটার মেঝের সঙ্গে টিপে ধরল ফেং। ট্র্যান্সমিশনে শর্ট শিফট করে দ্রুত গতি তুলতে চাইছে। ক্রুজারগুলো থেকে এক শ' ফুট দূরে থাকতেই কড়া ব্রেক কষল ফেং, বনবন করে ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং হুইল। সামনের ফেণ্ডার লাগল একটা বড় ডেলিভারি ট্রাকের পিছনে, সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য হারাল সিমেণ্ট মিক্সার। বাইরের দিকের হুইলে ভর করে বিদ্যুদ্বেগে একপাশে সরতে লাগল ড্রাম, পরক্ষণে ট্রাক নিয়ে কাত হয়ে পড়ল।

প্যাসেঞ্জার সিটে ছিটকে পড়তে পারে, কাজেই দু' হাতে হুইল ধরেছে ফেং, দু'বাহু দিয়ে আড়াল করেছে মুখ। উইণ্ডশিল্ডের অজস্র কাঁচের টুকরো ছিটকে এল ভিতরে। ট্রাকের অজ্ঞান ড্রাইভার তার গর্তের ভিতর ভাল ভাবেই আটকা পড়েছে, তার উপর বর্ষণ হলো না কাঁচের।

সড়কের উপর ট্রাক আছড়ে পড়তেই প্রচণ্ড ঝাঁকিতে খুলে গেল সিমেণ্ট ড্রামের পিন, ভেঙে গেল চেইন ড্রাইভের লিঙ্ক—বাকি কাজটুকু করল তীব্র গতি।

লেংচে লেংচে ছুটতে শুরু করল এগারো টনের স্টিল ও কংক্রিটের ড্রাম, ওটার প্রকাণ্ড মুখ থেকে ছলকে পড়ছে সিমেণ্ট। পুলিশের দুই গাড়ির ড্রাইভার যথেষ্ট বুদ্ধিমান, ছিটকে সরে যেতে চাইল তারা, সামনের বাঁকে উঠে পড়ল ফুটপাথের উপর। একটা গাড়ি গুঁতো দিল বিদ্যুতের থামে, অন্যটার সামনের অংশ গেঁথে গেল এক দেয়ালে। অন্য ক্রুজার ও আর্মার্ড-কার আরও কাছে ছিল, ওগুলো কোনও সুযোগই পেল না। প্রকাণ্ড ড্রাম চড়ে বসল আর্মার্ড কারের ঢালু নাকে, চুরমার করে উড়িয়ে দিল খুদে টারেট।

গানার দু' টুকরো হতো, তবে শেষ মুহূর্তে ঢুকে পড়েছে গাড়ির ভিতর।

আর্মার্ড কার পেরিয়ে ধুপ করে পড়ল ড্রাম, অ্যাসফল্ট ফাটিয়ে দিয়ে লাগল গিয়ে পুলিশের ক্রুজারে। মুড়মুড় করে চেপ্টে দিল গাড়ির নাক থেকে পিছনের সিট পর্যন্ত। একটা দালানের গায়ে গিয়ে ঠেকল ব্যারেল, ওখানেই ধড়াম করে বাড়ি দিয়ে থেমে গেল। ওটার মুখ থেকে টুথ পেস্টের মত থকথকে সিমেন্ট পড়ছে।

ট্রাকের ক্যাবের পিছন-দেয়ালে পেগ থেকে ঝুলছে একটা স্পেয়ার ওঅর্ক শার্ট, ওটা খুলে নিল ফেং, ভেঙে পড়া উইণ্ডশিল্ডের ফাঁক দিয়ে বেরুল। আছে ট্রাকের আড়ালে, কপ্টারের আরোহীরা ওকে দেখতে পাবে না। দ্রুত হাতে মুখ থেকে কসমেটিক মুছে ফেলল ফেং, পরে নিল ডেনিম শার্ট। গোড়ালির ব্যথা তীব্র হয়ে উঠেছে, তবে ওটা পাত্তা না দিয়ে নেমে পড়ল ট্রাকের সামনে, সামান্যতম না খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। মাত্র কয়েক গজ গিয়ে উঠে পড়ল ফুটপাথে। দোকান ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে বহু লোক, চেয়ে রয়েছে দুর্ঘটনার জায়গার দিকে। ঠিক তাদেরই মত ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে গেল ফেং।

কিছুক্ষণ পর এল পুলিশের গাড়ি। যারা দুর্ঘটনা চাক্ষুষ করেছে, তাদের জেরা শুরু হলো। ফেংকে কোনও পাত্তাই দেয়া হলো না, পুলিশ খুঁজছে এক লিবিয়ান লোককে, আরবি জানে না এমন কোনও এশিয়ানকে দিয়ে তাদের চলবে না। খানিক অপেক্ষা করে হাঁটতে শুরু করল ফেং, হারিয়ে গেল ভিড়ে। অনেক দূরে সরে ফোন দিল। পাঁচ মিনিট পর এল ভাড়াটে চায়নিজ দলের সদস্যরা। তাদের ভ্যানে চড়ে রওনা হয়ে গেল ফেং।

ফেঙের ভাড়া নেয়া ফিয়াট পাঁচ মাইল সরে যাওয়ার পর বেজে

উঠল হারিস জামানের ফোন।

'হ্যাঁ, আমি,' ভুরু কুঁচকে বলল সে। 'আজ একটা রেইড হয়েছে। আরেকটু হলে ধরা পড়তাম পুলিশের হাতে। খবর নিয়ে জানাও কেন আমাকে সতর্ক করা হয়নি। এমন হওয়া উচিত ছিল না। সরে আসার সময় খানিক সাহায্য করেছে ওই অভিশপ্ত জাহাজের লোক। ওদের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করছি, এমন সময় এল পুলিশ।'

চুপচাপ শুনতে লাগল হারিস, তারপর জবাব দিল, 'এখন কেউ এসব বললে ছিঁড়ে নেব জিভ! এই তুমিই তো ঠিক করেছ উপকূল সড়কে অ্যাম্বুশ হবে, নিজের পছন্দের লোকও রেখেছ। আমাদের যে লোক পুলিশের ভিতর থেকে রিপোর্ট দিয়েছে, ওই রিপোর্ট তুমি-আমি দু'জনই পড়েছি। সড়কে সাধারণ গাড়িকে থামাতে নিষেধ করা হয়েছিল। বদলে কী হলো? তোমার ওয়েল ট্রেইণ্ড পুলিশ পাগল হয়ে উঠল ঘুষের জন্য। জানি না ওই জাহাজের লোকগুলো কী করে ওদেরকে শেষ করল, কিন্তু তা-ই হয়েছে। তারপর আরও সামনে গিয়ে আমাদের হিন্দ উড়িয়ে দিয়েছে, মুক্ত করে দিয়েছে বেশিরভাগ বন্দিকে, প্রায় বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে আমাদের পরিকল্পনার... অ্যাঁ, কী? হ্যাঁ, তাই বলেছি, মুক্ত করে দিয়েছে। নিশ্চয়ই ওদের কার্গো জাহাজ ভেড়ে কোলিং স্টেশনে। আমাদের লোক খালি একটা বক্সকার দেখল, ডুবছে তখন... আমি কী করে বলব? ওই জাহাজ বোধহয় স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত চলতে পারে। নইলে বলতে হবে তুমি ট্রাক থামাতে যাদেরকে পাঠিয়েছ, তাদের চেয়েও বেশি গাধা ওই কপ্টারের লোকগুলো। ...আপাতত শহর থেকে হারিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে। সত্যি বলতে, চলে যাচ্ছি দেশ ছেড়ে। আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এক পাইলটকে চিনি। তাকে অনুরোধ করব আমাকে সরিয়ে নিতে। যারা ইউনুস আল-কবিরের সমাধি খুঁজছে,

তাদের ওখানে যাচ্ছি। পৌঁছেই নেতৃত্ব বুঝে নেব। এটা বলতে পারি, ক্ষতি যা-ই হয়ে থাক, তুমি ভাল ভাবেই এদিক সামলে নেবে। এতক্ষণে বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার কথা জল্লাদখানায়। কর্নেল হোসেন ফোন করেছিল, জানিয়েছে আমাদের আত্মত্যাগী দল রওনা হয়েছে।' চুপ হয়ে গেল হারিস, ওদিক থেকে কোনও কথা নেই। 'সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর ফোন দেব না,' বলল হারিস। 'বিদায়ের সময় শুধু বলব, মহান আল্লাহ্ আমাদের উপর করুণা করুন।'

কানেকশন কেটে দিল হারিস জামান, পাশের সিটে রেখে দিল এনক্রিপ্টেড ফোন। নিজ আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে। নইলে এত দিন টিকত না। আজকের এই হামলা তাকে রাগিয়ে দিয়েছে। খানিক আগে মিথ্যা বলেনি, লিবিয়ান সরকারের ভিতর রয়েছে তাদের গুপ্তচর ও সহানুভূতিশীল বহু মানুষ। আগেই তাকে সতর্ক করা হয়েছে, বাড়ি ও অফিসে যে-কোনও সময়ে রেইড হবে। কিন্তু এই পুলিশি রেইডে আগেই সতর্কবাণী আসবার কথা ছিল, আসেনি।

তিক্ত হাসল হারিস জামান। ভাবল, সুপ্রিম লিডার মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তার ক্ষমতা আসলে বেশি নয়।

চোদ্দ

পাক্কা পনেরো মিনিট পাঁজরের নীচে খোঁচা দিয়ে চলেছে ছোরার মত পাথরটা, এবার সাবধানে ওটা সরিয়ে ফেলল সোহেল। ওর

পাশেই নিথর শুয়ে ক্যাপ্টেন নিশাত। আরেক পাশে রায়হান, স্বর্ণা ও স্মৃতি মাহমুদ।

এ দেশে এসে একের পর এক ঝুঁকি নিয়েছে স্মৃতি। এখনও যে-কোনও সময়ে বন্দি হতে পারে জঙ্গিদের হাতে। তারপরও নিজে থেকেই এই মিশনে আসতে চেয়েছে। ডক্টর ফারা ওর নানা ধরনের পরীক্ষা করার পর সনদ দিয়েছে, ও সম্পূর্ণ সুস্থ।

একটা টিলার উপর শুয়ে আছে ওরা। সামনেই শুকনো সেই নদী, এখান থেকে দেখে মনে হয় চওড়া একটা উপত্যকা। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এখানে নিজ দল নিয়ে ইউনুস আল-কবিরের হারিয়ে যাওয়া সমাধি খুঁজেছে স্মৃতি। তখন কোনও বিপদ ছিল না। কিন্তু এখন টিলার নীচে জড় হয়েছে ট্রেইনিং ক্যাম্প থেকে আসা এক ডজন জঙ্গি। লোকগুলো হয়তো দক্ষ খুনি ও মানুষের হাত-পা-রগ কাটতে অভ্যস্ত, তবে জানে না আর্কিওলজি কী জিনিস। এদের দলের নেতা বুঝতে পারছে না তারা এখানে কী করছে। পুরো নদী-খাতের এ অংশে পৌঁছেই সবাইকে ছড়িয়ে পড়তে বলে সে। এরপর খাড়া পাড়েও উঠেছে, যদি সমাধির কোনও চিহ্ন মেলে! তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। তারা একটা একটা করে পাথর সরিয়ে দেখতে শুরু করে। পরে বুঝেছে, এভাবে খুঁজে কোনও লাভ হবে না। যে গতিতে কাজ চলছে, চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর তারা পৌঁছুবে স্মৃতির সেই জলপ্রপাতে।

লোকগুলোর সঙ্গে রয়েছে আর্কিওলজিস্ট ব্রাম ট্যাগার্ট। বিনকিউলার ব্যবহার করতে পারছে না মার্ভেল টিম, তাই বোঝা যাচ্ছে না লোকটার অবস্থা কেমন। তবে মনে হলো সুস্থই আছে। আর সবার সঙ্গে খুঁজে চলেছে জলদস্যু নেতার ফেলে যাওয়া চিহ্ন। ধীরে ধীরে হাঁটছে, মনে হলো না মারধর পড়েছে, বা আহত হয়েছে। তিউনিশিয়ার অ্যাণ্টিকিউটি মিনিস্ট্রির রিপ্রেজেণ্টেটিভ বা তার ছেলেকে দেখা গেল না। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লোকটাকে

যথেষ্ট পয়সা দেয়া হয়েছে, এতক্ষণে ফিরে গেছে সে তিউনিসে।

কোথাও দেখা যায়নি পুরনো এমআই-৮ কপ্টার। সোহেলরা ধারণা করে নিয়েছে, নদীর আরও ভাটিতে নেমেছে ওটা। বোধহয় প্রয়োজনে জঙ্গিদের সামনে বা পিছনে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই এরা নির্দিষ্ট একটা অংশ পর্যন্ত যাবে, তারপর অন্য কোথাও খুঁজতে শুরু করবে।

রায়হানের কোমরে টোকা দিল সোহেল, সিগনাল দিয়ে জানিয়ে দিল, ওরা টিলার কিনারা থেকে পিছিয়ে যাবে। প্রায় নিঃশব্দে ক্রল করে রওনা হয়ে গেল সোহেল। ওর পর পরই স্বর্ণা, স্মৃতি ও রায়হান। নিজ জায়গা থেকে নড়ল না ক্যাপ্টেন নিশাত। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে বুঝে নিল নীচ থেকে কেউ খেয়াল করেনি। এবার নিজেও পিছিয়ে এল।

পরের বিশ মিনিট দক্ষিণে এগুলো ওরা, তারপর আবারও থামল।

ফিসফিস করে বলল রায়হান, 'আপনার কী মনে হয়, সোহেল ভাই?'

'কী বুঝতে বলো, হে?'

সোহেল আর কিছু বলছে না দেখে বলল স্বর্ণা, 'কাজ তো সহজ। পচে যাওয়া পিশাচগুলোকে খতম করে দিতে হবে; খুঁজে বের করতে হবে সমাধি—আবার কী? এটুকু না পারলে চলবে কেন? ...বাপরে, মেলা কাজ!'

মৃদু হেসে ফেলল স্মৃতি।

'আসল কথায় আসা যাক,' বলল গম্ভীর নিশাত। 'আমরা এখন জানি বদমায়েশগুলো কোথায়। হাতে সময় নেই। কয়েক ঘণ্টার ভিতর জলপ্রপাতে পৌঁছে যাবে তারা। এবার রায়হান আর সোহেল ভাই, আপনারা ঠিক করুন কীভাবে পাব সমাধি।'

'আগে জলপ্রপাতগুলো দেখতে হবে,' মতামত দিল রায়হান।

এই প্রথমবারের মত ওদের পরিকল্পনা শুনল স্মৃতি, কাজেই বলল, 'দাঁড়ান, একসেকেণ্ড। সব জলপ্রপাত আমি নিজ চোখে দেখেছি। কোনও পালতোলা জাহাজের সাধ্যি ছিল না ওগুলো পেরুবে। এসব প্রপাতের দেয়াল অনেক খাড়া।'

'হলোই বা,' উদাস হয়ে বলল সোহেল। 'আরেকবার ঝালিয়ে নেয়া যাক প্ল্যান।' এক পলক সবাইকে দেখে নিল। 'আমরা খুঁজে বের করতে চাইছি সমাধি। আপা, আপনি পিছনে রয়ে যাবেন। চোখ রাখবেন জঙ্গিদের উপর। ওরা আমাদের জলপ্রপাত থেকে একঘণ্টা দূরত্বে থাকতেই রেডিও করবেন। তখন সরে যাব আমরা। কারও কোনও প্রশ্ন?'

চুপ রইল সবাই। কোনও জিজ্ঞাসা নেই।

অনেক দূরে নদী-খাতে নেমেছে আলম সিরাজের কপ্টার, ওদের পৌঁছে দিয়েই চলে গেছেন ভদ্রলোক। তারপর থেকে হেঁটে চলেছে ওরা। মাঝে জঙ্গিদের দেখে সামান্য বিরতি পড়েছে। তারপর আবারও হাঁটতে শুরু করেছে। এখন দ্রুত চলছে পা, বেশি সময় লাগল না সোহেল, স্বর্ণা, স্মৃতি ও রায়হান পৌঁছে গেল জলপ্রপাতে। এখানে প্রথমবারের মত ভাঙা পড়েছে নদী-খাত। ব্লাফের উপর থেকে নীচের দিকে চাইল ওরা। সোহেল জানিয়ে দিল স্মৃতি যেন স্বর্ণা ও রায়হানের কাছ থেকে দূরে না সরে। নিজে সে যাবে এলাকা স্কাউটিং করতে। স্মৃতিকে নিয়ে একটা টিলার উপর উঠল স্বর্ণা ও রায়হান, বিনকিউলার দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল চারপাশ।

আগে নিজের দলকে নিয়ে এত উপরে ওঠেনি স্মৃতি, নীচের দৃশ্যটা দারুণ সুন্দর লাগল ওর কাছে। নদী-খাতে অদ্ভুত এক প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল। উজানের দিকে প্রথম ক্যাটার‍্যাক্টের সামনে রয়েছে প্রাকৃতিক এক গামলা, নদীর পুরো প্রস্থ পর্যন্ত বিস্তৃত। লিভিং রকে ভরা বেসিন, কোটি বছর ধরে

একইরকম। জায়গাটা দৈর্ঘ্যে বড়জোর এক শ' ফুট, উজানের দিকে টিলার বুক দেয়ালের মত। এই খুদে প্রপাত মাত্র চার ফুট উঁচু। বেশিরভাগ ঝর্নার খাতে যে জোরালো স্রোত দুই পাড় থেকে সরিয়ে নেয় পাথর, এখানে তা হয়নি, বেসিনের মেঝে ভরে আছে পানির স্রোতে মসৃণ হওয়া পাথরে।

উপর থেকে স্মৃতি দেখল, ওখানে রয়েছে প্রাচীন এক প্রাচীর। কেন পানির ভিতর গড়ে তোলা হয়, কে জানে! এই প্রপাতের এক শ' ফুট সামনে ঘিরে দিয়েছে নদী-খাতকে।

মেঝের পাথরগুলো দেখেই বিনকিউলার চেয়ে নিয়েছে স্মৃতি। কয়েক মিনিট প্রাচীরের দিকে চেয়ে রইল। ওকে দেখে মনে হলো ভাবছে, ওই দেয়াল যে-কোনও সময়ে নড়ে উঠবে, আর বেরিয়ে আসবে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ। আসলে কিছুই ঘটবে না, তবে দেয়ালটা যেন নীরবে বলছে, পাহাড়ের ভিতর রয়েছে কোনও পোতাশ্রয়।

'ওগুলো ব্যাসল্ট,' বিনকিউলার ফিরিয়ে দিল স্মৃতি। 'ওই দেয়ালের মতই।'

একটু আগে ফিরেছে সোহেল। জানতে চাইল, 'তো?'

'এই দেশে প্রথম স্যাণ্ডস্টোনের বদলে অন্য পাথর দেখলাম। এর মানে এখানে কোনও ভলক্যানিক অ্যাক্টিভিটি ছিল।'

'ফলে?' জানতে চাইল রায়হান।

'তার মানেই, এখানে যে-কোনও জায়গায় গুহা থাকতে পারে।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' বলল স্বর্ণা।

হতাশা প্রকাশ পেল স্মৃতির কণ্ঠে, 'কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। ইউনুস আল-কবির এসব প্রপাত পেরিয়ে জাহাজ নিয়ে যেতে পারত না।'

'আপনি এ অঞ্চলকে জিওলজিস্টদের মত দেখছেন, কোনও

ইঞ্জিনিয়ারের মত নয়,' বলল সোহেল। রায়হানের দিকে চাইল। 'তোমার কী মনে হয়?'

'নদীর বুকেও দেয়াল আছে, ঠিক তীরের মত,' নদীর পাড়ে উঁচু কার্নিস দেখিয়ে দিল রায়হান।

'ঠিক,' বলল সোহেল। 'ওদিকটা অন্য দিকের চেয়ে কমপক্ষে বিশ ফুট উঁচু।'

মনে হলো ওরা কী যেন গোপন করছে।

'আপনারা কী নিয়ে আলাপ করছেন?' জানতে চাইল স্মৃতি। মার্ভেল জাহাজের সবাইকে ওর মার্সেনারি মনে হয়েছে। একবারও ভাবেনি এরা অন্য কিছুও জানতে পারে। এখন নিজেদের ভিতর আলাপ করছে, কিন্তু কিছুই বুঝছে না স্মৃতি। কাজেই বিরক্তি বোধ করছে।

'ডেরিক্স্,' সংক্ষেপে বলল সোহেল।

'আসুন, আপনাকে দেখিয়ে দিই,' যোগ করল রায়হান।

কার্নিসে নেমে এল ওরা। বর্ষার সময় নদী যখন ভরে উঠত, তখনও এই পাড় থাকত পানি-সমতল থেকে কয়েক ফুট উপরে। নদীর বুকেও দেয়াল দিয়ে ঘিরেছে, তবে তা কম উচ্চতার।

সোহেল ও রায়হান সেদিকে না চেয়ে কার্নিস থেকে নীচের জমিনের দিকে চেয়ে রয়েছে। তারপর কী যেন দেখতে পেল ওরা। নেমে গেল রায়হান, হাঁটু গেড়ে স্যাণ্ডস্টোনের উপর হাত রাখল, ধুলো-বালি সরাতে লাগল।

'তা হলে পাওয়া গেল,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল। আঁজলা ভরে বালি তুলতে শুরু করেছে। বালির বুক থেকে বেরিয়ে এসেছে বিশ ইঞ্চি চওড়া একটা গর্ত। 'অনেক আগে এখানে ড্রিল করা হয়েছিল।' পুরো হাত ভরে দিল রায়হান।

'কী করছেন?' জানতে চাইল স্মৃতি। আর সবার সঙ্গে নেমে এসেছে নদী-খাতে।

'ডেরিকের জন্য এখানে বসানো হয়েছিল খুঁটি,' বলল সোহেল। 'আন্দাজ করছি ওগুলো ছিল শুকনো গাছের গুঁড়ি। এসবের সঙ্গে আড়ার মত থাকত বুম, দৈর্ঘ্যে ছিল নদীর অর্ধেক পর্যন্ত। খুঁটির গর্ত দেখে মনে হয়, বুমটা ছিল প্রকাণ্ড। ওটা বহু টন ওজন তুলতে পারত। অন্য তীরেও এই বুমের মত আরও ছিল।'

'বুঝলাম না, ওগুলো দিয়ে কী হতো?'

'এসব বুম দিয়ে নদীতে নামানো হতো পাথর,' বলল রায়হান।

'একটু ভুল হলো,' শুধরে দিল সোহেল। 'ওরা ব্যবহার করত বুনট করা বাস্কেট, বা পাল দিয়ে তৈরি ব্যাগ। এসবের ভিতর থাকত বালি। কাজ শেষে বালি পড়ে থাকলেই বা কী? স্রোত সরিয়ে নেবে সব। ক্ষতি নেই কোনও।'

'ঠিকই বলেছেন, সোহেল ভাই,' কথাটা মনে ধরেছে রায়হানের। 'মস্ত সব ব্যাগে বালি ভরে দেয়ালের আগে নামিয়ে দিত। প্রপাতের সামনে পানি জড় করত। একই কাজ করেছে পরেও। কখনোই পুরো নদী-খাত আটকে দিতে চাইত না। নইলে তাদের দেয়াল উপড়ে নিয়ে ছুটত প্রবল স্রোত।'

মাথা দোলাল সোহেল। 'ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ থাকত একটা শিপিং লকে। ওই চেম্বারে পরিমিত পানি জমত, এদিকে উঁচু করত বালির প্রাচীর। আরও পানি ভরে যেতেই জাহাজ নিয়ে যেত পরের লকে। নিশ্চয়ই ইউনুস আল-কবিরের ইঞ্জিনিয়াররা প্রাকৃতিক লক দেখেছিল, সেখান থেকেই পেয়েছে বুদ্ধিটা।'

'পরেও তাই করেছে,' বলল রায়হান। 'উজানের দিকে নিয়ে গেছে জাহাজটাকে।'

'আপনারা এই এলাকা না দেখেই আন্দাজ করেছেন?' শ্রদ্ধার সুরে বলল স্মৃতি। 'এ আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।'

'এই লক একমাত্র জিনিস যেটার সঙ্গে মিলবে জেফ মার্টেলের বলা "অদ্ভুত এক যন্ত্র,"' বলল সোহেল। 'তা ছাড়া...' একটু দ্বিধা করে ভাবল প্রশংসা না পেলেও চলে, 'রায়হান আর আমি আসার আগে স্যাটালাইট ইমেজারি দেখে নিশ্চিত হয়েছি, আমাদের হাইপথেসিস ভুল হবে না।'

'যাই হোক, কম ব্যাপার নয়,' বলল স্মৃতি। 'এত পড়াশোনা করেও এখন নিজেকে বুদ্ধু মনে হচ্ছে। এসব পাথুরে দেয়াল ও পাড়ের দিকে আমিও ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থেকেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিনি।'

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল রায়হান, 'একটা শুকনো মৌসুমে থেমে যায় নদী, আর সে সুযোগে ইউনুস আল-কবিরের লোক প্রপাতের আগে লক সিস্টেম তৈরি করে। এর ফলে এমন একটা জায়গায় যেতে পারল তাদের জাহাজ, যেখানে কেউ খুঁজবেই না।'

'তা হলে আরও উজানে রয়েছে ওই গুহা?'

'তাই।'

'চলো সবাই, রওনা হয়ে যাই,' বলল সোহেল।

এখন পর্যন্ত কী জানা গেছে, তা নিশাতকে রেডিও করে জানিয়ে দিল। বলে দিল, দূরত্ব ও টপোগ্রাফির কারণে রেডিও কণ্ট্যাক্ট হারিয়ে যেতে পারে। জবাবে কোনও কথা বলল না নিশাত। বোধহয় খুব কাছেই জঙ্গিরা। বদলে ইয়ারপিসে দ্রুত দুটো টোকার আওয়াজ এল।

তীরের দিকে চার ভাগের তিন ভাগ উঠে দক্ষিণে রওনা হয়ে গেল ওরা। দূরের দিগন্ত থেকে ওদেরকে দেখবে না কেউ। তা ছাড়া, বালি-ভরা দমকা হাওয়া আসছে মরুভূমি থেকে, সেটা থেকেও রক্ষা পাবে। এ এলাকা এমনই, নিজেকে বড় ক্ষুদ্র মনে হয়। ঝিকমিকে সোনার মত আকাশ যেন ওদের সঙ্গে চলেছে। প্রত্যেকে ক্যান্টিনে এক দিনের পানি নিয়েছে। এই চারজনের

ভিতর দু'জনই গত কয়েক দিনের ধকলে পরিশ্রান্ত।

কাজেই ওদেরকে তাড়া দিল না সোহেল। নিজের গরজে হেঁটে চলেছে স্মৃতি। যদি চুপচাপ থাকে বা কোথাও বসে, ওকে তাড়া করে আসাদ চৌধুরির প্রাণহীন চোখদুটো। পেট্রোলিয়াম জিওলজিস্ট পড়ে আছে মরুভূমির উপর, কপালের ফুটো থেকে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। স্মৃতি একজন আর্কিওলজিস্ট, ওর স্থান হওয়ার কথা এসব থেকে বহু দূরে, কিন্তু এখানে যদি না আসত, নিজেকে ক্ষমা করতে পারত না। সারাজীবন আইন মেনে চলেছে, সেই ওর মন এখন বলছে, যারা আসাদকে মেরে ফেলেছে, কিডন্যাপ করেছে ওদেরকে, তাদেরকে শাস্তি পেতেই হবে। এই প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার আছে ওর।

জলপ্রপাত থেকে দুই মাইল উজানে এসে হঠাৎ বদলে গেছে নদী-খাত। স্যাণ্ডস্টোনের পাড় সরে গিয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে হালকা রঙা পাথরকে। লক্ষ বছর আগে ওখানে ছিল লবণাক্ত রিফ, অনেক পরে ওগুলো হয়ে গেছে লাইমস্টোন।

'এখানেই থাকা সম্ভব,' চারপাশের জিওলজি দেখল স্মৃতি। 'লাইমস্টোনেই পাওয়া যায় গুহা, ফাটল ও খোঁড়ল। এখানেই।'

সোহেলের বাহুর উপর হাত রাখল রায়হান। একটা ড্রাইওয়াশের দিকে দেখিয়ে দিল। 'আপনার কী মনে হয়, সোহেল ভাই?'

ওখানে নদীর পাড়ে ভূমিধস্ হয়েছে, নদী-খাতের ভিতর পড়েছে কয়েক শ' টন পাথর ও বালি। খসে পড়া অংশ দৈর্ঘ্যে দেড় শ' ফুট, এরপরে পাড় হয়ে গেছে অনেক উঁচু। আগে কখনও নদীর পাড় এত উপরে ওঠেনি।

মাথা দোলাল সোহেল। 'গুহার মুখ বুজিয়ে দিয়েছে বিস্ফোরক দিয়ে। পাথর-বালি সরালেই পাওয়া যাবে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ, সমাধি ও সম্ভবত সোনাদানা-মনিমাণিক্যের সিন্দুক।'

সমাধিস্থল নির্ধারিত হতেই সবার উত্তেজনা কমে এসেছে।

চিন্তিত হয়ে বলল স্মৃতি, 'এখানে যে পরিমাণ জঞ্জাল জমেছে, হেভি কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট না পেলে কিছুই করা যাবে না। তাতেও সমাধি পর্যন্ত যেতে লাগবে কয়েক সপ্তাহ।'

'ভাববেন না,' বলল সোহেল। 'আমরা ঢুকে পড়ব পিছন-দরজা দিয়ে।'

দশ মিনিট লাগল নদী-খাতে নেমে উল্টো পাড়ে উঠতে, এসে থামল ওরা ভূমি-ধসের উপর। এ অংশ একটা টিলার পিছন দিক, ও-পাশে পশ্চিমে রয়েছে সাহারা। মরুভূমিতে রয়েছে একের পর এক গভীর খাদ ও ফাটল। বহুকাল আগে নদীর পাড়ে বিশাল এক সবুজ বনাঞ্চল ছিল। পরে সবই বিলুপ্ত হয়েছে সময়ের করাল গ্রাসে, খাঁ-খাঁ করছে বালি ও পাথরের প্রান্তর। ওরা চারজন দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। টিলার বুকে খুঁজতে শুরু করবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া গেল প্রথম গুহা-মুখ।

কোমর থেকে হ্যালোজেন ফ্ল্যাশলাইট খুলে নিল সোহেল, ঢুকে পড়ল বড়সড় গুহার ভিতর। কিন্তু দশ ফুট যেতে না যেতেই নব্বুই ডিগ্রি বাঁক নিল গুহা, তারপর দুই ফুট যেতেই সামনে পড়ল নিরেট পাথরের দেয়াল। আর যাওয়া গেল না।

স্বর্ণা ও স্মৃতি দ্বিতীয় আরেকটা গুহা পেল, কিন্তু খানিক যাওয়ার পর ওটাও বুজে গেল।

তৃতীয় গুহা অন্য দুটো থেকে অনেক সংকীর্ণ, বাধ্য হয়ে চার হাত-পায়ে ক্রল করে এগুতে লাগল সোহেল ও রায়হান। এই গুহা টিলার অনেক গভীরে গেছে। দেয়ালগুলো নানা ধরনের পাথরের তৈরি। আরও খানিক যাওয়ার পর মাথার উপর উঁচু হলো ছাত। হেঁটে এগুতে লাগল সোহেল ও রায়হান। কিন্তু তা কয়েক গজের জন্য, তারপর আবারও নেমে এল ছাত। বাধ্য হয়ে ক্রল করে এগুলো ওরা। পেটের নীচে কিরকির করছে বালি। রায়হান

আসবার সময় চকের টুকরো এনেছে, এবার ওটা কাজে লাগল। সামনে দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সুড়ঙ্গ। তিক্ত মনে ভাবল সোহেল, এই পথে বোধহয় চলত শেয়াল।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে ওরা সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকেছে।

'তোমার কী মনে হয়, রায়হান?' জানতে চাইল সোহেল। একদিকের দেয়াল দেখিয়ে দিল। পাথরে জ্যামিতিক নকশা। দক্ষ কেউ করেনি। ছুরি দিয়ে চেঁছে তৈরি।

এ ভাষা ওরা জানে না। তবে মনে হলো, ওটা কোনও আরবি স্ক্রিপ্ট হতে পারে।

'বোধহয় এই সুড়ঙ্গ ইউনুস আল-কবিরের গুহা পর্যন্ত গেছে,' মন্তব্য করল সোহেল।

'চারদিকে যেসব সুড়ঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে, সেগুলো খুঁজতে হলে আরও লোক লাগবে,' বলল রায়হান।

'লোক পাবে কোথায়?' বলল সোহেল। 'আছে তো স্বর্ণা আর স্মৃতি মাহমুদ। ওরা মহিলা।'

'তাই দিয়েই কাজ চালাতে দোষ কী?'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহেল রেডিও করতে। কিন্তু পাহাড়ের এত গভীরে কোনও কাজ করছে না রেডিও। জবাব এল না কোনও। 'রওনা হয়ে যাও, বাছা,' বলল সোহেল। 'নিয়ে এসো ওদেরকে।'

'যদি এই বদ্ধ গুহার ভিতর ঢুকতে চায় আর কী!' ঘুরে রওনা হয়ে গেল রায়হান। ঢালু জমি বেয়ে উঠছে। কঠিন হয়ে উঠল ক্রল করা। বিড়বিড় করে নিজের কপালকে গালি দিয়ে চলেছে।

ব্যাটারির শক্তি সঞ্চয় করতে টর্চ নিভিয়ে দিল সোহেল। ঘুটঘুটে আঁধারে নানান চিন্তা আসছে। একবার মনে হলো শ্বাস আটকে আসছে। ফুরিয়ে এসেছে অক্সিজেন। এসব পাত্তাও দিল না সোহেল। কমাণ্ডো ট্রেইনিঙের কথা মনে পড়ল, ওদেরকে এক ঘণ্টা থাকতে হতো সাগর-তলে, কোনও গুহার ভিতর। একবার

ওকে ধাওয়া করে মোটা এক মোরে ঈল। ছুরির পোচে ওটাকে শেষ করেছিল ও।

দীর্ঘ তিরিশ মিনিট পেরুল, তারপর শুনতে পেল কারা যেন ক্রল করে আসছে। টর্চ জ্বালল সোহেল। সবার আগে এল স্বর্ণা। ওর পর স্মৃতি ও রায়হান।

সবাইকে দুই মিনিট বিশ্রাম নিতে দিল সোহেল, তারপর নিজ পরিকল্পনা জানাল। ওরা ছড়িয়ে পড়বে পাতাল সুড়ঙ্গে। দেখতে শুরু করবে প্রতিটি সুড়ঙ্গ বা গুহা। কোনও দল সুড়ঙ্গের দুই মাথা পেলে একজন যাবে বামদিকের সুড়ঙ্গে, অন্যজন ডানদিকে। দশ মিনিটের ভিতর আবার ফিরবে আগের জায়গায়। দুই সুড়ঙ্গের ভিতর যেটা দেখে মনে হবে এই পথে গেলে ভাল, সে পথেই যাবে ওরা।

এরপর এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল চারপাশ দেখতে। বাড়তি অ্যামিউনিশন ও অস্ত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠল ওদের জন্য। পাথরে ক্রল করতে গিয়ে ছিলে গেছে সবার হাঁটু ও কনুই। সঙ্গে যথেষ্ট ইকুইপমেণ্ট নেই, কাজেই কম-বেশি সবাই গুঁতো খেল মাথায়। কপাল কেটে গেল সোহেলের, ওখানে আটকে নিল গজ টেপ।

দীর্ঘ করিডোরের মত সুড়ঙ্গ ধরে চলেছে ওরা চারজন। একটু পর পর সামনে পড়ছে পাথরের স্তূপ। তেমন একটার সামনে থামল সোহেল, আলো ফেলল উপরে। ছাত অন্তত দশ ফুট উঁচু। প্রথমে মনে হলো সিলিং থেকে ঝুলছে হাজারো স্ট্যালাকটাইট। খনির পানিতে ধীরে ধীরে তৈরি হয় এসব। জমতে থাকে সুড়ঙ্গের ছাতে, নেমে আসে মেঝে পর্যন্ত। কিন্তু একটু খেয়াল করতেই সোহেল বুঝল, একটার কোমরে প্যাণ্ট!

'হায় আল্লাহ্,' বিড়বিড় করে বলল স্বর্ণা।

উপরে চেয়ে চমকে গেছে স্মৃতিও। চিৎকার করবার আগেই

ডানহাতে চাপা দিল মুখ।

ছাত ভেদ করে নেমে এসেছে অনেকগুলো মামিফায়েড পা। কোনওটা হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত, কোনওটা উরু থেকে। একটা লাশের প্রায় পুরোটাই দেখা যাচ্ছে, কাত হয়ে আটকে আছে ছাতের সঙ্গে, ঘাড় মটকানো, অক্ষিকোটর কটমট করে চেয়ে আছে নীচের দিকে। লোকটার পোশাক আস্ত রয়েছে।

জীব-জন্তুও রয়েছে ওখানে আটকানো। ছাত থেকে ঝুলছে একটা উটের চার পা। ঘোড়ার ক্ষুরও চেনা গেল। শুষ্ক পরিবেশে সবই শুকিয়ে গেছে। হাড়ের সঙ্গে ঝুলছে চামড়া। যেন পার্চমেন্ট কাগজ।

ঝুঁকে পড়ে মেঝে থেকে একটা স্যাণ্ডেল তুলে নিতে চাইল রায়হান। হাতের ভিতর গুঁড়ো হয়ে গেল সেটা।

'এদের কী হয়েছিল?' নিচু স্বরে বলল স্বর্ণা। 'পাথরে আটকা পড়ল কীভাবে?'

আরও মনোযোগ দিয়ে ছাত দেখল সোহেল। ছাত কুচকুচে কালো রঙের। কাঁচের মত লাগছে, তার ভিতর আটকা পড়েছে কোটি কোটি বালিকণা।

'সবাই কান ঢাকো,' বলল সোহেল। হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। বদ্ধ পরিবেশে গুলি করতেই বিকট আওয়াজ হলো।

ছাতের ছোট এক অংশ উপড়ে ফেলল বুলেট, ঝরঝর করে নেমে এল টুকরোগুলো। ঝুঁকে পড়ে একটা টুকরো তুলল সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড দেখে নিয়ে রায়হানের হাতে দিল।

'শক্ত,' বলল রায়হান। ব্যাখ্যা দিল, 'আমাদের ঠিক উপরেই বিশাল এক গর্ত ছিল। কালক্রমে এই গুহার ছাতটা ধসে পড়ায় নীচের এইসব পাথর দেখা যাচ্ছে, আর গর্তে জমে থাকা আলকাতরার কারণে ওখানে আটকে আছে মৃতদেহগুলো।'

রায়হানের কাছ থেকে জিনিসটা চেয়ে নিয়ে বলল স্মৃতি, 'ঠিক তা-ই।'

'এসব থেকে কী বুঝব?' বলল স্বর্ণা।

'বুঝবেন আমাদের মাথার উপর যখন তখন নেমে আসবে ছাতটা,' গম্ভীর হয়ে বলল রায়হান।

'আপনার ভবিষ্যদ্বাণী শুনে খুশি হতে পারলাম না।'

'আলকাতরার বিশাল গর্তের নীচটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। ওটাই আমাদের মাথার উপরের এই ছাত,' বলল সোহেল।

'আসলে এসব অ্যাসফল্টিক স্যাণ্ড,' বলল স্মৃতি। 'প্রতি গ্রীষ্মে আলকাতরা গরম হয়, আটকা পড়ে জন্তু ও মানুষ।'

'আমার ধারণা, শাস্তি হিসাবে এসব লোককে ছুঁড়ে ফেলা হয় ওখানে,' বলল সোহেল।

'মিটিং শেষে আহমেদ শরীফ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেন,' এই মাত্র মনে পড়তেই বলল স্মৃতি। 'আরও কিছু তথ্য জোগাড় করেন উনি। স্থানীয়রা বিশ্বাস করে ইউনুস আল-কবিরের কবর আছে কালো কিন্তু জ্বলে এমন কিছুর নীচে। আর এ কারণেই কয়লা খনি খুঁড়তে শুরু করে জঙ্গিরা।'

স্মৃতির হাত থেকে আলকাতরার টুকরো নিল সোহেল। ডিসপোজেবল লাইটার দিয়ে জ্বেলে দিল বৃদ্ধাঙ্গুল আকৃতির টুকরো। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ওটা। আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতেই মেঝের উপর ফেলল। ওটার দিকে চেয়ে রইল সবাই।

বুট দিয়ে আগুন নিভিয়ে দিল স্বর্ণা। 'আমরা সমাধির অনেক কাছে চলে এসেছি।'

তবে পরবর্তী পুরো একটা ঘণ্টা পরিশ্রম করেও পাওয়া গেল না সমাধি।

এক জোড়া সুড়ঙ্গের কাছে এসে আবার আলাদা হয়ে গেল সোহেল-রায়হান ও স্বর্ণা-স্মৃতি। সোহেলরা ডানদিকের সুড়ঙ্গ ধরে

এগিয়ে গেল। খানিক পর টের পেল নদী-খাতের অনেক নীচে নেমে এসেছে। ফিরবার আগে ক্যান্টিন থেকে দুই ঢোক পানি গিলল রায়হান। সামনের মেঝে উপরে উঠে গেছে র‍্যাম্পের মত করে। সন্দেহ হলো সোহেলের, ঢালু পথ বেয়ে ছাতের কাছে পৌঁছে গেল।

ছাতের সঙ্গে যেখানে ঢালটা মিশেছে, সেখানে সরু একটা চিড় চোখে পড়ল। লাইটারের জন্য পকেট হাতড়াতে শুরু করল সোহেল। 'তোমার টর্চ নিভিয়ে দাও তো, রায়হান।'

'কী ব্যাপার? কেন, সোহেল ভাই?'

'আগে নেভাও তো।'

রায়হানের টর্চ নিভে যেতেই লাইটার জ্বালল সোহেল, শিখা নিয়ে গেল ফাটলের কাছে। তেমন একটা দুলছে না শিখা, তবে বোঝা যায় র‍্যাম্পের ওপাশে সামান্য হাওয়া চলছে। আবার টর্চ জ্বালল সোহেল, ছাত ও র‍্যাম্প যেখানে মিশেছে, ওই জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করল। খুব দক্ষ ভাবে তৈরি করা হয়েছে এই র‍্যাম্প। চিড়টা চোখে পড়ে না বললেই চলে।

'মানুষ বানিয়েছে এটা,' বলল সোহেল। 'আমার মনে হয় এক ধরনের সি-স। পাশে এসে হাত লাগাও তো, রায়হান।'

র‍্যাম্পের ঢাল বেয়ে যতটা উপরে ওঠা গেল, উঠল ওরা, তারপর পিঠ ঠেকাল ছাতে।

'তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে পিঠ দিয়ে ঠেলা দেবে ওপরদিকে,' বলল সোহেল। 'এক... দুই... তিন!'

'হেঁইও!'

প্রাণপণে ঠেলা দিল দু'জন। প্রথমে মনে হলো কিছুই ঘটছে না। ওদের শ্বাস ফেলবার ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। তারপর হঠাৎ পায়ের নীচে নড়ে উঠল মেঝে, নেমে গেল একটু। ওরা ছাতে ও র‍্যাম্পে চাপ দেয়া

থামিয়ে দিতেই আবারও উপরের দিকে উঠল র‍্যাম্প।

'আবারও, রায়হান!'

দ্বিতীয় চেষ্টায় এক ইঞ্চি নীচে নামল প্রকাণ্ড লিভার। ফাঁক দিয়ে দেখা গেল ওপাশে এক চেম্বার। চিড়ের ভিতর লাইটার গুঁজে দিল সোহেল, তবে র‍্যাম্পের উপর পায়ের চাপ কমে যেতেই প্লাস্টিকের লাইটার চুরমার হলো। পাথরের লিভারের ওজন অনেক বেশি।

'ভাল বুদ্ধি করেছেন, সোহেল ভাই,' বলল রায়হান। 'আমরা চারজন মিলে চেষ্টা করলে খুলে যাবে পথ। সবাই দাঁড়ানোর মত জায়গাও আছে।'

সাত মিনিট পর ওরা খুঁজে পেল স্বর্ণা ও স্মৃতিকে। তারা দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে প্রোটিন বার খাচ্ছিল।

'আমরাও ব্যর্থ,' বলল স্বর্ণা। 'ওই মাথাও বন্ধ।'

'আমরা বোধহয় একটা পথ খুঁজে পেয়েছি,' বলল সোহেল।

রায়হান ব্যাখ্যা করে বলল কীভাবে পাওয়া গেছে র‍্যাম্প, আর ওটা কীভাবে খোলা যায়। লাফিয়ে উঠল স্বর্ণা ও স্মৃতি। আবারও র‍্যাম্পের কাছে ফিরল ওরা। ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় থামল সবাই, কাঁধ ঠেকাল সিলিঙে।

'এইবার এক সঙ্গে সবাই!' হাঁক ছাড়ল সোহেল।

চারজনের চাপের মুখে কর্কশ আওয়াজ তুলল পাথরের ঢাল, সমতল হতে শুরু করেছে র‍্যাম্প। সামান্য ওই চিড় হয়ে গেল চেম্বারের দরজা। ওপাশে কাদার ইঁট দিয়ে তৈরি এক দেয়াল। ওদের গায়ের জোরে র‍্যাম্প হয়ে উঠল ঢালু পথের মত।

'আমরা ওপাশে গেলে কিন্তু আর ফিরতে পারব না,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সোহেল। কপাল ভিজে গেছে ঘামে।

'তাই তো মনে হয়,' বলল স্বর্ণা।'

'আসুন, ঝুঁকিটা নিই, সবাই কাঁধ দিয়ে আরও চাপ তৈরি করুন

ছাতে,' বলল রায়হান।

পাথরের প্ল্যাটফর্ম নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। বিকট আওয়াজ তুলে প্ল্যাটফর্মের শেষমাথা নামল চেম্বারের মেঝের উপর। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে নেমে এল ওরা। সিঁড়ির নীচে যেমন কুঠি থাকে, মনে হলো তেমনই রয়েছে প্ল্যাটফর্মের শুরুর দিকে। ওখানে পুরু কাঠের গুঁড়ি দেখা গেল। ওগুলোই প্ল্যাটফর্ম উপরে তোলে ও নামায়। প্ল্যাটফর্ম যেখানে চেম্বারের মেঝের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে রয়েছে আরও কী যেন।

কর্কশ আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই নতুন আওয়াজ শুরু হলো উপর থেকে। যেন হিসহিস করছে মস্ত কোনও সাপ। বিশ ফুট উপরে ছাত, ওটার উপর আলো ফেলল সোহেল। আর ঠিক তখনই ছাতে ম্যানহোলের ঢাকনির মত বারোটা খাপ সরে গেল, ঝরঝর করে পড়তে লাগল বালি।

'সর্বনাশ,' বিড়বিড় করে বলল স্মৃতি।

পুরু কাঠের গুঁড়ি আসলে বুবি ট্র্যাপের ট্রিগার! ঝটকা দিয়ে উঠে গেল পাথরের প্ল্যাটফর্ম। মনে হলো ওখানে নিরেট পাথরের দেয়াল ছাড়া কিছুই নেই।

চারপাশে আলো ফেলল ওরা। দশ ফুট বর্গাকারের ঘর। তিন দিকের দেয়াল পাথরের। মনে হলো প্রাকৃতিক লাইমস্টোনের তৈরি অ্যালকোভ। চতুর্থ দেয়াল কাদা ও সুরকি দিয়ে তৈরি। পাথুরে দেয়ালের দিকে মনোযোগ না দিয়ে ইঁটের দেয়ালের দিকে চাইল ওরা। কোনও দরজা বা গর্ত নেই। মনে হলো না কখনও কোনও হ্যাণ্ডেল বা মেকানিজম ছিল। বেরুনোর কোনও ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

পাঁচ মিনিট দেয়াল খুঁজে দেখল ওরা। ততক্ষণে মেঝের উপর জমেছে দুই ফুট বালি। ছোট ঢিবি মনে হলো ওগুলোকে। মাথার উপর ছাত থেকে ঝরঝর করে পড়ছে বালি। খাপ থেকে ছোরা

বের করল সোহেল, একটা ইঁটের জোড়ার সুরকি সরাতে শুরু করল। ইস্পাতের ফলার সামনে গুঁড়ো হচ্ছে সুরকি। কিছুক্ষণ পর ঢিলা হয়ে গেল ইঁট। ওটা টান দিয়ে বের করে মেঝের উপর ফেলল সোহেল। ভিতরে আরও ইঁটের স্তর দেখা গেল। হয়তো আরও দশটা স্তর থাকতে পারে।

'ওই সি-স'র লিভারের কাছে পৌঁছতে হবে,' বলল স্বর্ণা। 'কিন্তু দেয়াল সরাব কী করে?' ভুলে বালির ধারার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বিরক্ত হয়ে সরে গেল।

অ্যালকোভের ঠিক সামনে তিনটে গর্ত আছে, এরইমধ্যে অর্ধেক ভরে গেছে বালিতে।

'যেভাবে বালি পড়ছে, লিভার পেলেও আমাদের কবর হবে এখানে,' স্মৃতির কণ্ঠে আতঙ্ক প্রকাশ পেল, 'আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি। কী করব এখন?'

সোহেল-রায়হান পরস্পরের দিকে চাইল। কোনও কথা জোগাল না কারও মুখে।

পনেরো

পাইলট বন্ধুকে ধন্যবাদ দিল হারিস জামান, নেমে পড়ল কপ্টার থেকে, ধপ্ করে বন্ধ করে দিল পলকা দরজা। দু'বার চাপড় দিয়ে সরে গেল ঘুরন্ত রোটরের নীচ থেকে। খুদে সার্ভিস কপ্টার মরুভূমির মেঝে থেকে উঠতে লাগল আকাশে, চারপাশে ছড়িয়ে দিল বালি। ঝড়ের দিকে পিঠ রাখল হারিস, বুজে ফেলেছে

দু'চোখ।

কপ্টার সরে যেতেই টিম কমাণ্ডারের দিকে পা বাড়াল। ত্রিপোলির পুলিশ রেইডে বিরক্ত সে। কিন্তু সেই রাগ এখন হারিয়ে গেছে, সেখানে আছে শুধু আনন্দ। জঙ্গি নেতাকে জড়িয়ে ধরল সে, পচপচ করে দুটো চুমু দিল লোকটার দাড়িভরা দুই গালে।

'তারেক, ভাই আমার, আজ দারুণ এক দিন,' চওড়া হাসল হারিস।

আগেই রেডিও করেছে সে, জানিয়ে দিয়েছে এখানে আসছে। তার নির্দেশে সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সঙ্গীরা অপেক্ষা করছে এমআই-৮ কপ্টারের রিয়ার কার্গো র‍্যাম্পের কাছে। হারিস ওদিকে হাত নাড়তেই হই-হই করে উঠল সবাই। একটা বেঞ্চ সিটে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে বন্দিকে।

হারিসের চেহারা লক্ষ করেছে তারেক। হাত নেড়ে বলল, 'মুখ না বাঁধলে মেয়েলোকের মত ফুঁপিয়ে কাঁদে। এ যদি ইউনুস আল-কবিরের বিষয়ে এক্সপার্ট না হতো, এক বুলেটে ওর মাথা ফুটো করে দিতাম।'

'একের পর এক কী আশ্চর্য ঘটনাপ্রবাহ,' বলল হারিস। ভুলেই গেছে ট্যাগার্টের কথা। 'মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করতে চাইল, আর এখন সামান্য পরেই মিলে গেল ইমামের সমাধি।'

'কীভাবে পেলেন?' জিজ্ঞেস করল তারেক। কপ্টারের দিকে হেঁটে চলেছে তারা। ঘুরতে শুরু করেছে রোটর।

'বন্ধুর কপ্টারে চড়ে সীমান্তের দিকে আসছি, পাইলটকে নিয়ে একটু ঘুরে দেখছিলাম। তিউনিশিয়ার উপর দিয়ে চলেছি, নীচে দেখলাম সেই পুরনো নদী। হঠাৎই চোখে পড়ল নদীর তীরে এক অংশ ধসে পড়েছে। মনে হলো বিস্ফোরক দিয়ে ধস নামানো হয়েছে। আমি যদি ভাটির জলপ্রপাতের কথা আগে জানতাম,

দ্বিতীয়বার দেখতে যেতাম না। কোনও জাহাজ ওদিক দিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু সন্দেহ হলো, কপ্টার নামাতে বললাম পাইলটকে।'

'তারপর? কখন এটা ঘটল?'

'তোমাকে রেডিও করার খানিক আগে—আন্দাজ আধ ঘণ্টা। নেমেই বুঝলাম, ওখানে আগেই এসেছে কয়েকজন লোক। চার জোড়া বুটের ছাপ দেখলাম। দুটো মেয়েদের, বা খুদে লোকের। তাদের একজন হতে পারে ওই আমেরিকান আর্কিওলজিস্টের দলের কেউ।' ট্যাগার্টের দিকে আঙুল তাক করল হারিস।

টারবাইন দ্রুত ঘুরতে শুরু করেছে। চিৎকার করে কথা না বললে কেউ শুনবে না। কপ্টারে উঠে পাশাপাশি দুটো সিটে বসল দুজন। 'সমস্ত ছাপ গেছে নদীর ওপাশে টিলার গুহায়। ওরা এখনও ভিতরেই আছে। ওদেরকে হাতে পেয়ে গেছি আমরা। এই শেষবারের মত বাধা দিয়েছে আমাদের পরিকল্পনায়, আর নয়। আমাদের মুঠোর ভিতর চলে এসেছে ইমাম ইউনুস আল-কবিরের সমাধি।

বাবুর্চি মোস্তফা আবুলের ট্রে থেকে কফির মগ নিল রানা।

'এখন কেমন বোধ করছেন, স্যর?'

'ভাল,' কড়া তরলে চুমুক দিল রানা। 'তুমি?'

'আপনার দোয়ায় ভাল।'

আর কোনও কথা বলছে না রানা। হতাশ হয়ে বিদায় নিল বাবুর্চি। অপারেশন্স সেণ্টারে ব্যস্ত সবাই। দুই বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার একটা কন্সোলের কমপিউটার সরিয়ে ফেলেছে। ওটার মনিটর কাজ করছে না। ওয়েপন্স অফিসার নবী আলাপ করছে নিজ গ্রুপের সঙ্গে। জাহাজের প্রতিটা অস্ত্র তৈরি রাখা হয়েছে। হেলম্সে গগল নির্ধারিত কোর্স ধরে লিবিয়ার বারো মাইল

জলসীমা পেরুতে শুরু করেছে।

জাহাজের সবই টিপটপ রাখা হয়েছে, ক্রুরা সবাই লড়বার জন্য প্রস্তুত। তবে আপাতত ওদেরকে কোনও কাজ দিতে পারবে না রানা।

এখনও নির্ভরযোগ্য তথ্য মেলেনি লিবিয়ান নৌবাহিনীর কোন্ কোন্ জাহাজে হেলিকপ্টার নামার ব্যবস্থা আছে। ওটা জানবার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রানা। আপাতত তীর থেকে দূরে সরছে মার্ভেল।

অপেক্ষা করতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে উঠছে রানা। তীরে সোহেল এবং ওর দলকে রেখে সরে যেতে হচ্ছে। অস্থির লাগছে মনটা।

'রেডিও যোগাযোগ, মাসুদ ভাই,' কাঁধের উপর দিয়ে বলল রেডিও অপারেটার।

সিটের হাতলের সুইচ টিপল রানা, গোপন স্পিকারে ভেসে এল হাঁপিয়ে উঠবার আওয়াজ। একটা নারী কণ্ঠ বলল, 'স্যর, আমি নিশাত। আমরা বিপদে পড়েছি।'

'কী হয়েছে?'

'মোহাম্মদ ফতে আলী বোধহয় ইউনুস আল-কবির নয়,' মনে হলো কথার ফাঁকে দৌড়ে চলেছে নিশাত। 'এইমাত্র হারিস জামানকে দেখলাম, জঙ্গিদের নেতার গালে চুমু দিল। ওরা এমআই-৮ কপ্টারে চেপে সমাধি খুঁজতে চলেছে। মনে হয় হারিস জামানই ইউনুস আল-কবির। সোহেল ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলাম, কিন্তু পারলাম না। ওঁরা আছেন বোধহয় মাটির নীচে। আমি পাহারায় ছিলাম। এখন চার-পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে।'

'হারিস জামান?' সিট ছেড়ে নেমে পড়ল রানা, পায়চারি শুরু করেছে। 'আমরাও তাকে সন্দেহ করছি। ফোনে কাশেম বক্সকে পাওয়া যায়নি। ওর জিপিএস চিপ একদম নড়ছিল না দেখে আমি

খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলাম গ্যাং ফেংকে। পাওয়া গেছে ওকে, মারাত্মক আহত। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে। শেষ খবর অনুযায়ী কাশেমের সঙ্গে ছিল ওই হারিস জামান।'

'হায় আল্লাহ্! কাশেম এখন কেমন আছে?'

'এখনও জানি না। ফেং বলছে গুরুতর আহত। অ্যাম্বুলেন্স ডেকেছে। আশপাশেই আছে। হাসপাতাল পর্যন্ত পিছু নেবে। আমরা এখন এর বেশি কিছুই করতে পারব না।'

কমিউনিকেশন সেন্টারে ফর্-ফর্ আওয়াজ করছে ফ্যাক্স।

'মহা বদলোক হারিস জামান,' বলল নিশাত। 'আকাশ থেকে নিশ্চয়ই কিছু দেখতে পেয়েছে বলেই সবাইকে নিয়ে জলপ্রপাতের দিকে চলেছে।'

'আমি ব্যাকআপ টিম পাঠাতে পারি, তবে তাতে লাগবে কয়েক ঘণ্টা,' হতাশা চেপে রাখল রানা। বুঝতে পারছে কোনও সাহায্যেই আসতে পারবে না ওরা। যা হওয়ার তা অনেক আগেই ঘটে যাবে।

ওর হাতে ফ্যাক্স ধরিয়ে দিল কমিউনিকেশন অফিসার। চট্ করে চোখ বোলাল রানা। দু'ঘণ্টা ধরে এই তথ্য চাইছিল। বিসিআই থেকে জানানো হয়েছে লিবিয়ান নেভি কী ধরনের জাহাজ ব্যবহার করে।

'কাউকে পাঠানোর দরকার নেই,' বলল নিশাত। 'আট মিনিটে এক মাইল করে পার হচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাব। ওখানে বারোজন জঙ্গি আছে। আশা করি তাদেরকে চমকে দিতে পারব।'

মনোযোগ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে রানার। নিশাতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ন্যাভিগেশন কমপিউটারের সামনে চলে গেছে, 'এক মিনিট, আপা, ধরে রাখেন।' বলেই জিপিএস নম্বর ও জাহাজের কো-অর্ডিনেট্স পাঞ্চ করল কমপিউটারে, সেই সঙ্গে

জানিয়ে দিল গত কয়েক ঘণ্টা কোথায় ছিল লিবিয়ান জাহাজটা।

স্ক্রিনে ফুটল তথ্য। পড়তে শুরু করে আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। জঙ্গিদের ক্যাম্প থেকে ওই জাহাজে পৌঁছতে পারবে কপ্টার। ওর মন বলছে, ওই জাহাজেই রাখা হবে প্রধানমন্ত্রীকে। লিবিয়ানদের অন্য রণতরীগুলো এখন ত্রিপোলিতে, ওখানে শান্তি মহাসম্মেলনের আগেই মিলিটারি রিভিউ হবে। কিন্তু এই বিশেষ জাহাজটা রয়েছে তিউনিশিয়ার সীমান্তের কাছে। কেন?

'আপা, ওই গুহার কাছে পৌঁছে রেডিও করবেন,' বলল রানা।

'ঠিক আছে, স্যর।' কেটে গেল লাইন।

ওভারহেড ডিসপ্লেতে টিপটিপ করছে বাতি, ওটা দেখল রানা, 'গগল, তুমি কোর্স ঠিক করো, ওই জাহাজের কাছে পৌঁছতে চাই।' রানার কণ্ঠ এত গম্ভীর যে সবাই ঘুরে চাইল ওর দিকে। অপারেশন্স সেন্টারে সাগরের ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ল উত্তেজনা।

'কোর্স লেইড, রানা।'

'পুরো গতি তুললে ইটিএ কখন?'

'তিন ঘণ্টার একটু বেশি।'

'রওনা হয়ে যাও।'

ক্রুরা শুনতে পেল অ্যালার্মের পরিচিত আওয়াজ। টপ স্পিডে মার্ভেল রওনা হলে সবার মনে হবে ঘোড়ার পিঠে চড়েছে। প্রতিটি খোলা জিনিস রেখে দিতে হবে ড্রয়ারের ভিতর। বাবুর্চির গ্যালির তৈজসপত্র ইত্যাদি ও মোফিজ বিল্লাহ্র মেকআপ পট সরিয়ে ফেলতে হবে নিরাপদ জায়গায়।

ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিন মসৃণ ভাবে গতি তুলছে। তীক্ষ্ণ আওয়াজ ছাড়ছে ক্রাইয়োপাম্প। কপাল ভাল যে ওই ভয়ঙ্কর আওয়াজ মানুষের কানে পৌঁছে না। জাহাজে কোনও কুকুর থাকলে ভয়ে পাগল হয়ে যেত।

আবার সিটে বসল রানা, কমপিউটারের স্ক্রিনে বের করল লিবিয়ান ভেসেলের স্পেসিফিকেশন। ওই জাহাজ মডিফায়েড রাশান ফ্রিগেট। দুই হাজার পাঁচ সালে কেনা হয়। নাম দেয়া হয় বক্তিয়ার খিলজি। ওজন চোদ্দ শ' টন। দৈর্ঘ্যে মার্ভেলের তিন ভাগের দুই ভাগ—তিন শ' তেরো ফুট। লিবিয়ান ফ্রিগেটের চেয়ে অনেক আধুনিক মার্ভেলের অস্ত্রের ভাণ্ডার। কিন্তু ওটা সত্যিকারের শক্তিশালী একটা যুদ্ধজাহাজ। ডেকে রয়েছে চারটে তিন ইঞ্চি কামান, কয়েকটা এসএস-এন-২সি স্টিক্স শিপ-টু-শিপ মিসাইল ও গ্রেকো রকেট। বিপদে জাহাজকে আড়াল দেবে শেষেরগুলো। এ ছাড়া রয়েছে এয়ার অ্যাসল্টের জন্য ৩০এমএম কামান। ডেক লঞ্চার থেকে সাগরে নামাতে পারে টর্পেডো। স্টার্ন থেকে ছাড়তে পারে মাইন।

জেনস্ ডিফেন্স রিভিউয়ের ওয়েব সাইটে গিয়ে জাহাজটার ছবি দেখল রানা। ভয়ঙ্কর নীচ চেহারার একটা ভেসেল। লম্বাটে বো, রেডিও মাস্ট থেকে ঝুলছে অ্যান্টেনা। ওগুলোর আপগ্রেডেড সেন্সর সিস্টেম রয়েছে চিমনির পিছনে। জাহাজের সামনে-পিছনে আর্মার্ড টারেটে বসানো দুটো দুটো করে থ্রি ইঞ্চ গান। সামনেরটার একটু পিছনে অ্যান্টিশিপ মিসাইল লঞ্চারগুলো।

ওটার দিকে চেয়ে ভাবল রানা, এনগেইজমেন্ট হলে হারাতে পারবে মার্ভেল ওটাকে। ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজির স্টিক্স সিস্টেমের দ্বিগুণ রেঞ্জ মার্ভেলের শিপ-টু-শিপ মিসাইলগুলোর। কিন্তু লিবিয়ান ফ্রিগেটে বহুদূর থেকে হামলা করার ইচ্ছা ওর নেই।

ওই ফ্রিগেটে নামতে হবে ওকে, প্রয়োজনে হাতাহাতি লড়াই করে উদ্ধার করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে।

'ওটাই না?' রানার পাশে এসে থেমেছে নবী। 'এ জিনিস আগেও দেখেছি পত্রিকায়।'

'তোমার কী মনে হয়, ডেকে নামতে পারব?'

'ওটার রেইডার স্পেক্স তো দেখেছেন, মাসুদ ভাই। পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে বুঝে ফেলবে কপ্টার আসছে। তা ছাড়া রয়েছে ট্রিপল এ এবং স্যাম মিসাইল।'

'কিন্তু মার্ভেলকে নিয়ে ওটার পাশে পৌঁছতেই হবে।'

'আমরা তো ওদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়ব, তাই না?'

'তার আগে তাদের মনোযোগ সরিয়ে দিতে হবে।'

চুপ হয়ে গেল নবী। মিসাইল আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে নেভাল যুদ্ধ নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। এখন আর ভারী আর্মার দিয়ে মোড়া ব্যাটলশিপ একটা আরেকটার উপর গোলা ফেলে না, বেশিরভাগ সময়ে দেখা যায় দুই পক্ষই কয়েক শ' মাইল দূর থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। হাই এক্সপ্লোসিভ টিপ্‌ড্ মিসাইলগুলো অনায়াসে ভেদ করছে জাহাজের কঠিন আবরণ।

মার্ভেল মজবুত জাহাজ, তবে ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজির তিন ইঞ্চি কামান সবই ভেদ করতে পারবে। তার চেয়ে বড় কথা, কয়েকটা স্টিক্স মিসাইল পাশে এসে লাগলে...

রানা ভাবছে, লিবিয়ান ফ্রিগেটের পাশে পৌঁছবে। কমাণ্ডোদের নিয়ে নেমে পড়বে ডেকে। মার্ভেলের উপর গোলা ও মিসাইল বর্ষণ চলতে থাকা অবস্থাতেই।

'মাসুদ ভাই, দুই জাহাজ পরস্পরের সঙ্গে হাতাহাতি ডুয়েল লড়ছে, এমন ঘটনা শেষ কবে ঘটেছে?' জানতে চাইল নবী।

'আঠারো শ' বাষট্টি সালে। যুদ্ধটা হয় ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটন রোডে।'

'কে জেতে?'

'কেউ না। মনিটর ও মেরিম্যাক ড্র করে। তবে আমাদের সে সৌভাগ্য হবে না।'

'তার মানে আমরা প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়ার পর ফ্রিগেট

ডুবিয়ে না দিলে, আমাদেরকে ছাড়বে না ওরা,' বলল নবী। 'আমরা হয়তো চোরের মত ওদের জাহাজে উঠতে পারব, কিন্তু কাজ উদ্ধার করে কেটে পড়ব, সেটা হতে দেবে না লিবিয়ানরা।'

'আসলে তা-ই।'

'কী করবেন ভাবছেন, মাসুদ ভাই?'

'ভাবছি, এখনও জানি না।'

'ফ্রিগেটের মনোযোগ সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তা কীভাবে সম্ভব? কাছাকাছি যেতেই তো পারব না।'

'কী করা উচিত এখনও জানি না। তবে বুঝতে পারছি হামলা করতে হবে আঁধারে। তুমিও ভাবো কীভাবে ডিসট্র্যাকশনের ব্যবস্থা করা যায়। ...আরেকটা ব্যাপার...' থেমে গেল রানা।

'জী, মাসুদ ভাই?'

'ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজির মত একটা জাহাজ ডুবতে কমপক্ষে বিশ মিনিট লাগে। ততক্ষণে অনায়াসে কয়েকটা মিসাইল ফেলতে পারবে মার্ভেলের ওপর।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল নবী। 'আপনার কথা শুনে গলা শুকিয়ে আসছে আমার। আল্লাহ্ জানেন আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছি।'

'আরও আছে। বক্তিয়ার খিলজির ডেকে নামার আগেই লিবিয়ান মানুষগুলোকে নামিয়ে দিতে হবে লাইফবোটে। চাই না যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তারা এই জাহাজে থাকুক। আমাদের যদি খারাপ কিছু হয়, তাদেরকে চট্ করে নামাতে পারব না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল নবী। 'ঠিক আছে, আমরা ওদেরকে নামিয়ে দেব। তারপর লড়ব ওই ফ্রিগেটের সঙ্গে।'

কমিউনিকেশন অফিসার বলল, 'মাসুদ ভাই, আরেকটা কল এসেছে।'

'ক্যাপ্টেন নিশাত?'

'না। বিসিআই থেকে চিফ, রাহাত খান।'

'লাইন দাও,' হেডসেট পরে নিল রানা। কমপিউটারের কি বোর্ডে দুটো টোকা দিতেই সংযোগ হলো। 'জী, স্যর, বলুন।'

'কেমন আছ? বোধহয় সুস্থ, রানা?' ভারী কণ্ঠ ভেসে এল।

'জী, স্যর, পুরোপুরি ফিট।'

'গুড, তোমার গেস্টদের কী অবস্থা?' খুশি মনে হলো বৃদ্ধকে।

'ভাল, স্যর। একদিনেই জাহাজের বেশিরভাগ খাবার খেয়ে ফেলেছে।'

'আমি ফোন করলাম আপডেট নেয়ার জন্যে। আর দুয়েকটা খবরও আছে।'

অপেক্ষা করল রানা।

কথা বলছেন না চিফ। কী নিয়ে যেন চিন্তিত।

আরও কিছুক্ষণ পর তথ্য দিল রানা, 'হারিস জামান চলে গেছে তিউনিশিয়ায় ইউনুস আল-কবিরের সমাধির কাছে। সোহেল ওখানে আছে।'

'গুড। হারিস জামানই কি গাদ্দাফি সরকারে একমাত্র অফিশিয়াল, যাকে ইউনুস আল-কবির বলে ধারণা করা হচ্ছে?'

'এটা বোধহয় ঠিক নয়, স্যর। তবে আমরাই তাকে পালাতে সহায়তা দিই। বদলে গুলি করে ফেলে গেছে আমাদের একজনকে।'

'তাই? কে আহত?'

'কাশেম বক্স। বুকে গুলি খেয়েছে। চায়নিজ ইন্টেলিজেন্সের গ্যাং ফেং ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছে। কণ্ডিশন এখনও জানি না।'

'অ্যাম্বাসেডার কামাল নাহিদকে জানিয়ে দেব, উনি ওদিকটা দেখবেন।' কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকলেন রাহাত খান, তারপর বললেন, 'তুমি কি নিশ্চিত লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে

আলী এসবের সঙ্গে জড়িত?'

'এখনও নিশ্চিত নই, স্যর। এমন হতে পারে জঙ্গিরা সরকারের সাহায্য ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর বিমান ফেলে দিয়েছে। পরে গোপনে সব প্রমাণ নষ্ট করতে চেয়েছে। লিবিয়ান সরকারের উপরমহল থেকেও এ-কাজ করা হয়ে থাকতে পারে। তাদের সরকারের উঁচু পর্যায়ে যদি ইউনুস আল-কবিরের লোক থাকে, সে বা তারা সব সরাতে বলে থাকতে পারে।'

'ঠিক। হয়তো ইউনুস আল-কবিরের সংগঠনে বড় নেতা মোহাম্মদ ফতে আলী। সে নির্দেশ দিলে বিমানের ধ্বংসাবশেষ নষ্ট করবার চেষ্টা করবে তার লোক। আবার সঠিক সময়ে জানিয়ে দিয়েছে কোথায় পাওয়া যাবে ভূ-পাতিত বিমান।'

'হতেই পারে, স্যর। আরেকটা ব্যাপার, মোহাম্মদ ফতে আলী পদ নিয়েছে সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছ থেকে। তখন সিনিয়র স্টাফ ও মন্ত্রীকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বা গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা ঘটাতে পারে মোহাম্মদ ফতে আলী বা স্বয়ং গাদ্দাফি।'

'সব মিলে বাজে পরিস্থিতি,' চুপ হয়ে গেলেন রাহাত খান। একটু বিরতি নিয়ে বললেন, 'মহাসম্মেলনের বেশির ভাগ অ্যাটেণ্ডেন্ট পৌঁছে গেছেন ত্রিপোলিতে। আজ রাতেই পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়িতে তাঁদের পার্টি। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেলিগেটদের নিয়ে ত্রিপোলি পৌঁছে গেছেন।'

'এই পার্টি বাতিল করলেই বোধহয় ভাল হতো,' বলল রানা।

'তা-ই। কিন্তু তা সম্ভব নয়। আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই যে বাগড়া দেব। বিসিআইয়ের সলীল ওখানে থাকবে। লিবিয়ান সিক্রেট পুলিশ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে, ওখানে জঙ্গিদের হামলা হতে পারে। তবে কোনও সমস্যা হবে না, তাদের পাহারায় ঠিকভাবেই চলবে ডিনার।'

'কেন, স্যর? লিবিয়ানরা...'

রানাকে থামিয়ে দিলেন রাহাত খান, 'নিজ বাড়িতে হামলা হতে পারে, তা ক'জন ভাবতে চায়? প্রতিটি কুকুর তো নিজের বাড়িতে পৌঁছেই বাঘ। আজ রাতের পার্টিতে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের ছবি পরবর্তী খবরে দেখবে দুনিয়াবাসী। আমার ধারণা, যদি হামলা হয়, তা হবে আগামীকালের কনফারেন্সে।'

'লিবিয়ানরা মস্ত ঝুঁকি নিচ্ছে,' বলল রানা। 'তবে নিজেদের জানের উপর দিয়ে নয়।'

'দুনিয়ার তাবৎ বড় রাজনৈতিক নেতা জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়ে। এখন থামবে না কনফারেন্স। হয় ত্রিপোলিতে মিটিং হবে, নইলে দেশে ফিরবেন তাঁরা। সেক্ষেত্রে শুরু হবে নানা ধরনের জঙ্গি হামলা।' থেমে গেলেন রাহাত খান। দীর্ঘ নীরবতার পর বললেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করবার কাজ কতদূর, রানা?'

'একটা সূত্র পেয়েছি,' বলল রানা। আগেই চিফকে জানিয়েছে রেইডারের ব্লিপের কথা, বলেছে ওর ধারণা প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সাগরে। 'উনি বোধহয় বক্তিয়ার খিলজি নামের এক লিবিয়ান ফ্রিগেটে বন্দি। আমরা এখন ওদিকে চলেছি।'

'প্ল্যানটা কী?'

কল্পনায় রাহাত খানকে দেখতে পেল রানা, উনি এইমাত্র পাইপ ধরিয়েছেন, কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে খানিক ঝুঁকে এসেছেন সামনে। 'ওই জাহাজে নামব আমরা, উদ্ধার করব প্রধানমন্ত্রীকে, ডুবিয়ে দেব ফ্রিগেট।'

'ওটা মস্ত ভুল হবে!' কড়া স্বরে বললেন রাহাত খান। ধমক খেয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল রানা। 'তুমি কোনও দেশের ন্যাভাল ভেসেল ডোবাতে পারো না। যদি ধরা পড়ো, দুনিয়ার কোথাও কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবে না।'

'স্যর, আমরা যদি বিসিআই থেকে অনুমতি না নিই?'

খুকখুক করে কাশলেন বৃদ্ধ। 'তার মানে তোমাদেরকে চিনিই না আমরা?'

'জী, স্যর।'

'তা হলেও আমার আপত্তি আছে। তোমাদেরকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুমতি আমি দিতে পারি না।'

'যদি অনুমতি না নিই?' রেগে যাচ্ছে রানা।

'আজ পর্যন্ত আমার মতের বিরুদ্ধে তুমি কিছু করোনি, আমি জানি, এখনও তা করবে না। প্রচ্ছন্ন হলেও আমার কিছুটা সায় তোমার দরকার, তা-ই না?' আবার একমিনিট চুপ। তারপর বললেন, 'কী উচিত আমি বুঝতে পারছি। জানি, এ ছাড়া এখন আর কোনও উপায় নেই। কিন্তু তোমাকে এই অনুমতি দিতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমার, রানা।' করুণ মিনতির মত শোনাল বুড়োর কথাটা, তারপর ধমকের সুরে গর্জে উঠলেন, 'যথেষ্ট বয়স হয়েছে তোমাদের। যা ভাল বোঝো, করো।'

'থ্যাঙ্কিউ, স্যর। সবার সঙ্গে আলাপ করেই সিদ্ধান্ত নেব, স্যর।'

'ভাল হতো ওখানে প্রধানমন্ত্রী আছেন সেটা নিশ্চিত হতে পারলে। বাকি কাজ করত কূটনীতিকরা।' চুপ হয়ে গেলেন চিফ। অপেক্ষা করছে রানা। পাক্কা এক মিনিট পর আবার বললেন তিনি, 'ভাবতে ভাল লাগে, কূটনীতিকরা আলাপ-আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবেন; কিন্তু বাস্তবে কিছুই করতে পারবেন না। এসব জঙ্গিরা অর্ধ-উন্মাদ, নরপিশাচ, বেপরোয়া খুনি। এদের সঙ্গে কোনও ধরনের চুক্তি হতে পারে না কখনও।' আর কিছুই বলছেন না চিফ।

'স্যর, আমরা চেষ্টা করব, যদি পারা যায় লিবিয়ান ফ্রিগেট ডুবিয়ে না দিতে।'

'যা ভাল বোঝো,' চাপা শ্বাস ফেললেন রাহাত খান। 'নতুন

কোনও তথ্য পেলে জানাবে।' খুট করে কেটে গেল লাইন।

রানা টের পেল, প্রিয়পাত্রদের বিপদ দেখে অস্থির হয়ে পড়েছেন চিফ। ওরা আবারও যোগাযোগ না করা পর্যন্ত মহা দুশ্চিন্তায় থাকবেন বুড়ো। সামনে সোহেলটাও নেই যে মেজাজ করবেন ওর উপর।

ষোলো

ছাতের দিকে আরেকবার চাইল সোহেল। উপরের গর্তগুলো থেকে ঝরঝর করে পড়ছে বালি। আগেই নাকের উপর রুমাল বেঁধে নিয়েছে ওরা। তবে এত ধুলো-বালি, আটকে আসতে চাইছে দম। মিহি ধুলোর কারণে যথেষ্ট আলো দিতে পারছে না টর্চ। হ্যালোজেনের উজ্জ্বল প্রভা কমে এসেছে, মিটমিট করছে দুই ব্যাটারির টর্চের মত। ওদের মনে হচ্ছে, ঢুকে পড়েছে প্রাচীন কোনও কবরে, আর কখনও বেরুতে পারবে না এখান থেকে।

সোহেলের নির্দেশে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সবাই। নিজেদেরকে বালির নীচ থেকে খুঁড়ে তুলছে, থাকতে চাইছে ঢিবির উপর। এত দ্রুত বালি পড়ছে, কয়েক সেকেণ্ড খেয়াল না রাখলেই চাপা পড়ছে গোড়ালি। বাড়তি কয়েক মিনিট বেশি বাঁচতে কাজ করে চলেছে ওরা। যদিও অবশেষে মরতেই হবে বালির নীচে ডুবে। হিসহিস আওয়াজে নামছে নিশ্চিত মৃত্যু। অনেক উঁচু হয়ে উঠেছে ঢিবি। এখন ছাতের কারণে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না ওরা।

দুই শ' বছর আগে যে-লোক ফাঁদটা তৈরি করেছিল, সে

বোধহয় স্বর্গে বা নরকে শুয়ে শুয়ে ভাবছে, ভালই বুদ্ধি করেছিলাম তো! দিব্যি কাজ করছে এখনও!

পুরুষদের তুলনায় ভাল করছে স্মৃতি ও স্বর্ণা। ওরা হালকা শরীরে অনায়াসে গর্ত থেকে উঠে পড়ছে, সাহায্য করছে সোহেল ও রায়হানকে।

এইমাত্র সোহেলের পা টেনে তুলল স্বর্ণা। কিন্তু ওর দিকে খেয়ালই দিল না সোহেল, রায়হানের দিকে চেয়ে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, রায়হান, তুমি ঠিক জানো তো এ কুঠুরি শুকিয়ে যাওয়া নদীর নীচে?'

'জী, সোহেল ভাই। ...কিন্তু কেন?'

'তা হলে বোকার মত ভাবছি কেন? সূত্র তো বলছে ওয়ান-পয়েন্ট-সিক্স।'

'ওয়ান-পয়েন্ট-সিক্স? এ আবার কী?' জানতে চাইল স্বর্ণা।

'ওয়ান-পয়েন্ট-সিক্স হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট ওভার-ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরের ফিগার।'

'তাই তো!' খুশি হয়ে উঠল রায়হান। 'ওটা আমার মনেই আসেনি।'

'একটু খুলে বলবেন?' বালির আওয়াজের উপর দিয়ে বলল স্বর্ণা। 'আমরা মরতে বসেছি, এখন অঙ্ক কষে কী হবে?'

'জীবনের সবই অঙ্ক, স্বর্ণা,' উদাস কণ্ঠে বলল রায়হান। 'তুমি আর আমি শুধু জীবনের খেলাঘর হাসি আর গানে ভরে তুলব...'

'অ্যাই, আপনি থামুন তো!' তেড়ে উঠল স্বর্ণা। 'শিল্পী শ্যামল মিত্রের গান আবৃত্তি করছেন, কণ্ঠে একফোঁটা সুরও নেই!'

'আমরা আছি নদীর নীচে এই কুঠুরির ভিতর, ঠিক?' বলল সোহেল। 'এই ফাঁদ তৈরি হয়েছে মানুষকে পানিতে ডুবিয়ে মারতে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে, শুকিয়ে গেছে নদীর পানি, সে জায়গা নিয়েছে শুকনো বালি।'

'তাতে কী, সোহেল ভাই?'

'পানির ভলিউমের চেয়ে বালির ওজন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বেশি,' তথ্য দিল রায়হান।

'তাতেই বা কী হলো?' কড়া চোখে কমপিউটার বিশেষজ্ঞকে দেখল স্বর্ণা।

'বুঝলেন না? পানির ওজন নেয়ার জন্য তৈরি ইঁটের দেয়াল। কিন্তু এখন ঘর ভরে উঠছে বালি দিয়ে। ওয়ান পয়েন্ট সিক্স বালির বাড়তি ওজন নেবে ওই দেয়াল?'

'যে-কোনও ভাল ইঞ্জিনিয়ার ফিফটি পার্সেন্ট সেফটি মার্জিন রাখে,' বলল সোহেল। 'কাজেই ঘরের দেয়াল তৈরি করার সময় যত মজবুতই করুক, তারপরও বালির বাড়তি দশ পার্সেন্ট ওজন ভেঙে দেবে দেয়াল। প্রশ্ন হচ্ছে: আমরা মরার একটু আগে, না একটু পরে।'

একবার সোহেল আরেকবার রায়হানের দিকে চাইল স্বর্ণা। এই দু'জন অনেকটা তলিয়ে গেছে। অথচ মুখে চিন্তার কোনও ছাপ নেই। বড় করে শ্বাস ফেলল স্বর্ণা। মনকে বোঝাল, এরা যখন ভয় পাচ্ছে না, আমিই বা ভয় পেতে যাই কেন!

ঝিরঝির করে বৃষ্টির মত ঝরছে বালি। বেশ কিছুক্ষণ পেরুল, কিন্তু মোটেও ধসে গেল না দেয়াল। ওরা হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছে। ছাত চলে এসেছে মাথার কাছে। এখন চট্ করে সরতে পারবে না বালি প্রপাত থেকে। স্বর্ণা ও স্মৃতির বাড়তি সুবিধা হারিয়ে গেছে। সবার পিঠ ঠেকে গেল ছাতে। আর মাত্র আঠারো ইঞ্চি জায়গা বাকি। দেয়াল যদি এখন ভেঙে না পড়ে, ওরা দম আটকে মরবে। শেষ কয়েকটা মুহূর্ত হবে বড় কষ্টের।

আরও কিছুক্ষণ পর ওদের ধারণা হলো, এবার মরতেই হচ্ছে। বালি খুঁড়ে নিজেদেরকে তুলে রাখতে চাইছে। কয়েক

সেকেণ্ড চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল স্মৃতি। হিসহিস শব্দের ভিতর ওর ফোঁপানির আওয়াজ শুনতে পেল ওরা।

'ধুশ্-শালা, গেলামই তা হলে!' শোনা গেল হতাশ রায়হানের কণ্ঠ। সোহেল ভাইয়ের উপস্থিতি ভুলে গেছে। ছাতে গাল চেপে খুদে এয়ার পকেট তৈরি করতে চাইছে। তারপর ওর গোটা মুখ ঢেকে দিল বালি।

কিন্তু কয়েক শ' টন বালির প্রবল চাপ ইতিমধ্যেই ফাটল ধরাতে শুরু করেছে দেয়ালে। ঝুরঝুর করে খসে পড়ছে সুরকি। পরক্ষণে ধসে পড়া বাঁধের মত চিত হয়ে গেল দেয়াল। তৈরি হলো চওড়া পথ, ওদিকে রয়েছে আরেকটা চেম্বার, সেদিকে ছুটল বালির স্রোত।

সোহেলরা আগেই জীবনকে বিদায় দিয়েছে। হঠাৎ বালির মেঝের নীচ থেকে এল প্রচণ্ড এক টান। যেন গভীর কোনও গর্তে পড়ছে ওরা। কিছুই করবার নেই, তবে পাঁচ সেকেণ্ড পর টের পেল, জাপটা-জাপটি হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপর। একটু আগে যে বালি ওদেরকে শেষ করতে চেয়েছে, ওই একই জিনিস আদর করে নামিয়ে দিয়েছে মেঝেতে।

'ওরে হই, বেঁচেই গেলাম!' বিকট চিৎকার ছাড়ল রায়হান, সবার আগে উঠে পড়েছে। ওর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ফিরল বড় চেম্বার থেকে। উঠে দাঁড়িয়েছে সোহেল, খপ্ করে ওর বাহু ধরল রায়হান, 'দারুণ, সোহেল ভাই! আগে না বললে ভয়েই মারা পড়তাম!'

পোশাক ঝাড়তে শুরু করেছে সোহেল। 'আমি কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম না।'

'আমার কোনও সন্দেহই ছিল না।' স্মৃতি ও স্বর্ণাকে টেনে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রায়হান। 'তবে একেবারের শেষদিকে...'

উঠে দাঁড়িয়েই বলল স্মৃতি, 'মিস্টার আহমেদ, আপনাকে

সত্যিই ধন্যবাদ। আমিও রায়হান সাহেবের মত একই কথা বলব, আগে থেকে ভরসা না দিলে ভয়েই হার্টফেল করতাম।'

ওদের আধ মিনিট লাগল অস্ত্র খুঁজে নিতে। অ্যাসল্ট রাইফেল এ ধরনের বালি-হামলার কথা ভেবে তৈরি হয় না। ওগুলোর ব্যারেল ও রিসিভার ভালমত পরিষ্কার করতে হলো।

কাজ শেষে ঢুকে পড়ল ওরা পাশের গুহায়। গোলক-ধাঁধা এই ভূ-গর্ভস্থ কমপ্লেক্সের মত এই গুহাও লাইমস্টোনের তৈরি। ঢুকবার বা বেরুনোর পথ মাত্র একটি। সামনের দেয়াল থেকে দশ ফুট উপরে। পাথুরে দেয়াল খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে ধাপ।

'আমরা জানি এখানে বুবি-ট্র্যাপ থাকতে পারে,' প্রথম ধাপের সামনে গিয়ে থামল সোহেল। 'আমি সামনে সামনে চলব। আমার পিছনে আসবে স্বর্ণা। তারপর স্মৃতি ও রায়হান। এখন থেকে এদিক-ওদিক সরব না আমরা। কেউ বেশি কৌতূহলী হবে না। প্রত্যেকে সামনের জনের পিছু নেবে। কোনও কিছু অস্বাভাবিক মনে হলে সেটা পাথর খণ্ড হোক বা দেয়ালের লেখা, আমাকে জানাতে হবে।'

চাতালের মত পাথুরে ধাপ বেয়ে উঠে এল ওরা। সামনে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। কিন্তু এতই সরু, আঁচড়ে তুলে নেবে দুই কাঁধ ও কনুইয়ের চামড়া। উপরের দিকে গেছে পথ। রওনা হতেই ওদের মনে হলো, দু'পাশ থেকে চেপে আসছে দেয়াল। এখানে দ্রুত হাঁটা অসম্ভব। বেকায়দা পা ফেললে মচকে যাবে গোড়ালি। সাবধানে চলেছে সোহেল, খেয়াল রাখছে সামনে। যে-কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। খানিক যেতেই ট্রিপ ওয়ায়ার দেখল। পা ফেললেই ট্রিগার হবে।

সরু তামার তার, হাঁটু উচ্চতার একটু নীচে। এক অংশ দেয়ালের পেরেকে, অন্য প্রান্ত গেছে অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ ধরে। আলো ফেলে তারটা দেখাল সোহেল, একে একে ওটা পেরুল

সবাই।

ট্রিপ ওয়ায়ার পেরিয়ে এক শ' ফুট যাওয়ার পর শেষ হলো সুড়ঙ্গ, সামনে পড়ল নিচু ছাতওয়ালা এক কুঠুরি। সুড়ঙ্গের শেষে কাঠের ট্রেস্‌ল, তার নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে হলো। তামার তার থেমেছে এক ডিভাইসের ধাতব লিভারে। ওখানে টান পড়লেই ট্রিপ হবে। নিচু এক মঞ্চ থেকে পাথরের বড়সড় একটা বল রওনা হবে। তিন ফুটি ফুটবল মনে হলো ওটাকে দেখে। ওজন হবে পাঁচ শ' কেজির বেশি। নীচের দিকে রওনা হলে লাফিয়ে গিয়ে পড়বে আগন্তুকের উপর। ফলাফল: সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু।

'ট্রিগার করলে, সোহেল ভাই?' জানতে চাইল রায়হান। ওর বাচ্চাদের মত মন চাইছে সুড়ঙ্গ ধরে ছুটে যাক বল, দেখবে।

'বাদ দিন তো,' বলল স্মৃতি। ওর আর্কিওলজিস্ট মন বলছে, কিছু বদল হওয়া উচিত নয়। আগে চারপাশ দেখে ঠিক করবে কী করা উচিত।

'ওটা এখানে রেখেই এগুব আমরা,' রায়হানকে হতাশ করল সোহেল। তবে মেঝে থেকে তুলে নিল দুটো পাথর, গুঁজে দিল পাথরের বলের নীচে। কেউ যদি ট্রিপ ওয়ায়ার ছিঁড়েও ফেলে, লিভার রিলিজ হবে, কিন্তু নড়বে না বল।

এই ঘরে মানুষের তৈরি কিছু জিনিস দেখা গেল। এক পাশে কাঠের সিন্দুক, তবে ছিটকিনি নেই। পড়ে আছে তলোয়ারের খাপ। আরেক পাশে বারবারি জলদস্যুদের ভয়ঙ্কর চেহারার সিমিটার। ওটা ব্রাসের তৈরি। কয়েকটা দড়ি ও বারোটা ধাতব শাফট। সোহেল চিনল, শেষেরগুলো র‍্যামরড, ওগুলো দিয়ে বারুদ ঢোকানো হতো আগ্নেয়াস্ত্রের ভিতর। দাঁড়িয়ে পড়ে ফ্ল্যাশলাইটের ব্যাটারি বদলে নিল ওরা, আবারও এগুতে লাগল।

ফুটবলের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে সামনে পড়ল তিনটে সুড়ঙ্গ।

প্রথমে ডানদিকের সুড়ঙ্গে ঢুকল ওরা, চারপাশে কোনও বুবি-ট্র্যাপ দেখা গেল না। তবে শেষমাথা বন্ধ পাওয়া গেল। মাঝের সুড়ঙ্গের আধা পথ যেতেই সোহেলের পায়ে লাগল লুকানো ট্রিগার। একটু দেবে গেল মেঝে। সোহেল বুঝে গেল বিপদে পড়েছে ওরা।

সুড়ঙ্গের মেঝে বালিতে ভরা, নীচে লুকানো ছিল কাঠের তক্তা। ওটার উপর সোহেলের পা পড়তেই ফস্ করে উঠেছে তক্তার নীচের ইস্পাতের ফ্লিন্ট, ওটাই জ্বেলে দিয়েছে ফিউজ। গর্তের ভিতর রয়েছে বারুদের পিপে, ওটা বিস্ফোরিত হলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ওরা।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল সোহেল, ঘুরেই ধাক্কা দিল স্বর্ণার কাঁধে। সবাইকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। কয়েক পা পিছিয়ে গেল ওরা, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাদের উপর পড়ল সোহেল। তবে কোনও বিস্ফোরণ হলো না, তার বদলে অনিশ্চিত ভাবে পুড়তে লাগল বারুদ, ফস্-ফস্ আওয়াজ তুলছে। বিশ্রী গন্ধ ও ধোঁয়ায় ভরে গেল সুড়ঙ্গ। ফাঁদ পাতার পর দুই শ' বছর পেরিয়েছে, বারুদের অ্যাসিডিটি শুষে নিয়েছে পিপের কাঠ। নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে আগুন, বিস্ফোরিত হওয়ার ক্ষমতা নেই মিতিয়ে যাওয়া বারুদের।

'সবাই ঠিক আছ তো?' বারুদ পুড়ে শেষ হওয়ার পর উঠে দাঁড়াল সোহেল।

'আমি ঠিক... খক-খক!' জানাল স্মৃতি। বেদম কাশছে।

'আমার মনে হচ্ছে তিন রাউণ্ড ডোজো খেলেছি গ্যাং ফেঙের সঙ্গে,' বলল স্বর্ণা। ডানহাতে বামকাঁধ ডলছে। 'জানতাম না এত ভাল হা-ডু-ডু খেলেন, সোহেল ভাই!'

মৃদু হাসল সোহেল। 'এই বুবি-ট্র্যাপ কিন্তু বলে দিচ্ছে আমরা ঠিক পথেই চলেছি।'

এগুতে শুরু করল ওরা, ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠছে সুড়ঙ্গ। জানবার উপায় নেই টিলার কত গভীরে এসেছে, বা কত দূরে সরেছে নদী-তীর থেকে। তবে সবাই আন্দাজ করছে সমাধিটা কাছেই কোথাও আছে।

এই সুড়ঙ্গ বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। বালির উপর দেখা গেল মানুষের পায়ের ছাপ। আজ থেকে দুই শ' বছর আগে ফাঁদ পেতেছে এরা। আরও দু'বার সবাইকে দাঁড় করাল সোহেল, নিজে সামনের মেঝে পরীক্ষা করে দেখল, কোনও লুকানো বোমা পাওয়া গেল না। আবার এগুতে শুরু করল ওরা।

সামনে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে সুড়ঙ্গ। বাঁকের কাছে পৌঁছে থামল সোহেল, সাবধানে উঁকি দিল ওদিকে। দু' পা গেলেই পাথুরে দেয়ালের বুকে বসানো লোহার প্রকাণ্ড দরজা। জং ধরে লালচে হয়ে গেছে। ওটাই বলছে ওপাশে ছিল ভেজা বাতাস ও পাহাড়ি নদী। কোনও তালা বা চাবির ব্যবস্থা নেই দরজায়। কাঁচা লোহা পিটিয়ে তৈরি পাত। কবজা রয়েছে ওদিকে।

হাঁটু গেড়ে বসল সোহেল। ব্যাকপ্যাক নামিয়ে তার ভিতর হাত ভরে কী যেন খুঁজতে লাগল।

ওকে পাশ কাটাল রায়হান, থমকে দাঁড়াল দরজার সামনে। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করল। নাটকীয় ভাবে বলে উঠল, 'ওপেন সিসেম!' মোটেই নড়ল না দরজা। ঘুরে স্মৃতির দিকে চাইল। 'আপনার কী মনে হয়, মন্ত্রে কাজ হওয়া উচিত না?'

'এ জাদুতে কাজ হবে,' উঠে দাঁড়াল সোহেল। হাতে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের খণ্ড।

স্বর্ণার ফার্স্ট-এইড কিট থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্স নিল ও, ছিঁড়ে নিল এক অংশ। দরজার পাশে ওটা গুঁজে বুঝতে চাইল কোন দিকে রয়েছে কবজা। তাতে লাগল তিন মিনিট। তারপর দুই মিনিটের দুটো টাইমিং পেন্সিল বেছে নিয়ে বসিয়ে দিল

দরজার পাশে।

টাইমার কাজ শুরু করতেই মিষ্টি হাসল রায়হান। 'আপনারা আসছেন তো?' বলেই সোহেলকে পাশ কাটিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল। প্রশস্ত সুড়ঙ্গে ওকে দৌড়ে হারিয়ে দিল সোহেল ও স্বর্ণা। বেশি পিছনে রইল না স্মৃতিও।

পঞ্চাশ গজ গিয়ে থেমে গেল সোহেল। ওর নির্দেশে থামল সবাই। দূরত্বের কারণে আবছা শোনাল বিস্ফোরণের আওয়াজ। তবে প্রেসার ওয়েভ ঝাঁকি দিয়ে গেল ওদের পোশাকগুলোকে।

আগের জায়গায় আবারও ফিরল ওরা। ফ্রেম ও কবজা উড়ে গেছে। সামনের সুড়ঙ্গে ছিটকে গিয়ে পড়েছে দরজা।

পাঁচ ফুট যেতে না যেতেই ফুরিয়ে গেল সুড়ঙ্গ। সামনে প্রকাণ্ড এক গুহা। এতই বড়, হ্যালোজেন ফ্ল্যাশলাইট শেষমাথা স্পর্শ করছে না। ছাত কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট উঁচু, লাইমস্টোনের। ডানদিকে পাথরের বিশাল স্তূপ। ওটা তৈরি হয়েছে বিস্ফোরণের ফলে। জেফ মার্টেল যাওয়ার পর বুজিয়ে দেয়া হয়েছে গুহার মুখ।

বামদিকে উঁচু এক প্ল্যাটফর্ম, মনে হলো এককালে ওটা ইউনুস আল-কবিরের জেটি ছিল। পাশেই একটু কাত হয়ে পড়ে আছে কাঠের জাহাজ, জলদস্যু নেতার প্রিয় রক। এখন আর ভাসছে না ওটা, জমিতে ঠেকে আছে কিল। ভাল করে পিয়ারের সঙ্গে বাঁধা না থাকলে ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে পড়ে যেত।

মাস্তুল নামিয়ে সরিয়ে নেয়া হয়েছে রিগিং, নইলে গুহার ভিতর ঢুকতে পারত না। মনে হলো না জাহাজের কোনও ক্ষতি হয়েছে। এখনও সাগরে নামিয়ে দিলে ভাসবে। শুকনো বাতাসে ঠিক রয়ে গেছে খোল। জাহাজের মুখ নদীর দিকে, স্টার্নের বিকট-দর্শন কামানগুলো কালো গহ্বর নিয়ে তাক করে আছে সোহেলদের দিকে।

পিয়ারে উঠে কাছ থেকে জাহাজটা দেখল ওরা। আমেরিকান

জাহাজের সঙ্গে লড়তে গিয়ে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। গোলার আঘাতে উড়ে গেছে বুলওঅর্কের অংশ, ডেকে অন্তত দশটা জায়গায় আগুন ধরেছে। একটা কামান নেই। ওই এমপ্লেসমেণ্টের অনেক ক্ষতি হয়েছে। যুদ্ধের কোনও এক পর্যায়ে বিস্ফোরিত হয় কামান, হারিয়ে যায় সাগরে।

'চিন্তা করা যায় না,' শ্বাস আটকে বলল স্মৃতি। 'এ তো জীবন্ত ইতিহাস!'

'যেন শুনছি যুদ্ধের দামামা,' আবেগ দিয়ে বলল রায়হান।

'বাড়ি ফিরে কানের ডাক্তার দেখাবেন,' নীরস স্বরে বলল স্বর্ণা। 'সঙ্গে নিউরোলজিস্টও। ব্রেইনেও বড় ধরনের সমস্যা থাকতে পারে।'

প্রকাণ্ড গুহা ঘুরে দেখতে প্রচুর সময় লাগবে, তবে নড়ছে না কেউ জাহাজের কাছ থেকে। ভাবছে, কেমন ছিল সেসব দিন।

ডানদিকে সামান্য নড়াচড়া চোখে পড়ল রায়হানের, সচেতন হয়ে উঠল। ঘুরেই বিধ্বস্ত দরজার ফ্রেমের উপর আলো ফেলল। আর ঠিক তখনই দেখল চট্ করে সরে গেল এক লোক! চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করতে চাইল রায়হান, কিন্তু তার আগেই হুঙ্কার ছাড়ল অ্যাসল্ট রাইফেল। প্রথম যে লোককে দেখেছে, তার দশ ফুট দূরে আঁধারে ঝলসে উঠেছে কমলা আগুন!

পরক্ষণে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রায়হান, মাযল-ফ্ল্যাশে দেখেছে আরও কয়েকজনকে। ওদের চারপাশে এসে লাগছে বুলেট। তারপর গর্জন ছাড়ল আরও কয়েকটা রাইফেল।

সোহেল বসে পড়েই চট্ করে ওদিকে চাইল। তার আগেই কোমরের হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে পিস্তল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ভাবল, এরা এত তাড়াতাড়ি গুহা পেল কীভাবে! বুঝতে পারছে, মোটেই স্বপ্ন দেখছে না। ওদের তিনগুণ লোক হাজির হয়েছে, লড়বার জন্য এনেছে প্রচুর অ্যামিউনিশন। তার

চেয়েও খারাপ সংবাদ: বেরিয়ে যাওয়ার একমাত্র পথই আটকে দিয়েছে তারা!

সতেরো

বিশাল সাগরের দিকে দ্বিতীয়বার চাইল রানা। এ এমন এক দৃশ্য, কখনও পুরনো হয় না। সাগর ওর কাছে রহস্যময় ও রাজকীয়; ওই দূরের দিগন্তের ওপাশে রয়েছে নতুন কিছু। সাগর যেন বড় শান্ত, মুহূর্তে আবার ভয়ঙ্কর খেপা। ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আবার বিপজ্জনক শত্রু। আর সে কারণেই সাগরকে অন্তর থেকে ভালবাসে রানা।

এখন কানে ফিসফিস করছে হাওয়া, জাহাজকে আলতো আদর জানিয়ে চলেছে মৃদু ঢেউ। মার্ভেল যেন তার প্রেয়সী, তাকে দোলনায় বসিয়ে দুলিয়ে দিচ্ছে সাগর। তীর থেকে অনেক দূরে ওরা, কাজেই বাতাস তাজা, তাতে লবণের মৃদু ঘ্রাণ।

'ক্যাপ্টেন রানা, ক্ষমা করবেন,' বলে উঠল কেউ। 'আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি, তবে চলে যাবার আগে আরেকবার ধন্যবাদ না দিলে ছোট হয়ে যাব নিজের কাছেই।'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। মানুষটা সাবেক লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী। তাঁকে বেমানান লাগছে না মোফিজ বিল্লাহ্‌র দেয়া সুটে। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

উষ্ণ ভাবে করমর্দন করল রানা। 'নট নেসেসারি।'

ও চেয়েছে দিনের আলোয় জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবে পলাতক বন্দিদেরকে। ভাল করেই চেনে মার্ভেল ও ক্রুদেরকে,

তবে ভাল কোনও ক্যাপ্টেন চাইবে না রাতে লাইফবোটে মানুষ নামাতে। বাড়তি ঝুঁকি নিতে চায়নি। ব্রিজের উইং থেকে নীচে চাইল রানা। ডেকে শ' দুয়েক মানুষ, লাইফবোটের পাশে।

সবাইকে নতুন পোশাক দিতে পারেনি ওরা। অনেকের পরনে এখনও ছেঁড়া ন্যাকড়া। তবে পেয়েছে ভাল খাবার, সুযোগ হয়েছে গোসলের।

কেউ কেউ দেখতে পেয়েছে রানাকে, হাত নেড়ে বিদায় জানাল। কয়েক সেকেণ্ড পর সবার মনোযোগ চলে এল রানার উপর, অভিনন্দন জানাতে হৈ-হৈ করে উঠল সবাই।

'আপনি এবং আপনার দল না থাকলে মারাই পড়তাম আমরা সবাই,' বললেন সাবেক মন্ত্রী।

পাশ ফিরে কূটনীতিকের দিকে চাইল রানা। 'আপনারা সুস্থ আছেন তা আমাদের জন্য যথেষ্ট প্রাপ্তি। আপনাদের সঙ্গে যাবে ক'জন ক্রু, তাদের মাধ্যমে জানবেন আমরা কী করছি। আশা করি, ভোরে আবার আপনাদেরকে তুলে নিতে পারব। কিন্তু খারাপ কিছু যদি ঘটে, মার্ভেলের ক্রুরা আপনাদেরকে পৌঁছে দেবে তিউনিশিয়ায়। ওখানে পৌঁছুনোর পর আপনারাই ঠিক করবেন কোথায় যাবেন।'

'আমি অবশ্যই দেশে ফিরব,' জোর দিয়ে বললেন সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী। 'ফিরে পেতে চাই আমার পদ।'

'আপনি কীভাবে গ্রেফতার হন? মোহাম্মদ ফতে আলীর নির্দেশে?'

'না। নির্দেশটা দেয় মিনিস্টার অভ জাস্টিস। আমার পুরনো রাজনৈতিক শত্রু সে। ব্যাপারটা ছিল এমন: গতকাল ছিলাম পররাষ্ট্র মন্ত্রী, আজ ভোরেই হয়ে গেলাম কয়েদি। একটা ভ্যানে তুলে সরিয়ে নিল আমাকে, আর আমার পদ পেল মোহাম্মদ ফতে আলী।'

'এটা কবের ঘটনা?'

'গত ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখে।'

'তার আগে কী করত ফতে আলী? আপনার মিনিস্ট্রিতে ছিল?'

'না। সে চাইছে সবাই যেন তা-ই মনে করে। আগে কোথায় কাজ করত, জানি না। তবে এটা জানি, সে ফরেন মিনিস্ট্রিতে ছিল না। পরে লোকের মুখে শুনলাম, লোকটা সাক্ষাৎ করেছে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির সঙ্গে। অথচ কাজটা ছিল প্রায় অসম্ভব। যা-ই হোক, পরদিন ঘোষণা দেয়া হলো, আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, এখন থেকে ফরেন মিনিস্টার মোহাম্মদ ফতে আলী।'

'এমন কি হতে পারে গাদ্দাফিকে ব্ল্যাকমেইল করছে সে?'

'মনে হয় না। ব্ল্যাকমেইল কীভাবে করবে? গাদ্দাফি চিরজীবনের প্রেসিডেন্ট। সুপ্রিম পাওয়ার তার হাতে।'

'এক মিনিট,' ব্রিজে এসে ঢুকল রানা, দেয়াল থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে যোগাযোগ করল অপারেশন্স সেন্টারে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল ডিউটি অফিসার। 'একটা জরুরি কাজে তোমাকে দরকার,' বলল রানা। 'ইন্টারন্যাশনাল প্রেস রিপোর্ট চেক করে বের করতে হবে, ফেব্রুয়ারির ছয় তারিখের আগে গত এক বছরে লিবিয়ান নাগরিকরা কী ধরনের পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে গেছে।'

ব্রিজ থেকে রানা বেরুতেই জানতে চাইলেন সাবেক মন্ত্রী, 'আপনি আসলে কী ভাবছেন?'

'আপনার যে পদ ছিল, সেই পদে অপরিচিত কাউকে কখনও নেয়া হয় না,' বলল রানা। ওর মন চাইছে মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, জানিয়ে দিতে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উচিত হবে না ওই ডিনারে যাওয়া। তবে বলে কোনও লাভ হবে না। কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মোহাম্মদ ফতে আলীকে এক পয়সা দিয়ে বিশ্বাস করি না আমি। কূটনৈতিক

মহলে দারুণ সাফল্য পেয়েছে, সাহায্য করেছে শীর্ষ সম্মেলন সংগঠিত করতে—তবে আমার ধারণা ইমাম ইউনুস আল কবিরের সঙ্গে সে ভাল ভাবেই যুক্ত। আর...' থেমে গেল রানা।

'বলুন?'

'এটা সন্দেহজনক যে আপনি বন্দি থাকবেন ইউনুস আল-কবিরের বন্দি-শিবিরে।' এক মুহূর্ত পর বলল রানা, 'এ থেকে মনে হয় ইউনুস আল-কবিরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে মোহাম্মদ ফতে আলীর।'

'ক্যাপ্টেন, আপনার আগে বুঝতে হবে লিবিয়ান রাজনীতি, এই নোংরামি বহু বছর ধরে চলছে। আমরা জঙ্গি উৎপাদন করি, তাদের খেদমতের জন্য ব্যবহার করি রাজনৈতিক বন্দিদেরকে।'

'আমি শুনেছি লিবিয়ান সরকার জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়ছে।'

'তাই করছে এখন। তবে বহু লোক গাদ্দাফির এই নতুন নীতি না-পছন্দ করছে। তাদের ভিতর একজন ওই জাস্টিস মিনিস্টার। আমি জানি, ইউনুস আল-কবিরকে আগেও সাহায্য করেছে সে।'

'তা হলে আপনি বলতে চাইছেন মোহাম্মদ ফতে আলী আইনগত ভাবেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছে?'

'আমার পদটা নিয়ে নিয়েছে সে, এখন বাস করছে আমার বাড়িতে; তাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না, কিন্তু বলতে কষ্ট লাগছে—ঘটনা বোধহয় তা-ই।'

ব্রিজের ইন্টারকম ব্লিপব্লিপ করে উঠল। আবার ফিরল রানা, বাটন টিপে জানতে চাইল, 'কী পেলে?'

'মাসুদ ভাই, আপনি যা আশা করছেন, তেমন সাড়া জাগানো কিছুই ঘটেনি। সার্চে বেরিয়ে এল, তিনজন লিবিয়ানকে গ্রেফতার করা হয় নীসে, এরা হেরোইন স্মাগলিং করছিল। সুইটযারল্যাণ্ডে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে এক লিবিয়ান, তার সঙ্গে মারা পড়ে আরও তিন সুইস আরোহী। ফ্রান্সে এক লিবিয়ান তার বউকে খুন

করে আত্মহত্যা করতে চায়। গ্রিসে এক লিবিয়ান ঝগড়া করে এক দোকানির সঙ্গে, ছুরি মারে লোকটাকে। কুইক সার্চে আর কিছুই নেই।'

'ঠিক আছে।' ফিরে এসে মন্ত্রীর দিকে চাইল রানা। 'উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না।'

'আপনি কী ভাবছিলেন?'

'সত্যি বলতে, জানি না কী খুঁজছি।'

নীচে দেখা গেল ডেভিট থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে চল্লিশ সিটের লাইফবোট। মার্ভেলের শিকল সরিয়ে নেয়ায় বোটে উঠছে রিফিউজিরা। প্রায় সবগুলো বোট নামাতে হবে সাগরে। চেপেচুপে বসতে হবে মানুষগুলোকে। তবে এসব বোটে ছাত ও দেয়াল আছে, কেউ পা ফস্কে পড়বে না সাগরে। খোলগুলো এমনভাবে তৈরি, হারিকেনের ভিতর পড়লেও ডুববে না।

দ্বিতীয়বারের মত কূটনীতিকের সঙ্গে করমর্দন করল রানা। 'ভাল থাকুন।'

'আপনিও ভাল থাকুন।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

রানা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দশ মিনিট পর শেষ লিবিয়ানও নেমে পড়ল চতুর্থ বোটে। মার্ভেলের চার নাবিক চালাবে বোটগুলো। চতুর্থ বোটের নাবিকের দিকে চেয়ে মাথা দোলাল রানা। জবাবে মুখ কালো করে পাল্টা হাত নাড়ল নাবিক। ওর বোধহয় মনে হচ্ছে মার্ভেল থেকে ওকে চিরবিদায় করে দেয়া হচ্ছে। আর ওকে দেখেই রানার মনে হলো, বেশিরভাগ সময় আমরা যা চাই, তা পাই না। ওর মন কেমন যেন করে উঠল সোহেল-স্বর্ণা-রায়হান ও স্মৃতির কথা ভেবে। ওরা এখন কী করছে?

চেয়ে রইল রানা বোটের নাবিকের দিকে। জেনারেল অপারেশন্স টেকনিশিয়ান সে, বোটে উঠে প্লেক্সিগ্লাস হ্যাচ নামিয়ে

দিল। উইঞ্চগুলো কাজ শুরু করল। মার্ভেলের পাশ দিয়ে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে বোট। কয়েক মুহূর্ত পর লাইন সরিয়ে নেয়া হলো। পুটপুট আওয়াজ তুলে রওনা হয়েছে লাইফবোট, বিশাল জাহাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

দেখতে না দেখতে দূরের বোটগুলোর পাশে পৌঁছল। রাতে ওখানেই থাকবে ওগুলো। আশা করা যায়, ভোরে আবারও তুলে নেয়া যাবে মার্ভেলে।

পাইলট-হাউসের পিছনের গোপন এলিভেটরে উঠল রানা, নেমে এল অপারেশন্স সেণ্টারে। নিজ সিটে বসে থাকল থম মেরে। এখনও কোনও পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেনি। ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজির পাশে কীভাবে ভিড়বে? কীভাবে উদ্ধার করবে প্রধানমন্ত্রীকে? আর ফ্রিগেট না ডুবিয়েই বা কীভাবে সরে আসবে? মেইন ভিউ স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে রেইডার প্লট। ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজি আছে তীর থেকে মাত্র এক মাইল দূরে, ওটার কেউ জানে না মার্ভেলের উচ্চক্ষমতাশালী সেন্সর সুইট সবই দেখছে। আট নট গতি তুলে অলসভাবে পুবে চলেছে জাহাজটা। প্লটে দেখা যাচ্ছে আরেকটি জাহাজ। ওটা বিশাল সুপারট্যাঙ্কার, প্যারালাল ট্র্যাকে চলছে। গন্তব্য বোধহয় আয-যাওয়াইয়া অয়েল টার্মিনাল।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। মাত্র সোয়া এক ঘণ্টা পর মোহাম্মদ ফতে আলীর বাড়িতে শুরু হবে কূটনীতিকদের রিসেপশন। তাঁরা বোধহয় এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছেন। আজ মাঝরাতের পর আকাশে ঝুলবে চার ভাগের এক ভাগ বাঁকা একটা চাঁদ। এসব ভাবতে গিয়ে দমে আসছে রানার মন। মগজে কোনও বুদ্ধি খেলছে না।

মন থেকে সব দুশ্চিন্তা সরিয়ে দিতে চাইল রানা। কখনও কখনও দেখা যায় ঠিক সিদ্ধান্ত মেলে একটু পরেই। কমপিউটারে ইণ্টারনেট খুলল রানা, লিবিয়ানদের বিষয়ে লেখা পুলিশদের

রিপোর্ট পড়তে লাগল। ওই গাড়ি দুর্ঘটনা ছিল ভয়ঙ্কর। ড্রাইভার ও আরোহীরা আগুনে পুড়ে ঝলসে যাওয়া বেগুন হয়ে যায়। শেষে ডেন্টাল রেকর্ড দেখে সনাক্ত করতে হয়। এক লিবিয়ান ছাত্র রেন্টাল গাড়ি নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে, মারা যায় গাছে ধাক্কা দিয়ে।

আরও কয়েকটা রিপোর্ট বের করে পড়ল রানা, মনে পড়ল একটু আগে সাবেক মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করা কথাগুলো। স্ক্রিনে খুলে দেখল লিবিয়ান জাস্টিস মিনিস্টারকে। কুঁচকে গেল ওর ভুরু। অত্যন্ত কদাকার, মোটা লোক সে। নাক থেবড়ে গেছে। সরু দুই চোখ প্রায় দেখাই যায় না। কখনও আহত হয়েছিল। চোয়ালের নীচের অংশ নেই। গ্র্যাফ্ট্ করে বুজে দেয়া হয়েছে গর্তটা, এবড়োখেবড়ো, চকচকে। অফিশিয়াল বাইয়োগ্রাফি বলছে, উনিশ শ' ছিয়াশি সালে আমেরিকানরা ত্রিপোলিতে বোম্বিং করবার সময় তার ওই অবস্থা হয়। এবার রায়হানের কাছ থেকে শেখা বিদ্যা কাজে লাগাল রানা, বের করল সিআই-এর ডেটাবেস। জানা গেল: মন্ত্রী মরতে মরতে বেঁচে যায়। যে লোকের স্ত্রীর সঙ্গে বিছানায় ধরা পড়ে, সে লোকই আজরাইলের মত জান কবচ করতে চেয়েছে। বাকি সব বানোয়াট।

আরও গম্ভীর হয়ে গেল রানা। সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী কাছ থেকে পাওয়া কথাগুলো আবারও ভাবতে শুরু করেছে। লিবিয়ান আইনমন্ত্রী দক্ষ অভিনেতাদেরকে হাসতে হাসতে হারিয়ে দিয়েছে। আবার সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিজ পদ হারিয়েছে, বন্দি তো হয়েইছে, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়েছে; তারপরও মোহাম্মদ ফতে আলীকে দোষ দিচ্ছে না, বলছে না সে-ই তাকে গ্রেফতার করিয়েছে। কথা শুনে মনে হয়েছে ভদ্রলোক বেশি কষ্ট পেয়েছেন তাঁর বাড়িতে মোহাম্মদ ফতে আলী বাস করে বলে।

'স্বর্গের মত বাড়ি?' আনমনে বলল রানা।

ইন্টারনেটে কয়েক মিনিট খুঁজতে হলো ওকে, তারপর পেয়ে

গেল লিবিয়ান ফরেন মিনিস্টারের রেসিডেন্সের ঠিকানা। একটা ম্যাপিং সাইট থেকে পেয়ে গেল জিপিএস কোঅর্ডিনেট্‌স্‌, এবার ব্যবহার করল গুগল আর্থ। নির্দিষ্ট লোকেশনে পৌঁছে জুম করল কমপিউটার। কয়েক মুহূর্তের জন্য সব ঝাপসা হয়ে গেল, তারপর পিক্সেল ঠিক হলো। ভীষণ চমকে গেল রানা, প্রায় লাফ দিয়ে ছাড়ল সিট। চারপাশের সবাই অবাক হয়ে গেছে।

সিটের হাতলের ইণ্টারকম চালু করল রানা, ভীষণ গম্ভীর স্বরে বলল, 'মার্ভেলের প্রত্যেক অফিসারকে হাজির হতে হবে। জলদি অপারেশন্স সেণ্টারে চলে আসুন সবাই।'

স্যাটালাইট ইমেজের দিকে আবারও চাইল রানা। বাড়িটা বসে আছে মরুভূমির মাঝে। কয়েক মাইলের ভিতর কোনও বাড়ি নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়িটাকে অনেক দূর থেকে ঘিরে রেখেছে উঁচু দেয়াল। মেইন গেট থেকে শুরু করে ড্রাইভওয়ে চলে গেছে বাড়ি পর্যন্ত। তার আগে গোল হয়ে উঠে গেছে ক্যাণ্টিলিভার করা পোর্ট-কশেয়ার। একপাশে যুক্ত হয়েছে কাঁচ দিয়ে ঢাকা সোলারিয়াম, পিছন উঠানে গোলক-ধাঁধার মত ঘন হেজ ঝোপ। বাড়ির ছাতে স্যাটালাইট আপলিঙ্ক অ্যাণ্টেনা।

ঠিক এই লেআউটের একটা নকল দেখেছে রানা বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে, জঙ্গিদের ট্রেইনিং ক্যাম্পে!

বিদ্যুৎ-শিখার মত হঠাৎই সব বুঝে ফেলল রানা। ডিগনিটরিদের উপর হামলা হবে আজ রাতেই! মহাসম্মেলনে শান্তি নিয়ে আলাপ করবার সুযোগ রয়েছে তা বুঝবার আগেই সব থামিয়ে দেবে নব্য ইউনুস আল-কবির! সে ভাল করেই জানে নাটকীয়তা জীবনের জন্য জরুরি, কাজেই হামলার আগেই গর্দান নেবে প্রধানমন্ত্রীর! ভদ্রমহিলার মুখটা চোখে ভাসল রানার, তিনি ধীর পায়ে গিয়ে চেয়ারে বসে ঘাড় নিচু করলেন, পিছনে এসে দাঁড়াল এক লোক, দু'হাতে তুলে ধরেছে তলোয়ার!

আস্তে করে চোখ মুদল রানা, দেখতে পেল ঝিলিক দিয়ে নেমে আসছে তলোয়ারটা!

আঠারো

ঘরে নজর বোলাল জল্লাদ। মন ভরছে না তার। থাকা উচিত বিশাল হলরুম, এমন মাঝারি ঘর নয়। শত শত মানুষ তার হাতের কাজ দেখবে। আপাতত ঘরে একা সে, সঠিক সময়ে হাজির হবে দর্শক। অবশ্য সংখ্যায় তারা হবে কম। এখানকার সবাই হাজির হতে চেয়েছে, কিন্তু শেষে লটারি করে ভাগ্যবান কয়েকজনকে সুযোগ দেয়া হয়েছে। ঘরের পিছনে ভারী কালো চাদর ঝুলছে। ট্রাইপডে ক্যামেরা, আগেই পরীক্ষা করা হয়েছে। ঠিক ভাবেই কাজ করছে আপলিঙ্ক। চেয়ারের সামনের মেঝেতে পেতে দেয়া হয়েছে পুরু প্লাস্টিকের শিট। কাজ শেষে রক্ত পরিষ্কার করতে সুবিধা হবে।

জল্লাদের মনে পড়ল, প্রথম যখন একজনকে কতল করতে চাইল, সে-লোকের হৃৎপিণ্ড খুব ধড়ফড় করছিল। প্রেসার উঠে গেল সাড়ে তিন শ'-এ। তারপর যখন কাটা পড়ল মাথা, ধড়টা থেকে ছিটকে বেরুল ফোয়ারার মত রক্ত। বাগদাদের সে সেফ হাউস আর ব্যবহারই করা গেল না। অত নোংরা সাফ করবে কে!

আজ এগারোবারের মত মাথা কাটতে চলেছে সে। আগে কখনও এতটা উত্তেজিত হয়নি। আজই প্রথম মেয়েমানুষ কতল করবে। ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে মরোক্কো পর্যন্ত প্রায়

সবখানে আগেও মেয়েদেরকে খুন করেছে, আশপাশের অনেক নির্দোষ মানুষও মারা পড়েছে তার ফলে; কিন্তু সেসব ছিল অন্য কিছু—বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিলে এই মজা কোথায়?

ওসব হত্যাকাণ্ডের কথা কখনও ভাবে না সে। ইউনুস আল-কবির নির্দেশ দিয়েছেন, কাজেই সেটা পালন করতেই হবে। বিবেকের কাছে সে পরিষ্কার, হাসতে হাসতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের সঙ্গে হাত মেলাবে, তারপর উড়িয়ে দেবে বোমা ফাটিয়ে।

এ সংগঠনে খোলা কিন্তু গোপন তথ্য হচ্ছে, সে নিজে মুসলিমদের মত ধর্মের নিয়ম মানে না। তাদের পরিবারে গোঁড়ামি ছিল না, ঈদের দুই দিন সে নামাজ পড়ত মসজিদে। তাও বাদ দিয়েছে আজ বিশ বছরের বেশি। লিবিয়ান আর্মিতে ক্যাপ্টেন ছিল, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে শুনেই পদত্যাগ করে, যোগ দেয় ইমাম ইউনুস আল-কবিরের সংগঠনে। যুদ্ধে যেতে ভাল লাগে না তার। তবে ইরাক, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মিশর, সিরিয়া ও মরোক্কোয় ট্রেইনিং দিয়েছে নব্য জঙ্গিদেরকে। সে ভাল করেই জানে ধর্ম ও স্রষ্টার নামে ধার্মিক লোকও হয়ে ওঠে ভয়ানক রক্তলোলুপ। তবে এ নিয়ে ভাবে না সে, নিজ মনের খুশিতে খুন করে, কোনও ধর্মের জন্য নয়।

দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজ এল। 'ঘর পছন্দ হয়েছে, ভাই মঞ্জুর?'

আনমনে বলল সে, 'হ্যাঁ, চলবে।'

'মেয়েলোকটাকে কখন আনবেন?' পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল লোকটা।

'গর্দান নেয়ার একটু আগে। এরা যখন বোঝে মরতেই হবে, তখন বেশি ভয় পায়। ওটাই সেরা মুহূর্ত।'

'আপনার যা মর্জি, ভাই। কিছু লাগলে আমাকে বলবেন। আমি বাইরেই আছি।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না মঞ্জুর লোহানি। লোকটা নীরবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মঞ্জুরের মনে হয়নি মহিলা কাতর হয়ে প্রাণ-ভিক্ষা চাইবে। অল্প যেটুকু সময় দেখেছে, তাকে অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নারী বলে মনে হয়েছে। সেটাই বোধহয় ভাল। কাউকে কাঁদতে দেখলে, কাকুতি-মিনতি করতে দেখলে মন খারাপ হয়, সেইসঙ্গে আসে বিরক্তি। হ্যাঁ, ওই বিরক্তিই তাকে খেপিয়ে তোলে। মহিলা সহজ ভাবে গ্রহণ করুক মৃত্যুকে, প্রাণভিক্ষা চাওয়ার দরকার নেই। তাতে মহিলার সম্মান অন্তত থাকে।

সবাই ভাবে, মাফ চাইলেই বুঝি বাঁচবে। বোঝে না, মঞ্জুরের দেখা পাওয়া মানেই আজরাইলের দেখা পাওয়া।

মৃদু হাসল মঞ্জুর লোহানি।

না, ওই মহিলা প্রাণভিক্ষা চাইবে না।

'ডানদিক কাভার করো!' চেঁচিয়ে উঠল সোহেল। রক জাহাজের রেলিঙের ওপাশ থেকে পাঠিয়ে দিল পিস্তলের এক পশলা বুলেট। 'পাথরের স্তূপ পেরিয়ে আমাদেরকে ঘিরতে চাইছে।'

ওর মাযল-ফ্ল্যাশ দেখেই চার জায়গা থেকে এল পাল্টা গুলি।

তৈরি ছিল স্বর্ণা, ডেকের বিশ ফুট দূরে ক্রল করে গেছে। উঠে দাঁড়িয়েই রাইফেল থেকে দুই সেকেণ্ড গুলিবর্ষণ করল। ওখানে ছিল এক জঙ্গি। তার কী হলো, বোঝা গেল না। গুহার ভিতর নেমে এসেছে নিকষ অন্ধকার।

আচমকা দু'দলের এভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় প্রথম কয়েক সেকেণ্ড সবাই সংগঠিত হতে চেয়েছে। সোহেলের নির্দেশে রক জাহাজের ডেকে উঠে পড়েছে ওর দল। স্বল্প সময়ে ওটাই ছিল সবচেয়ে কাছের ভাল কাভার। ওদিকে গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিয়েছে জঙ্গি-নেতা, জানিয়ে দিয়েছে অ্যামিউনিশন বাঁচিয়ে হামলা

করতে হবে।

একটু পর পর জোনাকির মত জ্বলছে তাদের ফ্ল্যাশলাইট। শত্রুদের গুলি এড়াতে, চট্ করে সামনের পথটা দেখে নিয়েই ছুটে আসতে চাইছে। শুরুতে টর্চওয়ালা লোকের দিকে মনোযোগ দিয়েছে সোহেলরা। কয়েক মুহূর্ত পর বুঝেছে, ওরা ভুল করছে। জঙ্গিরা কোনও কাভার না পাওয়া পর্যন্ত টর্চ জ্বালছে না। আর সে আলো শুধু পিছনে পড়া জঙ্গিদেরকে পথ দেখানোর জন্য।

'কই, কই!' নিচু স্বরে বলে চলেছে রায়হান। ব্যাকপ্যাক নামিয়ে সব ছিটিয়ে কী যেন খুঁজছে। 'আমি জানি তুই আছিস, কিন্তু কোথায়!'

জাহাজের গায়ে এসে লাগছে বুলেট। কয়েকটা ঢুকে পড়ল গানপোর্ট দিয়ে, রায়হানের মাথার পাশেই বিঁধল।

জোরে এক থেকে তিন পর্যন্ত গুনল সোহেল, 'স্বর্ণা, তৈরি?'

ওরা রেলিঙের ওপাশ থেকে একইসঙ্গে উঠে দাঁড়াল, পরক্ষণে গুলি ছুঁড়তে লাগল। নতুন কাভার নেওয়ার জন্য ছুটতে শুরু করেছে এক জঙ্গি, কিন্তু দুর্ঘটনাবশত পড়ে গেল অন্য এক জঙ্গির টর্চের আলোর ভিতর। নদীর শুকনো তীর বেয়ে পিয়ারে উঠতে চাইছে সে। যদি সফল হয়, একাই শেষ করে দেবে শত্রুদেরকে।

সঙ্গীর টর্চের বিম পড়েছে তার পায়ের উপর। কিন্তু ওটুকুই যথেষ্ট, নিশানা ঠিক করল সোহেল, আন্দাজ করে নিল কোথায় থাকবে জঙ্গির বুক। পর পর দু'বার গুলি করল। তার পুরস্কারও পেল, ঠন-ঠনাৎ করে পড়ল রাইফেল, ভেসে এল আর্তচিৎকার।

আগেই চট্ করে ডেকে বসে পড়েছে সোহেল ও স্বর্ণা। মাথার উপর দিয়ে গেল একে-৪৭-এর বুলেট, রেলিঙে লাগল কয়েকটা ঠকাঠক।

'পাগলামি, স্রেফ পাগলামি,' সোহেলের পাশে বসে বিড়বিড় করছে স্মৃতি।

মৃদু হাসল সোহেল। 'মুখোমুখি গানফাইট এমনই হয়।'

রক জাহাজের স্টার্নে ঠনাৎ করে পড়ল কী যেন।

'শুয়ে পড়ো!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সোহেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। সবার দেহের উপর দিয়ে গেল শ্র্যাপনেল, খুবলে নিল শুকনো কাঠ।

ঝনঝন করছে সোহেলের দুই কান, তবে ওদিকে মনোযোগ দিল না। ওদেরকে শুইয়ে রাখতে গ্রেনেড ফেলেছে, সেই সুযোগে সামনে বাড়বে জঙ্গিরা। কিন্তু সময় দিতে চাইল না সোহেল, রেলিঙের ওপাশ থেকে উঁকি দিল। গুহার বিধ্বস্ত দরজা থেকে আরেক দিক পর্যন্ত টিপটিপ করে জ্বলছে টর্চ! হিমশীতল ভয় খামচে ধরল সোহেলের হৃৎপিণ্ডকে। স্মৃতির সঙ্গে অস্ত্র নেই, আর রায়হান গোলাগুলিতে একদম অদক্ষ। তার মানে লড়বে শুধু স্বর্ণা আর ও।

কিন্তু এতজনের বিরুদ্ধে কী করবে ওরা দু'জন?

কমব্যাট হার্নেসের অ্যামিউনিশন পাউচ হাতড়াতে শুরু করেছে সোহেল, খাবলে তুলে নিল এক টুকরো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। গাঢ় আঁধারে আঙুলের স্পর্শে খুঁজে নিল ষাট সেকেণ্ডের টাইমিং পেন্সিল, গেঁথে দিল ঠিক জায়গায়, তারপর ডেক থেকে ছুঁড়ে ফেলল। আগেই বদলে নিয়েছে গ্লক ১৯-এর ম্যাগাজিন, তিন সেকেণ্ড গুলি করেই আবার বসে পড়ল।

'আমাদেরকে ঘিরে ফেলতে দেয়া চলবে না,' স্বর্ণার উদ্দেশে বলল। 'প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ফেলেছি। ওটা ফাটলে সেই সুযোগে টার্গেট খুঁজে নেবে।'

সোহেল ঠিক করে ফেলেছে, ওরা যদি সময় পায়, স্মৃতিকে কাজে লাগাবে, খালি ম্যাগাজিনে গুলি ভরবে সে।

পঁচিশ সেকেণ্ড পর বিস্ফোরিত হলো প্লাস্টিক চার্জ। কংকাশন হলো বুকে লাথি খাওয়ার মত। তৈরি ছিল সোহেল, আগুনের মস্ত

ছাতি উঠে গেল ছাতের দিকে, অশুভ আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল গোটা গুহা।

একই সঙ্গে গুলি শুরু করল সোহেল ও স্বর্ণা। যেসব জঙ্গি কাভার নেওয়ার জন্য ছুটে আসছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে গেল প্রথম পশলা বুলেট, তারপরই যিরো-ইন করল সোহেলরা, বুকে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়ল তিন জঙ্গি।

আট জায়গা থেকে গুলি এল। রক্তে ভেসে গেল সোহেলের থুতনি। রেলিঙে লেগেছে বুলেট, ছিটকে উঠে এসেছে কাঠের চল্টা। ব্যথা পাত্তা দিতে চাইল না সোহেল, আলোর শিখা থাকতে থাকতেই টার্গেটে গুলি পাঠাতে হবে; কিন্তু তা সম্ভব হলো না, দূর থেকে এল অজস্র বুলেট।

গুলির বর্ষা কমে আসতেই আবারও উঠে দাঁড়াল সোহেল, নদী-খাত থেকে যে-কেউ উঠে আসতে পারে, কাজেই অন্ধের মত গুলি করল পিয়ারের পাশে। হঠাৎ করডাইটের কড়া গন্ধের পাশাপাশি ভেসে এল পরিচিত ঘ্রাণ—পুড়ছে কাঠ।

ঘুরে চাইল সোহেল। গ্রেনেড ফাটবার সময় আগুন ধরে গেছে ডেকে? শিখাগুলো এখনও নিচু, কাঠ চাটছে, প্রচুর ধোঁয়া তৈরি করছে। তবে বাড়তে শুরু করেছে শিখা। একবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে পুড়ে মরতে হবে ওদেরকে। জ্বলন্ত চিতা হয়ে উঠতে পারে ইউনুস আল-কবিরের জাহাজ।

'রায়হান, আগুন নেভাও, আমরা কাভার দেব,' নির্দেশ দিল সোহেল।

রায়হানের পাশ থেকে ক্রল করে সোহেলের দিকে এগুল স্মৃতি। 'ও অন্য কাজে ব্যস্ত। আমি নেভাই।'

'মাথা উঁচু করবেন না,' সাবধান করল সোহেল। মেয়েটির সাহস দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারল না।

দাউ-দাউ করে বেড়ে চলেছে শিখা। লাল আভায় দেখা গেল

গোটা স্টার্ন। ওখানে যেন উঠছে নতুন সূর্য। আলোর বলয় বাড়ছে দ্রুত, সুযোগ পেয়ে গেল জঙ্গিরা। আগের চেয়ে ভাল ভাবে দেখতে পাচ্ছে জাহাজটা। নিশানা করছে অনায়াসে।

সোহেল থেকে ত্রিশ ফুট দূরে জ্বলন্ত কাঠের কিনারায় পৌঁছে গেল স্মৃতি। ডেক জ্বলছে না। হেলমসম্যানের বেঞ্চ পুড়ছে। চিত হয়ে শুয়ে পড়ল স্মৃতি, বেঞ্চের নীচে দুই পা রেখে জাহাজ থেকে ফেলে দিতে চাইল বেঞ্চ। কিন্তু সম্ভব হলো না, দু'টুকরো হয়ে গেল বেঞ্চ, ঝরঝর করে স্মৃতির উপর পড়ল কয়লার আগুন।

পুড়ছে ত্বক, চাপড় দিয়ে আগুন নেভাতে চাইল স্মৃতি। ধড়মড় করে উঠে বসল, মাথা গলিয়ে বের করে নিল শার্ট। পরনে ব্রেসিয়ার, ছিঁড়ে ফেলল শার্ট, ওটা দিয়েই দুই হাতে নেভাতে চাইল আগুন। ওর মাথার উপর দিয়ে রাগী মৌমাছির মত ছুটছে দু'পক্ষের গুলি।

জেদি শিখা নেভাতে অন্তত তিন মিনিট লাগল। ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেল স্মৃতির শার্ট। দুই তালু থেকে উঠে গেল চামড়া, সেখানে রইল শুধু লালচে মাংস। ব্যথায় পাগল হয়ে যাওয়ার দশা হলো ওর, কখনও ভাবতে পারেনি জীবনে এত কষ্ট থাকতে পারে।

যন্ত্রণা এতই তীব্র, ক্রল করে এগুতে পারল না, সাপের মত করে পিছলে ফিরে এল অন্যদের কাছে।

স্মৃতির হাতের উপর আলো ফেলেই চমকে গেল সোহেল।

'ঠিক হয়ে যাবে,' কাঁপা স্বরে বলল স্মৃতি।

'সবাই কান চাপা দিন,' উত্তেজিত, কিন্তু নিচু স্বরে বলল রায়হান।

কিছুক্ষণ ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে দেখল জাহাজের বিশাল কামানের টাচহোল। কয়েক সেকেণ্ড পর মনে হলো ঠিক সময় হয়েছে, টাচহোলের ভিতর ফেলে দিল টাইমার পেন্সিল। আগেই কামানের

ব্যারেলের ভিতর ঠেসে দিয়েছে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ। ওটার সামনেই রয়েছে গোলা—অন্তত বারোটা ধাতব বল দিয়ে তৈরি, ফিউজ দিয়ে পেঁচানো।

ফাটল টাইমার, ডেটোনেট করল প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভকে, অমনি কামানের মুখ থেকে ছিটকে বেরুল দশ ফুটি আগুনের হলকা। তার আগেই বেরিয়ে গেছে বারোটা গোলা। কামানের পিছিয়ে যাওয়া ঠেকাতে যে দড়িগুলো, সেগুলো কোনও কাজেই এল না; দুই টনি ব্রোঞ্জের কামান রকেটের মত বিপরীত দিকে ছুটল, রেলিং ভেঙে গিয়ে পড়ল পিয়ারের নীচে, নদীর পাড়ে।

বারোটা গোলার আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে প্রকাণ্ড কামানের গর্জনে। রায়হান দেখল যেখানে তাক করেছে, সেখানে তিনটি টর্চের দুটো নিভে গেছে।

কামানের গর্জন যেন কোনও সিগনাল, জানিয়ে দেয়া হয়েছে প্রথম রাউণ্ড যুদ্ধ শেষ, এবার দ্বিতীয় রাউণ্ড। জঙ্গিরা নতুন উদ্যমে গুলিবর্ষণ শুরু করল। জাহাজের শুকনো কাঠ চিবিয়ে চলেছে বুলেটগুলো। যেন জাহাজ টুকরো টুকরো করতে চাইছে জঙ্গিরা। জবাবে তাদের দিকে গুলি শুরু করল মার্ভেলের তিনজন। তবে শত্রুপক্ষে লোক বেশি, তারাই আটকে রাখল সোহেলদেরকে।

গলা ফাটানো চিৎকার শোনা গেল, সবাই মিলে তেড়ে আসছে জঙ্গিরা।

পাল্টা গুলি করতে গিয়ে আহত হলো স্বর্ণা। কাঁধের মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে বুলেট। আহত কাঁধে রাইফেলের বাঁট ঠেকাতে পারবে না, কাজেই অস্ত্র ফুল অটোতে নিয়ে গেল, তারপর জাহাজ থেকে তিরিশ ফুট দূরে নিশানা করে গুলিবর্ষণ করল। বুলেটের একটা পর্দা তৈরি করতে চাইছে, যাতে জঙ্গিরা এগুতে না পারে।

রাইফেলের বোল্ট খট্ করে আটকে যেতেই স্বর্ণা বুঝল ম্যাগাজিন শেষ। ওর কাছ থেকে যেন দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে

রায়হান, গুলিবর্ষণ শুরু করল। যেভাবে হোক থামাতে হবে জঙ্গিদের ছুটে আসা। দেখতে না দেখতে রায়হানের অস্ত্রের গুলিও ফুরিয়ে গেল। একা সোহেল গুলি করে চলেছে পিস্তল দিয়ে, চেম্বার খালি হলেই পিস্তল ডেকে রেখে বদলে নিচ্ছে ম্যাগাজিন। ও যেন কোনও রোবট, ওর একমাত্র কাজ জঙ্গিদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা। সোহেলের অভিজ্ঞতা বলছে, লোকগুলো একবার সাহস হারালে পিছিয়ে যাবে কাভার নেয়ার জন্য।

চারপাশে এসে লাগছে বুলেট, পরোয়া করছে না সোহেল। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, ওরাই জিতছে। মাযল-ফ্ল্যাশ পিছাতে শুরু করেছে। আপাতত পিছিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিরা।

বুলওঅর্কের পিছনে বসে পড়ল সোহেল, একের পর এক গুলি করে ব্যথা করছে কাঁধ-বাহু-কবজি। ঘেমে নেয়ে গেছে ও। জঙ্গিদের গুলি কমতেই জানতে চাইল, 'তোমাদের কার কী অবস্থা?'

'কাঁধে গুলি খেয়েছি,' অন্ধকারে জানাল স্বর্ণা।

'কপালের দোষ দিচ্ছি এখনও,' তিক্ত স্বরে বলল রায়হান। 'নিশাত আপার কাছ থেকে নাইট ভিশন নেয়া উচিত ছিল। যা-তা কারবার করলাম, সবচেয়ে জরুরি গিয়ারই ভুলে গেলাম!'

'স্মৃতি?'

'আমি ঠিক আছি,' নিচু স্বরে বলল স্মৃতি। ব্যথায় কাঁপছে কণ্ঠ।

'রায়হান, স্বর্ণার মেডিকেল কিট থেকে ব্যথার ওষুধ নিয়ে স্মৃতিকে ইঞ্জেকশন দাও।'

গত দশ মিনিট গুলির আওয়াজ অনেক বেড়ে ছিল, তবে এখন কেউ গুলি করছে না। থমথম করছে চারপাশ।

সবার কানে ধাঁধা লেগে গেছে, তবে শুনতে পেল এক লোকের কণ্ঠ, আসছে গুহার দরজার কাছ থেকে। 'তোমাদেরকে

একটা সুযোগ দেব। বাঁচতে চাইলে আত্মসমর্পণ করতে পারো।'

'হারামজাদা,' বলে উঠল স্বর্ণা। 'আমি তোর ওই গলা চিনি!'

'কী বললে?' বলল সোহেল। 'লোকটা কে?'

'মার্ভেলের ডেকে মাসুদ ভাই কথা বলেন ওই লোকের সঙ্গে। হার্বার পাইলট। নাম হারিস জামান।'

'এখন বুঝলাম কেন উপকূল সড়কে হামলা হয়েছিল,' বলল রায়হান।

'এ থেকে কোনও সুবিধা পাব না আমরা,' বলল সোহেল। কয়েক মুহূর্ত ভেবে গলা চড়িয়ে বলল, 'আত্মসমর্পণ, হারিস? তোমরাই বরং তাই করো! মাফ পেতেও পারো!'

'ব্যাটাকে আরও চেতিয়ে দিলেন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রায়হান।

এবার শুরু হলো তৃতীয় রাউণ্ড হামলা।

উনিশ

একটু আগে ভাল সংবাদ পেয়েছে রানা। লিবিয়ান ফ্রিগেট বক্তিয়ার খিলজিকে যে সুপারট্যাঙ্কার পাশ কাটাবে, ওটাকে ভাল করেই চেনে রানা। ইজরায়েলের অ্যাশকেলন নৌ-ঘাঁটিতে পারমাণবিক মিসাইল ধ্বংস করে ফিরবার সময় সুপারট্যাঙ্কার এইযির সঙ্গে দেখা হয় ওদের। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হয় আতাসির। পেট্রোলিয়াম ইউএলসিসি কোম্পানির জাহাজটি ডুবত ইজরায়েলি সাবমেরিনের টর্পেডোর আঘাতে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে রক্ষা পায় দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস জাহাজটি সাবমেরিনকে থামিয়ে

দেয়ায়। বুদ্ধিমান লোক ক্যাপ্টেন জর্জ অ্যাডাম্‌স্‌, তাঁকে বেশি কিছু বলা হয়নি, তবে অনেক কিছুই বুঝে নিয়েছেন। একবারও জানতে চাননি মার্ভেল জাহাজটি কোন্ দেশের নেভির। ক্যাপ্টেন মাসুদ রানাকে ধন্যবাদ দেন তিনি।

মার্ভেল ও এইযি এখন খুব কাছে চলে এসেছে, কাজেই ধরে নেয়া যায় বক্তিয়ার খিলজি থেকে ওদের কমিউনিকেশন মনিটর করা হচ্ছে। এই সমস্যা দূর করতে ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়েছে রানা। পেট্রোলিয়াম ইউএলসিসি কোম্পানির ওয়েব সাইট থেকে পেয়েছে এইযির ই-মেইল অ্যাড্রেস, ওই ঠিকানা অনুযায়ী নোট পাঠিয়েছে ক্যাপ্টেন বরাবর। ওই চিঠি সত্যি মার্ভেল থেকে পাঠানো হচ্ছে তা বুঝবার উপায় নেই কারও। হতে পারে আমেরিকার যে-কোনও শহর থেকে ফালতু কোনও ছোকরা ই-মেইল করছে। আর এ কারণেই প্রায় বিশ মিনিট কথা চালাচালির পর ক্যাপ্টেন অ্যাডাম্‌স্‌ মাত্র বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, এ লোকই দ্য মার্ভেল অভ গ্রিসের ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা। এবং তাঁর জাহাজটি নিয়ে এইযির মাত্র এক হাজার ফুট দূরে চলে এসেছেন তিনি।

প্রতিটি জবাব পাওয়ার ফাঁকে আফসোস করছে রানা। এখন রায়হান থাকলে খুব ভাল হতো। ছোকরা পেরেন্ট কোম্পানির মেইনফ্রেম হ্যাক করে সরাসরি অর্ডার ঝাড়ত। সেক্ষেত্রে এত কথা লিখে এইযির ক্যাপ্টেনকে পটানোর চেষ্টা করতে হতো না। বারবার তাঁকে লিখতে হচ্ছে ওদের কী ধরনের সাহায্য দরকার।

নতুন একটা ই-মেইল দেখা দিল ইনবক্সে।

ক্যাপ্টেন রানা, বিষয়টা আমার ভাল লাগছে না। বহু বছর হলো আমি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন। আমার প্রশিক্ষণও এ কাজ করতে বাধা দিচ্ছে। তবে আপনার অনুরোধ রাখব বলে ঠিক করেছি। জানিয়ে রাখি, আমরা ওই ফ্রিগেটের আধ মাইল দূর

দিয়ে যাব, তার চেয়ে কাছে যাব না। এবং, অ্যাশকেলন উপসাগরে আপনি যে ধরনের নিরাপত্তা দিয়েছেন, আশা করি লিবিয়ান ফ্রিগেট গোলা ফেলতে শুরু করলে ঠিক তেমনভাবেই রক্ষা করবেন আমাদেরকে।

আপনাকে সাহায্য করতে যতই চাই না কেন, এই জাহাজ এবং এর ক্রুদের নিরাপত্তা সবসময়েই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। আমার জীবনের বেশিরভাগ সময় পার করেছি মিডল ইস্টের বন্দরে, দেখেছি সন্ত্রাসীরা কীভাবে বদলে দিয়েছে ওই এলাকা; তবে আমার জাহাজের কিছু হোক তা আমি হতে দেব না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমার জাহাজ যদি খালি না থাকত, তেল দিয়ে ভরা থাকত ট্যাঙ্ক; এক কথায় আপনার অনুরোধ ফিরিয়ে দিতাম।

ভাল থাকুন। ক্যাপ্টেন জর্জ অ্যাডাম্‌স্।

ধন্যবাদ আপনাকে, মনে মনে বলল রানা।

পাশে এসে থেমেছে খোরশেদ নবী, নিচু স্বরে বলল, 'তা হলে খেলতে শুরু করেছি আমরা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওরা বুঝবার আগেই ঢুকে পড়ব ফ্রিগেটের ডিফেন্সের ভিতর। মাঝখানে থাকবে এইযি। ফ্রিগেটের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে নেব। ওরা ভাববে ওখানে রয়েছে একটা জাহাজ। পাশ কাটিয়ে যেতে দেবে। এইযি পেরিয়ে যাওয়ার আগে বুঝবেই না মার্ভেল ওদের অতটা কাছে চলে গেছে।'

কথা বলবার ফাঁকে টাইপ করছে রানা, এবার ই-মেইল করে দিল।

ক্যাপ্টেন জর্জ অ্যাডাম্‌স্, আপনি এবং আপনার ক্রুরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জীবন বাঁচাতে সাহায্য করছেন। সেজন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ধারণা করি, এ সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তীতে আপনাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মাননা দেয়া হবে।

তবে, আজ যা ঘটবে তা গোপন রাখতে হবে।

আমরা আপনাদের ব্রিজে অ্যালডিস লাম্পের আলো ফেললে বুঝবেন শুরু হচ্ছে কাজ। ধরে নিতে পারেন, আমরা তৈরি হব দশ মিনিট পর।

আবারও বলছি, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ক্যাপ্টেন মাসুদ রানা।

টেবিলের উপর রাশার তৈরি কোনি-ক্লাস ফ্রিগেটের স্কিম্যাটিক বিছিয়ে দিয়েছে রানা। সবাই চোখের সামনে দেখছে ইণ্টেরিয়র প্যাসেজগুলো। জলিল খান ও দশজন কমাণ্ডো মনোযোগ দিয়ে দেখছে সব। এরা প্রত্যেকে দক্ষ যোদ্ধা, নেমে পড়বে লিবিয়ান ফ্রিগেটে, হাসতে হাসতে প্রাণের ঝুঁকি নেবে। তবে রানার মনে হলো, সবচেয়ে ভাল হতো সোহেল, নিশাত ও স্বর্ণা এ কাজে সাথে থাকলে।

স্টারবোর্ডের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক হাজার ফুটি বিশাল জাহাজ এইযিকে। পানিতে পেট ভরে নিচু হয়ে গেছে মার্ভেল। সুপারট্যাঙ্কারের পেট একদম খালি, এত দূর থেকেও মনে হচ্ছে ওই জাহাজ আকাশ-সমান উঁচু। স্টার্নে অ্যাকোমডেশন ব্লক, আস্ত অফিস বিল্ডিঙের সমান। ভোঁতা চিমনি যেন দাঁড়িয়ে পড়া কোনও রেলরোড ট্যাঙ্ক কার।

'ঠিক আছে, সবাই ভাল মত দেখে নাও,' বলল রানা। 'ধারণা করছি ওরা প্রধানমন্ত্রীকে শেষ করতে চাইবে ক্রুদের মেসে। ...কারও কোনও নতুন আইডিয়া?'

'ক্রুদের মেস একমাত্র খোলামেলা জায়গা,' বলল জলিল খান। বাংলাদেশ আর্মি থেকে ওকে লিয়েন নেয়া হয়নি। গত বছর রানা এজেন্সিতে যোগ দিয়েছে। 'মাসুদ ভাই, যা কিছু ঘটবার, ওখানেই ঘটবে ।'

আপত্তি তুলল না কেউ।

সবার পরনে লিবিয়ান নেভির ইউনিফর্ম। আরেকবার জাদু দেখিয়েছে মেকআপ আর্টিস্ট মোফিজ বিল্লাহ্, মাত্র এক ঘণ্টায় সরবরাহ করেছে প্রয়োজনীয় পোশাক। বক্তিয়ার খিলজির ক্রুরা চট্ করে বুঝবে না দলে ঢুকে পড়েছে নতুন কেউ।

'কিন্তু জাহাজে কেন, মাসুদ ভাই,' হঠাৎ বলে উঠল কমাণ্ডো রিপন খন্দকার। 'মানে বলতে চাইছি, প্রধানমন্ত্রীকে শেষ করতে জাহাজে তুলতে হবে কেন?'

'কারণ জাহাজের ভিতর অংশ হয় প্রায় ত্রিকোণ, কোথা থেকে সিগন্যাল ব্রডকাস্ট করা হলো, বোঝা খুব কঠিন,' বলল রানা। 'তারপরও যদি বোঝা যায়, জাহাজ চলে যাবে বহু দূরে। কেউ সঠিক জায়গায় পৌঁছলে দেখবে ফাঁকা সাগর।' মেইন ডেকের অ্যামিডশিপ হ্যাচের উপর আঙুল তাক করল রানা। 'আমরা এখান দিয়ে ফ্রিগেটে ঢুকব। দুটো দরজা পেরুব, ডানদিকের সিঁড়ি বেয়ে নামব একতলা। তারপর বামে, ডানে, তারপর আবারও বামে যেতে হবে। সামনে পড়বে ক্রুদের মেস। ...কারও কোনও প্রশ্ন?'

'ওখানে নাবিকদের অনেকে থাকবে,' আন্দাজ করল রিপন।

'হতে পারে,' বলল রানা। 'তবে যে মুহূর্তে আমরা কাজ শুরু করব, তারা চলে যাবে চারদিকে। ফাঁকা হয়ে যাবে হলওয়ে। তারপরও যারা মেস হলে থাকবে, ধরে নিতে পারো তারা জঙ্গি। সত্যিকারের ক্রুরা থাকবে ব্যাটল স্টেশনে। আমরা জঙ্গিদেরকে শেষ করব, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে আসব উপরের ডেকে। আমরা ওখানে আছি তা কেউ বুঝবার আগেই ফিরব মার্ভেলে।'

কেউ কিছু বলছে না। প্রত্যেকে গম্ভীর। ওরা জানে কিছুক্ষণের মধ্যে মরতে হতে পারে।

'আমাদের এই পরিকল্পনায় একটা খুঁত আছে,' একটু দ্বিধা নিয়ে বলল নবী। 'আমাদের কোনও একযিট স্ট্র্যাটেজি নেই।

আমরা সরে এলেই হামলা করবে ফ্রিগেট। কাজেই আমাদের দলকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। স্যাচেল চার্জ নিয়ে ফ্রিগেটে নামবে একটা টিম। বোমা ফাটিয়ে দুর্বল করে দিতে হবে জাহাজটাকে।'

সবার উপর চোখ বোলাল রানা। 'কারও কোনও প্রশ্ন?'

আবারও চুপ থাকল সবাই।

'তোমরা আরও মনোযোগ দাও,' বলল রানা, 'নবীর ওই প্ল্যানে স্যাচেল চার্জ নিয়ে যারা নামবে, তাদেরকে শুরুতেই শেষ করে দেবে ফ্রিগেটের প্রাইমারি ওয়েপন্স সিস্টেম।' স্কিম্যাটিক আবারও দেখাল রানা। 'সুপারস্ট্রাকচারের চার কোনা থেকে আসবে .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগানের গুলি। আমরা সামনের মেশিনগান দুটো দেখব। ধরলাম উড়িয়ে দেয়া গেল, কিন্তু দূরের দুটো রয়েই গেল; জাহাজই রক্ষা করবে ও-দুটোকে। তার মানে, আমাদেরকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলবে।'

'ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ কপ্টার নিয়ে উঠলে?' বলল জলিল। 'উনি ওই দুই মেশিনগানের উপর মিসাইল ফেলতে পারেন।'

'স্যাম মিসাইল পুরো কাভার দেবে ফ্রিগেটকে,' আপত্তির সুরে বলল নবী। 'ক্যাপ্টেন সিরাজ ভিড়তেই পারবেন না কাছে।'

'তা হলে আমরা কী করব?' বলল রিপন।

পরস্পরের দিকে চাইছে কমাণ্ডোরা।

ন্যাভাল ড্রয়িং গুটিয়ে ফেলল রানা। ওটার নীচ থেকে বেরুল লিবিয়ান উপকূলের মানচিত্র। মার্ভেল থেকে দক্ষিণের সাগর দেখানো হয়েছে। দশ মাইল পশ্চিমের এক জায়গায় টোকা দিল রানা। 'এটাই সব।'

জুলজুল করে চেয়ে রইল নবী। জলিল ও তার দলের সবাই মানচিত্র দেখছে। আধ মিনিট পর পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল জলিলের মুখে। 'ঠিক, মাসুদ ভাই!'

'দারুণ ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া!' বলল নবী।

সবার উপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। 'তোমাদের পছন্দ হয়েছে?'

ঘনঘন মাথা দোলাল ওরা।

মৃদু হাসছে ক্যাপ্টেন নবী। 'আমরা এজন্যই হামলা পিছিয়ে দিয়েছি দশ মিনিট?'

'ওরা আরও কাছে যাক, নইলে আমাদের প্ল্যান কাজ করবে না,' বলল রানা।

হাসতে শুরু করেছে সবাই।

'আর কোনও কথা নেই তো?' বলল রানা।

মাথা নাড়ল সবাই।

'তা হলে চলো, সবাই পজিশনে চলে যাই।'

'আমরা ওদেরকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দেব,' বলল জলিল খান। পরক্ষণে জিভ কাটল, পচা কথা বলে ফেলেছে মাসুদ ভাইয়ের সামনে। লজ্জায় লাল হয়ে গেল তার গাল।

নবী ফিরে চলল অপারেশন্স সেন্টারে। তার কাজ জাহাজ থেকে হামলা করা।

অন্যরা নকল ব্রিজ থেকে বেরুল, সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল মেইন ডেকে। সবার পিছনে নামছে রানা। ভাবছে, আমরা বাঘের গুহার ভিতর ঢুকছি, আর বাঘও বসে আছে ভিতরে। জঙ্গিরা যদি বোঝে কী করতে চাই, দেরি না করে খুন করে ফেলবে প্রধানমন্ত্রীকে। সেক্ষেত্রে এত ঝুঁকি নিয়েও কিছুই করতে পারব না, বাঁচানো যাবে না তাঁকে।

ক্যাপ্টেন জর্জ অ্যাডাম্‌স্‌কে সিগন্যাল দিতেই বিশাল জাহাজের কোর্স বদলে নিলেন তিনি, এখন চলেছেন দক্ষিণে, লিবিয়ান ফ্রিগেটের দিকে। খুব সাবধানে সরে গেছেন আগের কোর্স থেকে, কোনও সতর্কবাণীও দেয়া হয়নি ফ্রিগেটকে।

দেখতে না দেখতে দুই জাহাজের মাঝের দূরত্ব কমল। আগের হিসাব অনুযায়ী ফ্রিগেট থেকে পাঁচ মাইল দূরত্ব রেখে চলবার কথা, কিন্তু সুপারট্যাঙ্কারের গতি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, চেপে এল ওটা ফ্রিগেটের দিকে।

লিবিয়ান রণতরী থেকে দুই মাইল উত্তরে, এক মাইল পিছনে চলে এসেছে সুপারট্যাঙ্কার। তখনও চুপ রইল দুই জাহাজের রেডিও। পোর্টেবল হ্যাণ্ডসেট নিয়ে গানওয়েলের ছায়ায় অপেক্ষা করছে রানা, পাশেই দলের সবাই। দিগন্তে ডুবতে শুরু করেছে সূর্য। সারাদিনের চাঁদি ফাটানো গরম কমে আসছে। তবে ডেক এখনও তপ্ত, স্পর্শ করলে চমকে যেতে হয়।

'লিবিয়ান নেভির বক্তিয়ার খিলজি থেকে ট্যাঙ্কার, আপনারা আমার স্টার্নের খুব কাছে চলে এসেছেন। নিরাপদে যেতে হলে সরে যেতে হবে আপনাদেরকে। বদলে নিন কোর্স, পিছন থেকে সরে যান, নইলে সংঘর্ষ হতে পারে।'

'বক্তিয়ার খিলজি, আমি জর্জ অ্যাডাম্‌স্‌, ইউএলসিসি এইযির ক্যাপ্টেন,' নরম স্বরে বললেন এইযির ক্যাপ্টেন। কেন যেন কল্পনায় রানা দেখল, ভদ্রলোক ছয় ফুট দুই ইঞ্চি, মাথাটা ডিমের মত, পুরোপুরি ছেলা। 'আমরা জোয়ালো ভাটার ভিতর পড়েছি। এইমাত্র আমাদের রাডার কাজ শুরু করেছে। আশা করি ঠিক সময়ে সরতে পারব।'

'ভাল,' কড়া স্বরে বক্তিয়ার খিলজি থেকে জানানো হলো। 'আপনাদের সমস্যা বাড়লে আমাদেরকে জানাবেন।'

রানার শিখিয়ে দেয়া সংলাপ বলেছেন এইযির ক্যাপ্টেন, এবং এখন পর্যন্ত সব ঠিক চলছে। ফ্রিগেটের দিকে যেতে থাকবেন অ্যাডাম্‌স্‌, আরও সময় পাইয়ে দেবেন রানাকে।

দশ মিনিট পেরুল, আগের গতি বজায় রেখে চলেছে বক্তিয়ার খিলজি, সুপারট্যাঙ্কারও গতি কমায়নি। ফ্রিগেটের আধ মাইল পাশ

দিয়ে চলেছে এইযি। রানা ভাবল, অনেক আগেই যোগাযোগ করবার কথা ফ্রিগেটের, কিন্তু তা করেনি। এটা ওদের জন্য সুবিধা এনে দিতে পারে।

'এইযি, এইযি, বক্তিয়ার খিলজি থেকে বলছি,' পেশাদার, শীতল স্বরে বলা হলো। 'এখনও সমস্যা চলছে?'

'এক মিনিট,' রেডিও করলেন ক্যাপ্টেন, আরও সময় নিতে চাইছেন।

তারপর পাঁচ মিনিট পেরুল, তারপর আবারও যোগাযোগ করা হলো ফ্রিগেট থেকে। এবার কণ্ঠে তাগাদা।

'দুঃখিত, আগেই যোগাযোগ করা উচিত ছিল। ভাটা আরও বেড়েছে। তবে আমরা টান থেকে বেরিয়ে আসছি।'

'আপনার বলা ওই ভাটার টানের কিছুই টের পাইনি আমরা।'

'তার কারণ আমার জাহাজের কিল চল্লিশ ফুট নীচে। তা ছাড়া, এই জাহাজ চওড়ায় তিনটে ফুটবল মাঠের সমান।'

এইযি, বাপ্, এইতো, চমৎকার হচ্ছে; মনে মনে বলল রানা।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছে ওর। অ্যাডাম্স্ নিজেই একটু পর যোগাযোগ করবেন। দু'মিনিট পেরুল, তারপর বললেন তিনি, 'বক্তিয়ার খিলজি, এইযি থেকে বলছি। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি: আমাদের স্টিয়ারিং গিয়ার নষ্ট হয়েছে। আমি ইঞ্জিনিয়ারদের এখনই থামতে বলছি। তবে যে গতি তুলে চলেছি, তাতে কয়েক মাইল লাগবে থামতে। ক্যালকুলেট করেছি, আপনাদের পোর্ট বিম থেকে আধ মাইল দূর দিয়ে যাব। কাজেই অনুরোধ করছি, আপনারা কোর্স ও গতি পাল্টে নিয়ে এগুতে থাকুন।'

থামছে না সুপারট্যাঙ্কার, একই গতি তুলে ছুটছে। ফ্যানটেইলে পানি ছিটকে তুলছে একমাত্র প্রপেলার, ওখানে যেন ঝড় চলছে। মৃদু হেসে ফেলল রানা। ওর সংলাপে এটা ছিল না।

নিজ থেকেই ঝুঁকি নিয়েছেন ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন। চাইছেন মার্ভেল আরও কাছে পৌঁছে যাক ; মনে মনে শপথ করল রানা, এই কাজ শেষ হলে ওই লোককে খুঁজে বের করবে, দুনিয়ার সেরা ড্রিঙ্ক কিনবে তার জন্য।

বাঁক নিতে শুরু করেছে বক্তিয়ার খিলজি, জলদি গতি তুলতে চাইছে। তবে এখন যথেষ্ট গতি নেই, কাজেই দ্রুত সরতে পারবে না। সুপারট্যাঙ্কার খাটো করে দিয়েছে লিবিয়ান রণতরীকে, পাশ কাটিয়ে চলেছে আঠারো নট গতি তুলে। দুই জাহাজের ভিতর মাত্র পাঁচ শ' গজ দূরত্ব।

রানা টের পেল মার্ভেলের ডেক মৃদু কাঁপতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী পাম্পগুলো স্যাডল ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক থেকে বের করে দিচ্ছে সাগরের পানি। বাড়তে শুরু করেছে গতি।

হেলম-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিনসেন্ট গগল, রানার মতই সে-ও শুনেছে এইযির ক্যাপ্টেনের বক্তব্য। একবার কাত হয়ে ওয়েপন্স কন্সোলের দিকে চাইল। ওখানে জ্বলজ্বল করছে বেশ কিছু বাতি। জাহাজের বাইরের বেশ কিছু দরজা গুটিয়ে নেয়া হয়েছে, বেরিয়ে এসেছে সব ধরনের অস্ত্র।

পাম্প জেট থামিয়ে দিল গগল, পরক্ষণে রিভার্স করল প্রচণ্ড স্রোত। বো-র দুই টিউবের ভিতর বিস্ফোরিত হলো পানি। এত দ্রুত গতি কমল মার্ভেলের, খানিকটা উপরে উঠে গেল স্টার্ন। এইযির আড়াল থেকে ছিটকে বেরুল ফ্রেইটার। রিভার্স থামিয়ে দিল গগল, পূর্ণ গতিতে সামনে বাড়ছে। ক্রাইয়োপাম্পগুলো এক শ' ডিগ্রির বেশি নীচে রাখল ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনকে, ফলে জেটগুলো পাগল হয়ে উঠল শক্তি পাওয়ার জন্য।

রেসের ঘোড়ার মত ছুটল মার্ভেল, বাঁক নিয়ে বেরুল সুপারট্যাঙ্কারের আড়াল থেকে। সামনে দেখা গেল ধূসর রঙের লিবিয়ান ফ্রিগেট।

মার্ভেলের সবাই চেয়ে রইল রণতরীর দিকে। নিশ্চয়ই ওই জাহাজের ব্রিজে চমকে গেছে সবাই। কোনও সতর্কবাণী ছাড়াই কোত্থেকে এল এ-জাহাজ? আর ছিলই বা কোথায়? সুপারট্যাঙ্কার একবারও বলেনি এত কাছে অন্য কোনও জাহাজ ছিল!

হ্যাঁ, থমকে গেছে ফ্রিগেটের সবাই। তিরিশ সেকেণ্ড লাগল তাদের সামলে নিতে। তারপর রেডিও চালু হলো, জবাবদিহি চাইছে, সেইসঙ্গে চলল হুমকি।

'এখুনি জানাও জাহাজের নাম কী, নইলে ফায়ার ওপেন করব!'

দ্বিতীয়বারের মত একই কথা বলা হলো। গগল ধারণা করল, তৃতীয়বার কথা বলতে গিয়ে সময় নষ্ট করবে না ফ্রিগেটের ক্যাপ্টেন। এখনও অনেকখানি দূরে বক্তিয়ার খিলজি, কাজেই মার্ভেলের উপর ফেলতে পারবে তিন ইঞ্চি কামানের গোলা। একবার গগলের মনে হলো তুলে নেবে হ্যাণ্ডসেট, বলবে আমরা দ্য মার্ভেল অভ গ্রিস। কিন্তু এখন কিছু বলে লাভ হবে না।

মনিটরে গগল দেখল তুলার একটা বল ছিটকে উঠেছে। ওটা যেন মেঘের মত ছড়িয়ে পড়ছে। বক্তিয়ার খিলজির সামনের কামান গোলা ছুঁড়েছে। মার্ভেলের বো-র উপর দিয়ে গেল গোলা, পঞ্চাশ ফুট গিয়ে সাগরে পড়েই বিস্ফোরিত হলো। জাহাজের উপর দিয়ে বয়ে গেল কংকাশন।

'প্রথমটা সতর্ক করার জন্য, রানা,' জানাল গগল। 'দ্বিতীয়টা পড়বে মার্ভেলের উপর।'

বক্তিয়ার খিলজির পিছনের কামান গর্জে উঠল। গোলা এসে পড়ল উইং ব্রিজে, পুরো জায়গাটা উড়িয়ে নিয়ে গেল।

সিট থেকে লাফ দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো গগলের। 'ব্যস্, যথেষ্ট! নবী, ফায়ার অ্যাট উইল!'

দুই জাহাজের মাঝের আকাশ ভরে গেল গুলি ও গোলা

দিয়ে। চালু হয়ে গেছে মার্ভেলের ৩০এমএম গ্যাটলিং গান। গর্জে উঠল বোফোর্স অটোক্যানন। ব্যারালের মুখ থেকে ছিটকে বেরুতে লাগল কমলা আগুনের জিভ। লিবিয়ান ফ্রিগেটের মেইন ব্যাটারির সঙ্গে সঙ্গত শুরু করেছে অ্যান্টিক্রাফট গানগুলো। প্রতি মিনিটে চারটে করে ক্লিপ খালি করছে।

প্রতি আঘাতে ঘণ্টির মত বাজতে লাগল মার্ভেল। এএএ রাউণ্ড ফুটো করছে খোল, থামছে গিয়ে পরের বাল্ক্‌হেডে লেগে। ডেকের কামানগুলোর রাউণ্ড ছিন্নভিন্ন করছে সব।

এরইমধ্যে তিনটে কেবিন বিধ্বস্ত হয়েছে। ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের দেয়াল থেকে মার্বেলের স্ল্যাব পড়ছে গিয়ে সুইমিং পুলে। প্রতিটি গোলা সামনে যা পাচ্ছে, ধ্বংস করছে। সিনিয়র স্টাফ বোর্ডরুমে সরাসরি গোলা লাগল। উল্টে পড়ল আড়াই শ' কেজি ওজনের টেবিল। ছিটকে পড়ল চামড়া মোড়া চেয়ারগুলো, সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল আগুন।

একইসঙ্গে আধ ডজন জায়গায় কাজ শুরু করল অটোমেটেড ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে আগুন নেভাতে। ফায়ার টিমগুলোকে আগেই বলে দেয়া হয়েছে, অন্য ক্রুদের সঙ্গে তারাও জাহাজের আরেক পাশে থাকবে, ডুয়েল শেষ না হওয়া পর্যন্ত বেরুবে না।

লিবিয়ান ফ্রিগেটের গোলাবর্ষণের জবাবে পাল্টা জবাব দিচ্ছে মার্ভেল। বক্তিয়ার খিলজির ব্রিজের সমস্ত জানালা উড়ে গেছে, টাংস্টেনের রাউণ্ড যেখানেই ঢুকছে, বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে ন্যাভিগেশন ও স্টিয়ারিং ইকুইপমেন্টের। আর্মার্ড দেহের এখানে ওখানে লেগে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে বুলেটগুলো। গ্যাটলিং গানের বুলেটের তোড়ে থরথর করে কাঁপছে লাইফবোট, দূর থেকে মনে হলো ওটা আহত ইঁদুর, ওটাকে চোয়ালের ভিতর ভরে ঝাঁকিয়ে চলেছে টেরিয়ার কুকুর। গ্যাটলিং গান ওখান থেকে সরে গেল,

অজস্র ফুটো নিয়ে একজোড়া পুলি থেকে দুলতে লাগল লাইফবোট।

টারেটগুলোকে ভেদ করতে পারবে না ছোট ক্যালিবারের বুলেট, কাজেই খোরশেদ নবী চালু করল বো-র সামনের ১২০এমএম কামান। ওটার স্টেবিলিটি কন্ট্রোল সিস্টেম এম১এ২ ব্যাটল ট্যাঙ্কের সমকক্ষ, নিখুঁত ভাবে লক্ষ্যভেদ করে। খিলজির ডেকের সঙ্গে যেখানে মিশেছে টারেট, সেখানে লাগল কামানের প্রথম রাউণ্ড। গোটা জিনিসটা লাফ দিয়ে পাঁচ ফুট উপরে উঠেই আবার ধপ্ করে পড়ল। কামানের ব্যারেল থেকে তখনও তেলতেলে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

পরস্পরের উপর হামলা করছে দুই জাহাজ। প্রচণ্ড আঘাত সইতে তৈরি করা হয়েছে ওগুলোকে। মার্ভেল ও বক্তিয়ারের মাঝখানের সাগর সরু হয়ে গেছে। আরও কাছে চলে এল দুই জাহাজ। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে আর নিশানা করতে হচ্ছে না তাদের, কামানের ব্যারেল থেকে বেরুতে না বেরুতে আঘাত হানছে গোলা।

গত এক শতকে কেউ এ ধরনের ন্যাভাল ওয়ারফেয়ার দেখেনি। আর দেখবেও না।

রানা ও তার দল দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট একটা রেলিঙের অংশে। ওই জায়গা তিনগুণ রিইনফোর্সড, তবে ৩০এমএম অটোক্যাননের মুখে ওদের মনে হলো, ওরা সবাই দিগম্বর শিশু। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে থরথর করে কাঁপছে সবাই।

এ ধরনের যুদ্ধে জড়াতে হবে, কেউ ধারণা করেনি। তবে রানা জানে, এ ছাড়া উপায় নেই ওদের। টেকনোলজি ওয়ারফেয়ারকে ভদ্রোচিত করেছে, দূর থেকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা ও ধ্বংস ডেকে আনা যায়। একটা বাটন টিপে শেষ করে দাও তোমার শত্রুকে। কিন্তু ওরা এখন লড়ছে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের

যুদ্ধ। শত্রুদের বুক থেকে উথলে ওঠা প্রবল ঘৃণা টের পাচ্ছে রানা। প্রতিটা গোলা যেন একেকটা ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল।

বুকের মাঝে রানা টের পেল, লিবিয়ান জঙ্গিরা ওদেরকে মৃত দেখতে চাইছে। শুধু তা-ই নয়, উড়িয়ে দিতে চাইছে ওদের লাশটাও। যেন কখনও পৃথিবীতেই ছিল না ওরা।

আর্মার্ড প্লেটে এসে লাগল আরেকটা গোলা। রানার মনে হলো, ওর দেহের ভিতর সব তরল হয়ে গেছে। কান নেই, হাত নেই, পা নেই, ও যেন একটা জেলিফিশ। এক মুহূর্তের জন্য ওর মনে হলো, মস্ত ভুল করে ফেলেছি!

পরক্ষণে ভাবল, না, ভুল করিনি। কেউ না থামালে, কখনও থামবে না এই জঙ্গিরা, বহু মানুষের প্রাণ নেবে। যুক্তি বলতে এদের কিছু নেই। এরা মানুষ নয়, মানুষের মত দেখতে সাক্ষাৎ একেকটা পিশাচ!

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেল ওরা। থরথর করে কাঁপতে লাগল মার্ভেল। বক্তিয়ার খিলজির পাশে ধাক্কা দিয়েছে ওদের জাহাজ। গগল ব্যালাস্ট ঠিক করেছে, দুই জাহাজের রেলিং এখন সমান উচ্চতায়। কম্প্যাক্ট মেশিন পিস্তল বের করল রানা, পরক্ষণে রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়ল বক্তিয়ার খিলজির ডেকে।

ওর মাথার আধ ফুট উপর দিয়ে গেল আরপিজি। নিজের পোড়া চুলের গন্ধ পেল রানা। বক্তিয়ার খিলজির স্টার্নে রিয়ার টারেটের পিছন থেকে রওনা হয়েছে রকেট। সোজা গিয়ে লাগল রিইনফোর্সড রেলিঙের উপর। ওর দলের এগারোজন এইমাত্র রেলিং টপকাতে শুরু করেছে। গ্রেনেডিয়ারের ইচ্ছা পূরণ হলো, ছিটকে পিছিয়ে গেল পাঁচ কমাণ্ডো। রক্তাক্ত, আহত এবং অচেতন। রেলিং পেরিয়ে ফ্রিগেটে পৌঁছুল মাত্র চারজন, তাদেরও লড়বার সাধ্য নেই। ঘোরের ভিতর চলে গেছে, জানেই না কোথায় আছে। দু'জন ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে জাহাজ থেকে।

দুই জাহাজের মাঝে সামান্য সরু সাগর তৈরি হয়েছে, ওখানে পড়ল কি না, বোঝা গেল না।

ক্লোজড্ সার্কিট টেলিভিশনে সবই দেখেছে গগল, দেরি না করে মার্ভেলকে সরিয়ে নিতে লাগল। মনে মনে আশা করছে, ওই দুই কমাণ্ডো টুথ পেস্টের মত চেপ্টে যায়নি। দ্রুত নির্দেশ দিল গগল। বোট গ্যারাজে অপেক্ষা করছে রেসকিউ টিম, তারা সঙ্গে সঙ্গে যোডিয়াক নামাল সাগরে।

এক টেকনিশিয়ান জয়স্টিক নেড়ে সরিয়ে নিল ক্যামেরা, স্ক্যান করতে লাগল বক্তিয়ার খিলজির ডেক।

'ওই যে ও!' বলে উঠল গগল।

রেলিঙের পাশে বসে পড়েছে আহত কমাণ্ডোরা। আরেকটু সামনে মাসুদ রানা, হাতে হেকলার অ্যাণ্ড কচ মেশিন পিস্তল। ব্যারেলের মুখ থেকে ধোঁয়া উঠছে। যে লোক রকেট লঞ্চার রিলোড করছে, বুকে বুলেট খেয়ে ছিটকে পড়ল সে। গগলের মনে হলো, রানা যেন জানে ওর উপর স্থির হয়েছে ক্যামেরা। একবার এদিকে চাইল, তারপর ছুটতে শুরু করল। ওর লক্ষ্য ফ্রিগেটের হ্যাচওয়ে।

বিশ

চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামাল, দেখছেন দূরে সোফায় বসে আছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। বেয়ারা গিয়ে শ্যাম্পেইন দিতে চাইল তাঁকে, তবে মাথা নেড়ে বারণ

করলেন তিনি। অ্যাম্বাসেডার নিজেও ড্রিঙ্ক নেননি। একটু দূরে মেয়ে বিষয়ে নোংরা কৌতুক শুনিয়ে চলেছেন আমেরিকান ভাইস-প্রেসিডেন্ট। প্রেসিডেন্ট অসুস্থ থাকায় তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে এসেছেন ইনি। কাছের ডিগনিটরিরা ভদ্রতার খাতিরে হাসির ভঙ্গি করছেন।

চমৎকার রিসেপশন হল ঘুরে দেখতে রওনা হয়ে গেলেন অ্যাম্বাসেডার। পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে আলীর বাড়িটা প্রকাণ্ড, মরুভূমির ভিতর মরূদ্যানের মত। মুরিশ ঢঙে তৈরি পাথরের এই বাড়ি যেন নিচু দুর্গ একটা। পোর্ট-কোশেয়ার থেকে নানাদিকে যাওয়া যায়, ওঠা যায় তিনতলা ছাতের উপর। দোতলা ও তৃতীয় তলায় রট-আয়ার্নের বুল্যাস্টার রাজকীয়। বিশ ফুট চওড়া সিঁড়ি নেমে এসেছে একতলায়। মাঝ ল্যাণ্ডিঙে বসানো হয়েছে অর্কেস্ট্রা, ওখান থেকে দু'দিকে গেছে সিঁড়ি। মিউজিশিয়ানরা ক্লাসিকাল অ্যারাবিক মিউজিক বাজিয়ে চলেছে।

বাড়িটা প্রকাণ্ড ও রাজকীয়, কিন্তু আজ যাঁরা এখানে এসেছেন, তাঁদের মহা গুরুত্বের কারণে গুরুত্ব চাপা পড়ে গেছে ওটার। যেদিকে চোখ পড়ছে কামালের, দেখছেন কমপক্ষে আট-দশজন প্রেসিডেন্ট। তাঁদের পরনে অভিজাত পোশাক। এক কোণে অদ্ভুত সুন্দর আলোয় বউ সেজেছে পটে রাখা এক পাম গাছ। ওখানে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগত আলাপ সারছেন লেবাননের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। প্রকাণ্ড ঘরের আরেকদিকে গল্প করছেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ও ইরানের ফরেন মিনিস্টার।

লিবিয়ান এ রিসেপশনে এঁরা ভদ্রতা বজায় রেখে আলাপ করবেন, তা জানেন কামাল, এঁরা রাজনীতিক ও কূটনীতিক। তবে কামালের মনে হলো, আজ এই অনুষ্ঠানে সবাই যেন একটু বেশি আন্তরিক। এ ঘরে যেন মেঘের মত ভাসছে পুঞ্জ পুঞ্জ আশা, সফল হবে ত্রিপোলির এই শান্তি মহাসম্মেলন।

দূর থেকে সবার কণ্ঠ গুঞ্জনের মত আসছে। এক পলকের জন্য আত্মবিশ্বাস হারালেন কামাল। প্রথম কথা, আগে আজ রাতে বেঁচে থাকতে হবে এই মানুষগুলোকে! তারপর না শান্তি।

সবচেয়ে বেশি ডিগনিটরি জড় হয়েছেন লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে আলীকে ঘিরে। বলকে ওঠা এক মোজাইক টাইল্‌ড্‌ ফোয়ারার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। হাতের গ্লাস একটু নাড়লেন, অ্যাম্বাসেডার কামালকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি দেখেছেন। আস্তে করে মাথা নাড়লেন, যেন নীরবে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি দুঃখিত যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁদের মাঝে নেই।

আজকের সবচেয়ে আলোচিত প্রসঙ্গ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। কামালকে জানানো হয়েছে, আজ ইউনিফর্মের বদলে সিভিলিয়ান পোশাক পরবেন প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি, এবং বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিষয়ে। জানানো হবে, তাঁরা সবাই দুঃখিত যে উনি আজ তাঁদের ভিতর নেই।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও অ্যাম্বাসেডার নাহিদ কামালের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বিসিআই-এর দুর্ধর্ষ এজেন্ট সলীল সেন। চমৎকার টুক্সেডো পরেছে। এখানে ঢুকবার সময়ে ইশারায় সলীল দেখিয়েছে সংযুক্ত লিভিংরুমের সিলিঙে রয়েছে ভিডিও ক্যামেরা।

ঘুরে ফিরে এইমাত্র অ্যাম্বাসেডারের পাশে এসে দাঁড়াল সলীল। বাংলায় বলল, 'এ পর্যন্ত পাঁচটা দেখলাম।'

'সিকিউরিটির জন্য?' জানতে চাইলেন কামাল।

'এখনও জানি না। তবে কাজ করছে ওগুলো। হামলা হলে সব রেকর্ড হবে। আরও দেখলাম লিভিংরুমে টেম্পরারি ভাবে প্লাজমা টেলিভিশন বসানো। কার্পেটের নীচ দিয়ে যায়নি ওয়ায়ার, টেপ দিয়ে আটকানো রয়েছে মেঝের সঙ্গে। প্রত্যেকে দেখতে

পাবে প্রধানমন্ত্রীর গর্দান নেয়ার দৃশ্য। সবাই যখন জড় হবে টিভির সামনে, আমার ধারণা, ঠিক তখনই হামলা হবে। দু'ধরনের পারফর্মেন্সের আয়োজন হয়েছে। দেখলাম, টিভির পাশেই রাখা টু-ওয়ে ওয়েবক্যাম।'

'সত্যিই এসব ঘটবে, মিস্টার সেন? বিশ্বাস হতে চায় না।'

'ওরা পরিকল্পনা সফল করতে চাইবে। আপনাকে আগেই জানিয়েছি, আমরা কী করতে চলেছি।'

'আপনারা জানবেন কী করে কারা সত্যিকারের সিকিউরিটি গার্ড, আর কারা জঙ্গি?' বললেন কামাল।

'জঙ্গিরা এখনও বাইরে। যারা এ পরিকল্পনা করেছে, তারা ভাল করেই জানে, জঙ্গিরা ভিতরে ঢুকলে বেশিক্ষণ কাভার নিয়ে থাকতে পারবে না।' কাঁধ ঝাঁকাল সলীল। ওর চোখ চলে গেছে আরেক দিকে। গেস্টদের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন লিবিয়ান এজেন্ট।

সবার উপর মাথা তুলতে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠলেন প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি, হাতে দেখা গেল ওয়ায়ারলেস মাইক্রোফোন। অর্কেস্ট্রা থেমে গেল, ঘুরে চাইলেন ডিগনিটরিরা। এখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু বিষয়ে কিছু কথা বলবেন লিবিয়ান প্রেসিডেন্ট।

এঁরা সবাই জানেন, লম্বা বক্তৃতা দেন লিবিয়ান নেতা। দশ মিনিট মনোযোগ দিয়ে শুনলেন কামাল, তারপর বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে চাইলেন। এয়ারকণ্ডিশ্‌ড্‌ কামরাতেও সুটের ভিতর দরদর করে ঘামছেন তিনি। দু'বার রুমাল বের করে হাত পরিষ্কার করলেন। এখন যদি সুট খুলে ফেলেন, দেখা যাবে ঘামে ভিজে গেছে গোটা শার্ট।

চট্‌ করে সলীল সেনের দিকে চাইলেন তিনি। লোকটা কি পাথর দিয়ে তৈরি? একদম নিশ্চিন্ত কেন চেহারা!

বদ্ধ গুহার নিকষ আঁধারে অস্ত্রের ম্যাগাজিন বদলে নিল সোহেল, স্বর্ণা ও রায়হান। স্বর্ণা জানাল, ওর হার্নেসে রইল মাত্র দুটো ম্যাগাজিন। ব্যথায় দপ-দপ করছে ওর আহত কাঁধ। শুশ্রূষা করবার সময় মেলেনি। ডান হাতের আঙুলগুলো চটচট করছে রক্তে।

অনেকটা দূর থেকে ছুঁড়ে দেয়া হলো গ্রেনেড। গানওয়েলের একটু নীচে লেগে বালির উপর পড়ল ওটা। জাহাজের খোলের কারণে বিস্ফোরণের আওয়াজ চাপা শোনাল, তবে জাহাজ দশ ডিগ্রি কাত হয়ে গেল পিয়ারের দিকে। শুকনো কাঠে সহজেই ধরে গেল আগুন, লাল জিভ দিয়ে চাটছে খোল। ওদিকে গিয়ে নেভাতে পারবে না ওরা, পরস্পরের দিকে চাইল।

'আগুন আরও বাড়লে টোস্টবিস্কুট হয়ে যাব আমরা,' মন্তব্য করল রায়হান।

মৃদু আলোয় এখনই দেখা যাচ্ছে কমপিউটার বিশেষজ্ঞকে। তিক্ত হয়ে গেল সোহেলের মন। ঠিকই বলেছে রায়হান। ওরা এতক্ষণ টিকেছে শুধু আঁধারের সুবিধা পেয়ে। এখন আরও বাড়ছে আগুন, সে আলো ছড়িয়ে পড়বে গুহার ভিতর। বাড়তি সুবিধা পাবে জঙ্গিরা। জরুরি প্রশ্ন হয়ে উঠেছে: ওরা কি এখানে অপেক্ষা করবে, আশা করবে ভাল কিছু হবে? এমন কিছু যে-কারণে পালাতে বাধ্য হবে জঙ্গিরা? কিন্তু তেমন কিছু ঘটবার কোনও কারণ নেই। ওদের বোধহয় এখনই পিছিয়ে যাওয়া উচিত। খুঁজে বের করা উচিত এই ফাঁদ থেকে বেরুবার কোনও পথ।

আর কোনও উপায় নেই, দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল সোহেল। 'ঠিক আছে, স্বর্ণা, রায়হান, আমি কিছুক্ষণের জন্য কাভার ফায়ার দেব। তোমরা স্মৃতিকে নিয়ে নেমে পড়বে পিয়ার থেকে। কোনও ডিফেন্সিভ পজিশন খুঁজে নেবে। আশা করি, তিরিশ সেকেণ্ড

কাভার দিতে পারব। ওদেরকে আটকে রাখব, তারপর ঝেড়ে দৌড় লাগাব তোমাদের পিছু পিছু।'

ভাল লাগছে না সোহেল ভাইয়ের কথা, নিজের জীবন নিয়ে খেলবেন উনি, চাপা শ্বাস ফেলল স্বর্ণা। একবার আপত্তি তুলতে গিয়েও থেমে গেল। সব বুঝেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উনি।

জলদস্যু তরীর রেলিঙের পাশে তৈরি হয়ে নিল ওরা। এখনও খুব ভাল করে আগুন ধরেনি কাঠে, আবছা আলোয় বিধ্বস্ত দরজা চোখে পড়ল না। তবে দশ-পনেরো ফুট পরিষ্কার দেখা গেল। দৃষ্টির শেষ সীমায় হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এক জঙ্গি। বুকের নীচে জমেছে কালো রক্ত।

'ফায়ার!' নির্দেশ দিল সোহেল। পাথরের স্তূপ লক্ষ্য করে এক নাগাড়ে গুলিবর্ষণ শুরু করল ওরা। যে পথে এদিকে এসেছে, সেদিক থেকে কাউকে আসতে দেবে না।

অস্ত্রের ম্যাগাজিন খালি হতেই লাফ দিয়ে উঠল স্বর্ণা ও রায়হান, খপ করে স্মৃতির দুই বাহু ধরে পেরিয়ে গেল রেলিং, নেমে পড়ল পিয়ারে। ওখান থেকে পড়তে পড়তে সামলে নিল স্মৃতি। শক্ত করে ওর হাত ধরেছে রায়হান, নইলে আহত হাত নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত মেয়েটা। রেলিঙের পিছনে দাঁড়িয়ে আঁধারে গুলি করছে সোহেল, আটকে রাখতে চাইছে জঙ্গিদেরকে।

রায়হান ও স্মৃতিকে নিয়ে এগুতে শুরু করেছে স্বর্ণা। প্রত্যেকে কুঁজো হয়ে হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়েক সেকেণ্ড পর গুহার দেয়াল পেয়ে গেল স্বর্ণা। দশ ফুট যেতেই ডানদিকে বাঁক নিল দেয়াল। পায়ের নীচে অমসৃণ হয়ে উঠল মেঝে। পাথরে হাত রেখে এগুতে পারছে না স্মৃতি। তবে পিছন থেকে ওর কাঁধ ধরে পরিচালনা করল রায়হান।

অন্ধ ফকিরের মত দেয়াল ধরে পঁচাত্তর ফুট এগুলো ওরা, তারপর পিছনে শুনতে পেল আবারও নতুন উদ্যমে গুলি শুরু

হয়েছে। ওদের মনেই হলো না সরতে পেরেছে। বদ্ধ পরিবেশে বিকট আওয়াজ তুলছে গুলি।

ঝুঁকি নিয়ে টর্চ জ্বালল রায়হান। ওরা চলে এসেছে পিয়ারের শেষে। সামনে স্তূপ হয়ে আছে নটিকাল গিয়ার, কুণ্ডুলি পাকানো দড়ি ও চেইন। পাশেই নলখাগড়া দিয়ে তৈরি বাস্কেট ও কাঠের খুঁটি। এক পলক সব দেখল রায়হান, তবে ওর মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে অন্য কিছু। এই বড় গুহার পাশে রয়েছে ছোট আরেক গুহা। প্রবেশদ্বারের উপর রয়েছে লোহার ডাণ্ডা, সেখান থেকে ঝুলছে ছেঁড়া পর্দার মত কিছু। কোনও এক সময়ে ওখানে ছিল দুটো ট্যাপেস্ট্রি, আড়াল দিত গুহার ভিতর অংশ।

'চলুন, ভিতরে ঢুকে পড়ি,' তাগাদা দিল রায়হান।

নতুন এই গুহার ভিতর ঢুকল ওরা।

শেড দুটো টেনে দিল স্বর্ণা, গ্লক ১৯ পিস্তল হাতে ওখানেই থামল। রায়হান ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে চারপাশে আলো ফেলল। আঙুল দিয়ে ঢেকে কমিয়ে রেখেছে হ্যালোজেন বাতির আলো।

'এ কী সত্যি?' ফিসফিস করে বলল স্মৃতি। মুহূর্তের জন্য ভুলেই গেছে দুই হাতে ভীষণ ব্যথা, বাইরে চলছে গোলাগুলি, জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। ভুলে গেছে সব।

পাথরের মেঝে থেকে যেন ঠাণ্ডা উঠতে না পারে, তাই কয়েক পরত পারশিয়ান কার্পেট মেঝের উপর পাতা। দেয়ালগুলো ঢাকা পড়েছে নানা ধরনের ট্যাপেস্ট্রি দিয়ে। দেখলে মনে হয় এটা কোনও তাঁবু। ঘরের দু'পাশে দুটো দড়ির বিছানা। ওগুলোর একটা অগোছালো, অন্যটা সুন্দর পরিপাটি। অন্যান্য আসবাব-পত্রের সঙ্গে রয়েছে কয়েকটা সিন্দুক ও প্রকাণ্ড একটা কাঠের টেবিল। তার উপর কালির দোয়াত ও পালকের কলম। কলমগুলোর উপর অংশ খাঁটি সোনা দিয়ে মোড়া। টেবিলের উপর অংশে মাদার অভ পার্ল দিয়ে তৈরি জ্যামিতিক নক্শা। রাজকীয়

চেয়ারের পাশে মেঝের উপর স্তূপ করা অসংখ্য বই। একটু দূরেই বুক শেলফ। প্রায় ছেঁড়া এক বাইবেলের পাশে সম্মান দিয়ে রাখা হয়েছে নকশাদার কোরআন।

বুক শেলফের পাশেই একটা অ্যালকোভ, ওখানে মেঝে থেকে শুরু করে ছাত পর্যন্ত একের পর এক সিন্দুক। একটার ডালা একটু খোলা। ওখানে আলো ফেলল রায়হান। আস্তে করে শ্বাস ফেলল। ভিতর অংশ থেকে জ্বলজ্বল করে উঠল সোনার মোহর।

এসব সিন্দুকের ওপাশে দরজা থাকতে পারে। আলো ফেলল রায়হান। না, কিছুই বোঝা গেল না। শুধু তাকে তাকে সাজানো সিন্দুক। সবচেয়ে উঁচুটা সরাতে চাইল, কিন্তু নড়ল না ওটা। নীচের সিন্দুকের মত সোনার মোহরে ভরা থাকলে, ওটার ওজন হবে কমপক্ষে পাঁচ শ' কেজি।

স্মৃতির দিকে টর্চ এগিয়ে দিল রায়হান। ওটা বগলের ভিতর গুঁজে নিল মেয়েটি, হাত দিয়ে ধরতে পারবে না।

'বেরুনোর কোনও পথ নেই,' স্বর্ণার পাশে এসে থামল রায়হান। স্বর্ণা দ্রুত হাতে রিলোড করেছে রাইফেল। ওটা বাড়িয়ে দিল রায়হানের দিকে। রাইফেল নিল রায়হান, নিচু স্বরে বলল, 'একটাই ভাল দিক, আমরা বড়লোক হয়ে মরছি। অন্তত কয়েক হাজার কোটি টাকা ওই সোনার দাম।'

'আহ্, জ্বালাতন করে না,' মুখ বাঁকাল স্বর্ণা, পিস্তল নিয়ে চলে গেল গুহার মুখে।

বাইরে এক নাগাড়ে গুলি চলছে। কান পাতল স্বর্ণা। সোহেল ভাই বোধহয় আগের জায়গা থেকে সরে গেছেন। জঙ্গিদের একে-৪৭-এর হুঙ্কারের ফাঁকে গ্লক পিস্তলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। দস্যু-তরীর স্টার্ন জ্বলন্ত চিতা হয়ে গেছে। শিখাগুলো স্পর্শ করছে গুহার ছাত। চারপাশ ভরে উঠছে ধোঁয়ায়।

নিচু স্বরে বলে চলেছে স্বর্ণা, 'সোহেল ভাই, আমরা এখানে।'

কিছুক্ষণ পেরুল, তারপর আবছা আলোর ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আমি আসছি!'

ট্যাপেস্ট্রি সরিয়ে দিল স্বর্ণা, এক পাশে সরে গেল। ছুটে এসে ভিতরে ঢুকল সোহেল। জানতে চাইল, 'বেরোবার কোনও রাস্তা পেলে?'

'না, সোহেল ভাই। একটাই ভাল খবর, আমরা বড়লোক হয়ে গেছি,' জানাল রায়হান। 'মারা গেলে হয়ে যাব বড়লোক ভূত!'

দুই জাহাজ এতই ঘেঁষে চলেছে, একটা অন্যটার উপর আর গোলা ফেলতে পারছে না। আপাতত স্টেলমেট চলছে। তবে বাড়তি ওজন ও শক্তি কাজে লাগাচ্ছে এবার মার্ভেল, তীরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে লিবিয়ান ফ্রিগেটকে। বারবার ওটার উপর চেপে বসতে চাইছে মার্ভেল। প্রতিবার স্টারবোর্ডে সরে যেতে হচ্ছে বক্তিয়ার খিলজিকে। একটু পর পর দুঃসাহসী বা আত্মহত্যাকারী জঙ্গিরা উঠে আসছে ডেকের উপর, আরপিজি ফেলতে চাইছে ফ্রেইটারের উপর। তবে একনাগাড়ে গুলিবর্ষণ করছে মার্ভেলের .৩০ ক্যালিবারের মেশিনগানগুলো, ডেকে বেরুতে দিচ্ছে না জঙ্গিদেরকে। দু'বার আরপিজি ছুঁড়েছে জঙ্গিরা, কিন্তু দু'বারই মার্ভেলের উপর দিয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে রকেট। ওই দুই হামলাকারী মারা পড়েছে গুলিতে।

ফ্রিগেটের করিডোরগুলোর ভিতর হুলুস্থূল চলছে। ড্যামেজ-কণ্ট্রোল টিমগুলো নানান দিকে ছুটছে। জাহাজের সামনের দিকে আগুন জ্বলছে, বাতাসে ভাসছে তৈলাক্ত ধোঁয়া। কাজ করছে পুরনো স্ক্রাবারগুলো, তবে পরিষ্কার হচ্ছে না বাতাস। চারপাশ থেকে আসছে অ্যালার্মের আওয়াজ। চেঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে অফিসাররা।

এসব আওয়াজ মধুর মত লাগছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কানে। এক অফিসারের কেবিনে খাটিয়ার সঙ্গে তাঁকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। জানেন না চারপাশে কী ঘটছে। তবে এটা বুঝতে পারছেন, যারা তাঁকে কিডন্যাপ করেছে, তারা বিপদে পড়েছে।

এটা জানেন জঙ্গিদের ক্যাম্প থেকে তাঁকে তুলে দেয়া হয়েছে কপ্টারে। ওটা তাঁকে নামিয়ে দিয়েছে একটা জাহাজে। তখন একটা ব্যাগের ভিতর মাথা ছিল তাঁর, দেখতে পাননি কিছুই। তবে লবণাক্ত বাতাস টের পেয়েছেন।

এখন দ্রুত চলছে জাহাজের ইঞ্জিন। একটু একটু কাঁপছে খাটিয়া। ঢেউয়ের ধাক্কা খেয়ে দুলছে জাহাজ। একটু আগেও জানতেন না, তবে এখন বুঝতে পারছেন, এরা কামান ব্যবহার করছে। এটা কোনও রণতরী। কাছেই আরেকটা রণতরী থেকে গোলা এসে লাগছে এটার গায়ে। ভাবছেন: কারা আক্রমণ করল! বাংলাদেশ নেভি নয়, এটুকু নিশ্চিত; তা হলে কারা এরা?

খুবই অবাক হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ইউনুস আল-কবিরের এতই ক্ষমতা যে লিবিয়ান রণতরী ব্যবহার করছে? স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ধারণা করেছেন, এ জাহাজের ক্রুরা ওই জঙ্গি-নেতার সংগঠনের সদস্য।

একের পর এক বিস্ফোরণের আওয়াজ আসছে। একটু একটু করে ভাল লাগছে তাঁর। যে ধরনের যুদ্ধই চলুক, সব থামবার আগেই হয়তো তাঁকে মেরে ফেলবে এরা। তারপরও তিনি খুশি, এই ভেবে যে, এই খুনিগুলোরও অনেকেই বাঁচবে না।

প্রচণ্ড এক আওয়াজ এল, থরথর করে কাঁপতে লাগল জাহাজ। তারপর সামনের কামানের আওয়াজ থেমে গেল। প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারছেন যে-কারণেই হোক, লিবিয়ান রণতরীর সামনের কামানের টারেট বিধ্বস্ত হয়েছে।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল কেবিনের দরজা, তাঁর জেলারদের মুখ কাফিয়ে দিয়ে ঢাকা, পিঠে ঝুলছে একে-৪৭। একটু আগের ভাল অনুভূতি বিদায় নিল তাঁর মন থেকে। এখন হাতে হ্যাণ্ডকাফ নেই, দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাঁকে বিছানা থেকে তোলা হলো, টেনে বের করা হলো কেবিন থেকে।

ইউনিফর্ম পরা নাবিকরা তাঁর দিকে দ্বিতীয়বার চাইল না। জাহাজ রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে আছে। খেয়ালই নেই নতুন পাওয়া পুরস্কারের দিকে। পরপর কয়েকটা গোলা পাশে এসে লাগতেই কাত হয়ে গেল জাহাজ, ভারসাম্য হারিয়ে বালক্‌হেডের উপর পড়লেন প্রধানমন্ত্রী। বাইরে প্রচণ্ড গোলাগুলি চলছে। ওদিকে মন চলে গেল তাঁর, ঠিকভাবে খেয়ালই করলেন না তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হয়েছে একটা মাঝারি ঘরে।

ঘরের পিছনে ঝুলছে কালো চাদর। এক পাশে ভিডিও ক্যামেরা। এক লোক মস্ত তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার তিনি সবই বুঝলেন। ঘরে আরও কয়েকজন রয়েছে। এরাও জঙ্গি, লিবিয়ান নাবিক নয়। কাফিয়ে দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ। একজন দাঁড়িয়েছে ভিডিও ক্যামেরার পিছনে। আরেকজন ঠিক করছে স্যাটালাইট-আপলিঙ্ক কণ্ট্রোল। অন্য লোকগুলো এসেছে সাক্ষী হিসাবে। এদের গায়ে খাকি পোশাক। যেমন ছিল মরুভূমির বেসের জঙ্গিদের পরনে। তলোয়ার হাতে লোকটার পরনে কালো পোশাক। বোঝা গেল, এ-ই জল্লাদ।

মেস হলের অ্যালার্মের লাউডস্পিকার ডিসেবল করা হয়েছে। তবে জাহাজের অন্যান্য অংশ থেকে আসছে সতর্কধ্বনি।

'তোমাকে আর বাঁচাবে কী, ওই জাহাজ এসে তোমার মরণ আরও ঘনিয়ে দিল,' আরবিতে বলল জল্লাদ মঞ্জুর। কড়া চোখে চেয়ে রয়েছে সে প্রধানমন্ত্রীর দিকে। বিরক্ত হলো, বেয়াদব মহিলা

পাল্টা চেয়ে রয়েছে দেখে। 'মৃত্যুর জন্য তুমি তৈরি?'

'আমি সবসময়েই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।' শান্ত স্বরে বললেন প্রধানমন্ত্রী, 'শুধু দুঃখ, তোমাদের মত নীচ জানোয়ারের হাতে মরতে হচ্ছে।'

তাঁকে বসিয়ে দেয়া হলো চেয়ারে। মেঝের উপর চোখ পড়ল তাঁর। দেখতে পেলেন প্লাস্টিকের শিট পেতে রাখা হয়েছে। এক ফালি কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়া হলো মুখ। শেষ সময়ে কোনও কথা বলতে দেয়া হবে না।

ক্যামেরাম্যানের দিকে মাথা দোলাল জল্লাদ মঞ্জুর। কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখের উপর স্থির হলো লেন্স, দর্শকরা ভাল করেই দেখবে কাকে খুন করা হচ্ছে। এবার প্রধানমন্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়াল জল্লাদ, কারুকার্যময় তলোয়ার তুলে দেখাল।

'আমরা, ইমাম ইউনুস আল-কবিরের অনুসারীরা আজ পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেব ইসলাম-বিদ্বেষী এক মেয়েলোককে, যে বেপর্দা জেনানা নিজ দেশে জঙ্গি দমনের নাম করে ধার্মিক মুসলিমদের দমন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকী কয়েকজন বুজুর্গ, সাচ্চা মুসলমানকে মিথ্যা দোষারোপ করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিয়েছে।' এক হাতে ধরা স্ক্রিপ্ট পড়ছে সে। 'এটা আল্লাহ্ ও ইমামের প্রতি আমাদের কর্তব্য। আমরা এই গুরু-দায়িত্ব পালন করবই। ইসলামের শত্রু এই মহিলাকে এখনই দোজখের পথে রওনা করিয়ে দেয়া হবে।'

প্রধানমন্ত্রী চাইলেন না লোকটার দিকে মনোযোগ দিতে, মাথা উঁচু করে বসে রইলেন। মনে মনে বললেন, 'হে মাবুদ, আমার কোনও ভুল হয়ে থাকলে আপনিই ক্ষমা করতে পারেন; নিশ্চয়ই একদল নর-পিশাচ কাউকে সাজা দিতে পারে না।'

মার্ভেলের ডেকে পড়ে গেছে কয়েক কমাণ্ডো, ওদিকে চাইল রানা।

বুঝতে পারছে, এখন ওদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। নিজেও ফিরতে পারবে না মার্ভেলের ডেকে। দুই জাহাজের মাঝে তৈরি হয়েছে দশ ফুট দূরত্ব। তা ছাড়া, ফিরে যেতে আসেনি ও।

ফ্রিগেটে পাঁচ কমাণ্ডো নেমেছিল, তাদের চারজন ফিরতে পেরেছে মার্ভেলে, এতে রানা খুশি। ওরা আহত ছিল। অবশ্য অন্য কমাণ্ডোকে দেখতে পেল না। কোথায় যেন সরে গেছে। ফ্রিগেটের নাবিকরা ওর দিকে ঘুরেও চাইছে না। ইউনুস আল-কবিরের সংগঠনের শীর্ষ এবং নেভির উচ্চপদস্থ দু'চারজন এই জাহাজ ব্যবহার করছে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার কাজে।

অনায়াসেই করিডোরে ঢুকে পড়ল রানা, আগে থেকে স্থির করা পথে এগুতে শুরু করল। জাহাজের ভিতর ছুটোছুটি করছে নাবিকরা, অন্য কোনও দিকে চাইবার উপায় নেই তাদের। দ্রুত পায়ে বাঁক পেরুল রানা, তারপর থামতে হলো। সামনে থেকে ছুটে এল ফায়ার-কণ্ট্রোল টিম। দেয়ালে সেঁটে গিয়ে তাদেরকে যেতে দিল রানা। যে-কোনও ট্রেইণ্ড নাবিক তা-ই করবে।

'আমাদের সঙ্গে এসো,' না থেমেই ছুটছে ফায়ার টিমের লিডার।

'ক্যাপ্টেনের আদেশ,' কাঁধের উপর দিয়ে বলেই দৌড়াতে শুরু করল রানা। সামনেই পড়ল সিঁড়ি, একেক বারে তিন ধাপ করে নামতে লাগল। উপরে উঠছে এক নাবিক, তার দিকে চেয়েও দেখল না রানা, নেমে এল পরের ডেকে। মাঝারি দৌড়ে এগিয়ে চলেছে ক্রুদের মেস লক্ষ্য করে। কিন্তু মেস হলের দরজার সামনে দু'পাশে দাঁড়িয়েছে দুই প্রহরী। প্রথমজন উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে কামরার ভিতর। অন্যজন রানার দিকে চাইল, তবে ওর ইউনিফর্ম দেখে ধরে নিল, এ লোক জাহাজের নাবিক।

সামনের লোকগুলো জঙ্গি, বুঝতে দেরি হলো না রানার। এদের মুখে কাফিয়ে, কাঁধে ঝুলছে একে-৪৭ রাইফেল।

দশ কদম দূর থেকেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা। মেস হলের ভিতর বলে চলেছে এক লোক: '...যারা বাড়ির ভিতর হামলা করে মেয়েমানুষ ও শিশুদের হত্যা করে, বোমা ফেলে তাদের গ্রাম-কে-গ্রাম ধ্বংস করে দেয়, ব্রাশফায়ার করে খুন করে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে, সেই আমেরিকানদের দোসর এই মহিলা। তাকে মরতেই হবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়।'

যথেষ্ট শুনেছে রানা, আরও দুই কদম এগুলো, তার আগেই হাতে উঠে এসেছে কম্প্যাক্ট মেশিন পিস্তল। এক জঙ্গির চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো, পরক্ষণে গুলি বিঁধল কপালে। খুলি ভেদ করে বেরিয়ে গেল বুলেট, পিছনের দেয়ালে ছিটকে লাগল রক্ত ও মগজ। তার হাত থেকে খটাস্ করে পড়ল রাইফেল। তারপরই পড়ল লাশ।

তার আগেই ছুটতে শুরু করেছে রানা। এইমাত্র ঘুরে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় জঙ্গি। তার বুকে লাগল গুলি, পিছিয়ে মেস হলের ভিতর গিয়ে পড়ল লোকটা। প্রায় একই সঙ্গে ঘরে ঢুকল রানা, দেখল ডানদিকে ছয়জন সশস্ত্র লোককে দেখিয়ে চলেছে ট্রাইপডের উপর রাখা ক্যামেরা। ভিডিও ইকুইপমেন্টের পাশে আরও দুইজন। ক্যামেরার সামনে একজন, এক হাতে কাগজ, অন্য হাতে কারুকার্যময় তলোয়ার।

তার পিছনে চেয়ারে বসে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মুখ বেঁধে রাখা হয়েছে, তবে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো।

আধ সেকেণ্ডে চারপাশ দেখে নিল রানা, ওর জানা হয়ে গেল কে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক। প্রধানমন্ত্রীকে কতল করতে হলে জল্লাদকে জায়গা থেকে সরতে হবে, এবং যে দু'জন ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত, তারা ডেকের উপর নামিয়ে রেখেছে অস্ত্র।

পিছলে থেমে গেল রানা, পা ভাঁজ করে শুটিং পজিশনে পৌঁছে গেল। গুলি করবার সময় দ্রুত ট্রিগার টিপল। ওর প্রথম লক্ষ্য ছয়

জঙ্গি। রানা ঘরে ঢুকেছে তা সবাই বুঝবার আগেই মারা গেল দুইজন। তৃতীয়জন কাঁধ থেকে রাইফেল নামাতে গিয়ে মরল। হেকলার অ্যাণ্ড কচ্-এর ব্যারেল ছিটকে উপরে ওঠে, আর ওটা আছে ফুল অটোম্যাটিকে, পঞ্চম লোকটার কপালে ঢুকল দুটো বুলেট, মাথার পিছন থেকে ছিটকে উঠল মগজ।

এক সেকেণ্ড ট্রিগার থেকে আঙুল সরাল রানা, পরক্ষণে নিশানা ঠিক করে নিতে চাইল। তবে গুলি করেছে ষষ্ঠ লোকটা। রানার মাথা থেকে আধ ফুট দূর দিয়ে গেল বুলেট, ধাতব দেয়ালে লেগে সাদা রং তুলে চারদিকে ছুটতে লাগল।

সাইট ঠিক করেছে রানা, ট্রিগার টিপল—দুটো বুলেট লোকটাকে তুলে দিল বালক্হেডের কাছে। লাশ পড়বার আগেই কালো পোশাক পরা লোকটার দিকে ঘুরে গেছে রানা। আগে কখনও কাউকে এত দ্রুত নড়তে দেখেনি। ও ঘরে ঢুকে গুলি শুরু করেছে সাত সেকেণ্ডও হয়নি, অন্য কেউ হলে মাত্র বুঝতে শুরু করত কী ঘটছে।

কিন্তু তলোয়ারধারী জল্লাদ অন্য জিনিস।

রানা নড়তেই সরে গেছে সে, ঝটকা দিয়ে তুলে ফেলেছে তলোয়ার, নেমে আসছে ওটা প্রধানমন্ত্রীর গর্দান লক্ষ্য করে।

মাত্র ষষ্ঠ জঙ্গিকে গুলি করেছে রানা। অ্যাড্রেনালিন চালিত করছে ওকে, আধ সেকেণ্ড অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল—বড় দেরি করে ফেলেছে! তা-ও গুলি করল। আগে খেয়াল করেনি কখন পিস্তল বের করেছে ভিডিওগ্রাফার।

প্রচণ্ড আঘাত লাগল রানার মাথার পাশে, দুই চোখে নামছে নিকষ আঁধার!

একুশ

আধঘণ্টা হলো বক্তৃতা শুরু করেছেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি। বারোবারের মত ঘড়ি দেখলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ ফতে আলী, আবারও চাইলেন অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে। সে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে, কানে গুঁজে নিয়েছে রেডিওর বাড। যতবার ওদিকে চাইছেন ফতে আলী, আস্তে করে মাথা নাড়ছে সে।

বিষয়টি লক্ষ্য করেছে সলীল সেন। খেয়াল করছে লিবিয়ান মন্ত্রীকে। আরও কিছু অভ্যেস চোখে পড়ল ওর। একটু পর পর পা বদল করে দাঁড়াচ্ছেন ফতে আলী, বারবার জ্যাকেটের পকেটে রাখছেন হাত, ঘড়ি দেখছেন। গাদ্দাফির উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন ডিগনিটরিরা। লিবিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে ক্লান্ত এবং হতাশ মনে হলো।

আবারও এইডের দিকে চাইলেন। সামান্য কাত হয়ে দাঁড়াল লোকটা। বোধহয় মনোযোগ দিয়ে গাদ্দাফির বক্তব্য শুনতে হাত রাখল কানের উপর। দুই সেকেণ্ড পর সোজা হয়ে দাঁড়াল, মাথা দোলাল ফতে আলীর দিকে। ঠোঁটে ফুটে উঠেছে প্রসারিত হাসি।

'খেলা শুরু,' অ্যাম্বাসেডারের পাশ থেকে বলল সলীল সেন।

সিঁড়ির এক ধাপ উঠলেন ফতে আলী, মনোযোগ আকর্ষণ করবেন গাদ্দাফির। ঠিক তখনই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা শেষ করলেন প্রেসিডেন্ট। আরও দুই ধাপ উঠলেন ফতে আলী,

ফিসফিস করে কী যেন বললেন গাদ্দাফির কানে।

ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন গাদ্দাফি। 'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন,' বললেন। একটু আগে আবেগ ছিল কণ্ঠে, কিন্তু এখন অন্য কারণে কাঁপছে গলা, 'এইমাত্র আমাকে ভয়ঙ্কর এক দুঃসংবাদ দেয়া হলো...'

সঙ্গীর জন্য অনুবাদ করলেন অ্যাম্বাসেডার কামাল।

'এইমাত্র জানা গেল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আসলে ওই ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।' কথাটা সবাই শুনেছেন, এবার ঘরে গুঞ্জন উঠল। হাসিমুখে পরস্পরের ভিতর আলাপ শুরু হলো। 'প্লিয, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। প্লিয! আপনারা যা ভাবছেন, তা ঘটেনি। ওই দুর্ঘটনার পর জোর করে তাঁকে কিডন্যাপ করে সন্ত্রাসী ইউনুস আল-কবিরের অনুসারীরা। এইমাত্র শুনতে পেলাম, তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কতল করতে চলেছে। মিনিস্টার আলী আমাকে আরও বলেছেন, এই বাড়িতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে জঙ্গিরা।'

ফরেন মিনিস্টারের পিছু নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন গাদ্দাফি। তাঁর পিছু নিলেন সবাই, স্তম্ভিত। অ্যাম্বাসেডার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে তাঁদের পিছু নিতে দিল না সলীল সেন, হাতের ইশারায় মানা করল। তিনজন রয়ে গেল এণ্ট্রি হলে, সবার কাঁধের উপর দিয়ে টেলিভিশনের দিকে চাইল। চালু করা হয়েছে প্লাজমা টেলিভিশন, চারপাশে ফেলছে ওটা ম্লান আলো। ডিগনিটরিদের মুখ থেকে সরে গেছে রক্ত। ফুঁপিয়ে উঠলেন উপস্থিত কয়েকজন আমন্ত্রিত মহিলা।

হঠাৎ মনিটরে লাফ দিয়ে উঠল একটা দৃশ্য। কালো চাদরের সামনে চেয়ারে বসে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, লালচে হয়ে গেছে চোখ দুটো। রুমাল দিয়ে শক্ত

ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে তাঁর মুখ।

ঘরের ভিতর কাঁদতে শুরু করেছেন ভদ্রমহিলারা।

এবার দেখা গেল চেক দেয়া কাফিয়ে পরা এক লোককে। হাতে মস্ত এক তলোয়ার, আরেক হাতে পরখ করছে ওটার ধার।

'আমরা, ইমাম ইউনুস আল-কবিরের অনুসারীরা আজ পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেব ইসলাম-বিদ্বেষী এক মেয়েলোককে, যে বেপর্দা জেনানা নিজ দেশে জঙ্গি দমনের নাম করে ধার্মিক মুসলিমদের দমন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এমনকী কয়েকজন বুজুর্গ, সাচ্চা মুসলমানকে মিথ্যা দোষারোপ করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিয়েছে।' এক হাতে ধরা স্ক্রিপ্ট পড়ছে সে। 'এটা আল্লাহ্ ও ইমামের প্রতি আমাদের কর্তব্য। আমরা এই গুরু-দায়িত্ব পালন করবই। ইসলামের শত্রু এই মহিলাকে এখনই দোজখের পথে রওনা করিয়ে দেয়া হবে।'

মনোযোগ দিয়ে মোহাম্মদ ফতে আলীর মুখ দেখছে সলীল সেন। দীপ্ত মনে হলো লোকটার চোখ, চকচক করছে চেহারা। যেন অলৌকিক কিছু আশা করছে।

টেলিভিশনের উপর থেকে ছোট ক্যামেরাটা তুলে নিলেন গাদ্দাফি, মুখের সামনে ধরলেন। 'ভাই,' ভারী স্বরে বললেন, 'আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা, আপনারা আল্লাহ্র পথে চলুন, মানুষ হত্যা করে নিজেদেরকে আল্লাহ্র সঠিক পথ থেকে সরিয়ে দেবেন না। আসুন, আমরা চেষ্টা করি যেন দুনিয়ায় নেমে আসে শান্তি। একজনের রক্তপাত করলে বদলে আমাদেরকেও রক্ত হারাতে হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ওঁকে হত্যা করলে কিছুই পাবেন না। এতে কষ্ট কমবে না মুসলিম বিশ্বের আমজনতার। বরং সঠিক পথ থেকে সরে যাব আমরা। আমরা জানি শত্রুদের সাথে বসে আলোচনা করলে বেরুতে পারে শান্তির পথ। আমরা সবাই একইসঙ্গে প্রশান্তিময় জীবন পেতে পারি।'

'আল-কোরআন আমাদেরকে জানিয়েছে, অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বাস করে শান্তি মিলবে না।'

'আল-কোরআন এ-ও বলেছে, প্রতিটি প্রাণীকে ভালবাসো। আল্লাহ্ই তো মানুষকে নিজের পথ বেছে নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। আমরা কী ঘৃণার পথ বেছে নেব, না ভালবাসার? নিশ্চয়ই বুক ভরা ভালবাসা? আজ ত্রিপোলিতে দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশের শীর্ষ নেতা এসেছেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, হাত থেকে নামিয়ে রাখুন তলোয়ার, বাঁচতে দিন ওঁকে।'

কাফিয়ের কারণে ঢাকা পড়েছে তলোয়ারধারীর মুখ, তবে নড়বার ভঙ্গি বহু কিছুই বুঝিয়ে দিল। হঠাৎ ঝুঁকে এল জল্লাদের দুই কাঁধ, দৃশ্যপট থেকে সরে গেল তলোয়ার।

রিসেপশন হলে বারোজন লোকের পায়ের আওয়াজ ছুটে আসছে। ধুপধাপ আওয়াজ উঠছে মার্বেলের মেঝেতে।

সাধের পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে চলেছে, গাদ্দাফির হাত থেকে খপ্ করে ক্যামেরা কেড়ে নিল ফতে আলী, চিৎকার করে বলে উঠল, 'মঞ্জুর! কী করছ! আমাদের লোক পৌঁছে গেছে! খুন করো ওকে! খুন করো!'

কিন্তু তলোয়ার তুলল না জল্লাদ, বদলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে খুলছে রুমাল।

'মঞ্জুর!' গলা ফাটিয়ে বলল ফতে। 'না!'

কে যেন তার হাত থেকে কেড়ে নিল ক্যামেরা। একই সঙ্গে তার মেরুদণ্ডের উপর ঠেসে ধরল পিস্তলের মাযল। ঘুরে চাইল ফতে আলী, লোকটা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে এসেছে।

'আপনার খেলা শেষ!' বলল সলীল, 'টিভিতে দেখুন।'

চট্ করে চাইল ফতে আলী। মনিটরে যে লোককে মঞ্জুর মনে করেছে, যাকে ভেবেছে সবচেয়ে বিশ্বাসী, সে লোক কাফিয়ে

খুলছে মুখ থেকে। কাপড় সরে যেতেই দেখা গেল লোকটার মাথায় পুরু ব্যাণ্ডেজ। এবং সে মঞ্জুর নয়!

'এ অনুষ্ঠান আপনাদের কেমন লাগল?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'হাতে-নাতে ধরা পড়েছে লিবিয়ান শয়তান,' মন্তব্য করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

প্রেসিডেণ্ট গাদ্দাফির ব্যক্তিগত বডিগার্ডরা ঢুকেছে হলঘরে। তাদের নেতা রিপোর্ট দিল, একটা গুলি ছুঁড়বার আগেই বাইরের সিকিউরিটি পারসোনেলদের হাতে ধরা পড়েছে জঙ্গিরা।

'আজ বিকেলে এ অপারেশন শুরু হওয়ার অনেক আগেই গাদ্দাফির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বাংলাদেশি পররাষ্ট্র মন্ত্রী, সবই খুলে বলেছেন।

সবার চোখের সামনে গ্রেফতার করা হচ্ছে মোহাম্মদ ফতে আলীকে। লোকটার দিকে চাইলেন গাদ্দাফি, নিচু স্বরে বললেন, 'তোমার শয়তানির দিন শেষ। বিকেলে অচেনা এক লোক ফোন করেছে সুইস মিলিটারি চিফকে। একটা বাড়িতে রেইড করেন তাঁরা। আগে বলতে পারিনি, গাড়ি দুর্ঘটনায় মরেনি আমার নাতি। যে বাড়িতে আটকে রেখেছিলে, সেখান থেকে ওকে উদ্ধার করা হয়েছে। ও এখন নিরাপদ। আর কখনও আমার বুকের উপর বসে তুমি যা খুশি করতে পারবে না। তোমার দিন শেষ।

'আমি জানতাম না তুমিই ইউনুস আল-কবির। ভেবেছি ব্ল্যাকমেইল করছ নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য। কিন্তু এখন দুনিয়ার সামনে বেরিয়ে এসেছে তুমি কে। তোমার অপরাধের শেষ নেই, বিচারও হবে কঠোর ভাবেই। খুব দ্রুত মরবে তুমি। আমি খুঁজে বের করব আমার সরকারে কারা তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাদেরকেও ছাড়া হবে না।'

দু'হাত প্রসারিত করলেন গাদ্দাফি, ঘরের সবার উদ্দেশে

বললেন, 'আমরা সবাই জঙ্গিবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। বিশ্ব-নেতাদের খুন করতে পারবে না এরা। আমি আশা করি, শান্তি মহাসম্মেলন সত্যিকারের অর্থবহ সম্মেলন হবে এবং প্রতিটি দেশ শান্তির জন্য একসঙ্গে কাজ করবে।' সিকিউরিটি পারসোনেলদের উদ্দেশে হাত নাড়লেন তিনি। 'আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নাও এই বজ্জাতকে।'

শক্তিশালী এক লিবিয়ান সৈনিক ঘাড় ধরল ফতে আলীর, আরেক হাতে ধরেছে টাই, সবার সামনে থেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হলো লোকটাকে।

টেলিভিশনে ভেসে এল নারী কণ্ঠ, 'মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, চমৎকার বলেছেন আপনি।' রানার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। 'সঠিক পথে চলুক শান্তি মহাসম্মেলন। আমি আগামীকাল সকালে ঠিক নয়টায় পৌঁছে যাব মিটিঙে।'

মেস হলে মাথার পাশে বুলেটের আঘাত লাগতেই ধড়াস্ করে মেঝের উপর পড়ল রানা। তার আগে যে গুলিটা করেছে সেটা একই সঙ্গে দুটো কাজ করেছে। নেমে এসেছে জল্লাদের তলোয়ার, কিন্তু ওটার পাতের উপর লেগেছে বুলেট, সরিয়ে দিয়েছে অস্ত্রটা। এবং বুলেট বিঁধেছে চেয়ারে, প্রধানমন্ত্রী সহ ছিটকে পড়েছে চেয়ার।

পাশ থেকে পিস্তল তুলে নিল রানা, গুলি করল তিনবার। বুকে গুলি খেয়ে মরল ক্যামেরাম্যান ও তার সহকারী। হাত থেকে তলোয়ার ছিটকে বেরিয়ে যেতে কয়েক পা পিছিয়ে গেছে জল্লাদ, মাথার উপর তুলল দুই হাত।

ঠিক তখনই মেস হলে ঢুকল সশস্ত্র জলিল খান।

'প্লিয!' বলে উঠল জল্লাদ, 'আমি নিরস্ত্র।'

'প্রধানমন্ত্রীর হাত খুলে দাও,' তাকে নির্দেশ দিল রানা। 'মুখ

থেকেও রুমাল খুলবে।'

লোকটা নড়বার আগেই ছরছর আওয়াজ শুনতে পেল রানা। একটু আগের বীরপুরুষ, যে-লোক নিরস্ত্র মহিলাকে খুন করতে প্রস্তুত ছিল, সে ভয়ে কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছে!

'সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে লড়ার চেয়ে নীরিহ মহিলাকে হাত-পা বেঁধে খুন করা সোজা, তাই না?' বলল রানা।

চুপচাপ দেখছে জলিল খান, ঠোঁটে টিটকারির হাসি।

জল্লাদ মঞ্জুর প্রধানমন্ত্রীর দড়ি ও মুখের রুমাল খুলে দিল।

'আপনি ঠিক আছেন, ম্যাডাম?' পরিষ্কার বাংলায় জানতে চাইল রানা।

'ম্যাডাম নয়, আপা বলো। হ্যাঁ। ঠিক আছি।' চেয়ে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর বললেন, 'আরে, তোমাকে চিনি আমি। তুমিই না নিউ ইয়র্কে নেভির পিয়ারে... কনফারেন্স হলে... হ্যাঁ, তুমিই তো সেই মাসুদ রানা!'

'আমারও মনে পড়ছে,' মৃদু হাসল রানা। প্যান্টের পকেট থেকে রেডিও বের করল। 'গগল, নবী, শুনছ তোমরা?'

'ঠিক সময়ে যোগাযোগ করেছ,' নীরস স্বরে বলল গগল।

'আমরা ওঁকে পেয়েছি। উঠে আসছি ডেকে।'

'জলদি করো। বক্তিয়ার গতি বাড়িয়েছে। তোমাদেরকে তুলে নেয়ার জন্য দু'মিনিট সময় পাব। তারপর...'

উঠে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী, ডান হাতে বাম কবজি ডলছেন। সরে গেলেন জল্লাদের কাছ থেকে। তারপর যা করলেন তার জন্য রানা তৈরি ছিল না। মঞ্জুরের দিকে চেয়ে নরম স্বরে বললেন, 'আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি। হয়তো আবারও কখনও দেখা হবে আমাদের। তখন তুমি শত্রু থাকবে না, হবে বন্ধু।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'এ লোককে মেরে ফেলো না। প্লিয!'

'কিন্তু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী...' আপত্তি তুলতে গিয়েও থেমে গেল রানা।

'চলো, যাওয়া যাক,' বললেন প্রধানমন্ত্রী।

উনি দরজার দিকে পা বাড়াতেই পিছু নিয়েছে জলিল।

হাঁটতে শুরু করবার আগে একবার চাইল রানা, ডেক থেকে পিস্তল তুলছে জল্লাদ!

কমপ্যাক্ট মেশিন পিস্তল তুলল রানা, মাত্র একবার স্পর্শ করল ট্রিগার। কণ্ঠে গুলি খেয়ে ছিটকে গিয়ে ডেকে পড়ল লোকটা। ছেঁড়া গলা থেকে বেরুল ঘড়ঘড় আওয়াজ। তার ফেলে দেয়া স্ক্রিপ্ট পড়েছে টেলিভিশন ক্যামেরার পাশে, ওটা তুলে নিল রানা, একবার দেখল ক্যামেরার ব্রডকাস্টিং ফ্রিকোয়েন্সি, তারপর হাঁটতে শুরু করে চলে এল প্রধানমন্ত্রীর পাশে।

'ওকে না মারলে চলত না?' নিচু স্বরে বললেন প্রধানমন্ত্রী।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'না, আপা।' অন্য বিষয়ে ভাবতে শুরু করেছে। বলল, 'এবার আমাদেরকে ছুটতে হবে, হাতে সময় নেই।' খপ্ করে প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরল, হালকা চালে ছুটতে শুরু করল। কাভার দিতে পিছনে রইল জলিল খান।

সিঁড়ির দিকে ছুটছে ওরা। রানা দেখল হালকা হয়ে এসেছে চারপাশের ধোঁয়া। সিঁড়ির উপর ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়েছে দুই নাবিক। কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না তারা। তবে কাছাকাছি উঠে যাওয়ার পর তারা বুঝতে পারল মহিলা লিবিয়ান নয়! দুইজন তারা প্রধানমন্ত্রীকে ধরতে লাফিয়ে নামতে শুরু করল। ডানদিকের লোকটা রানার গুলি খেয়ে সিঁড়ির পাশ থেকে নীচে গিয়ে পড়ল। দ্বিতীয়জন কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল রানার বুকে। ভুশ্ করে শ্বাস বেরিয়ে গেল ওর। কয়েক সেকেণ্ড লাগল সামলে নিতে। তার আগেই পেটে ধপাধপ্ গোটা পাঁচেক ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটা।

রানার পিছনে রয়েছে জলিল খান, গুলি করতে পারছে না।

উদ্ধারকারীর বিপদে সাহায্য করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী। দুই হাতে ধরলেন নাবিকের বাম হাত, প্রায় ঝুলে পড়লেন। ধাক্কা দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিতে চাইল লোকটা। গত কয়েক দিনের অত্যাচারে দুর্বল হয়ে গেছেন প্রধানমন্ত্রী, সিঁড়ির এক পাশে কাত হয়ে পড়ে গেলেন। রানার চোয়ালে নেমে এল নাবিকের লাথি।

বাইরে থেকে হৈ-চৈ শোনা গেল। যেন থরথর করে কাঁপছে গোটা সিঁড়ি।

মার্ভেলের ডেকের গোপন লঞ্চ টিউব থেকে বেরিয়ে ফ্রিগেটের দিকে আসছে মিসাইল। আঁধার আকাশকে চিরে দিল আগুনের শিখা। এক্সপ্লোসিভ টিপড রকেট সংক্ষিপ্ত পথ পেরুতে শুরু করেছে।

বিকট বিস্ফোরণের সঙ্গে হিসহিস আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। আগুনে পুড়ছে ইস্পাত। একই মুহূর্তে দম নিতে পারল রানা, কুঁজো হয়ে পরের ঘুসিটা বাহুর উপর নিল, পরক্ষণে ওর ডান পায়ের লাথি পড়ল নাবিকের শিন বোনের উপর। মড়াৎ করে ভেঙে গেল হাড়।

দুই পায়ে দাঁড়াতে যেতেই ঘষা লাগল হাড়ের ভাঙা দুই অংশ, গলা ফাটানো চিৎকার ছাড়ল লোকটা। সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, পরক্ষণে হাঁটু তুলে গুঁতো দিল নাবিকের পেটে। দুই হাতে টান দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে, জলিলের ধাক্কা খেয়ে নীচে গিয়ে পড়ল লোকটা। প্রধানমন্ত্রীকে উঠতে সাহায্য করল রানা, তারপর তাঁকে নিয়ে দ্রুত পায়ে ল্যাণ্ডিঙে উঠে এল, পিছনে জলিল।

যে হ্যাচ দিয়ে ফ্রিগেটে ঢুকেছে, তা বন্ধ। হুইল ঘুরিয়ে দরজা খুলল রানা, ছিটকে বেরুল ডেকে। ভেবেছে ফ্রিগেটের পাশে থাকবে মার্ভেল, কিন্তু ওটা আছে কমপক্ষে তিরিশ ফুট দূরে। পিছনে আগুনের লেজ নিয়ে আঁধার চিরে কিলবিলে সাপের মত এল আরেকটা রকেট।

ফ্রিগেটের স্টারবোর্ডের দিক থেকে ভেসে এল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ। আগে রকেট আঘাত হানলেও এত শব্দ হয়নি। মার্ভেলের দুটো শিপ-টু-শোর রকেট আঘাত হেনেছে উপসাগরীয় টাইডাল পাওয়ার স্টেশনের প্রধান স্লুইস গেটে!

শাখা-গুহার ভিতর এসে লাগছে আটটি রাইফেলের অজস্র বুলেট। চারপাশে ছিটকে পড়ছে পাথরের কুচি, যেন খেপা ভিমরুল। তিন মিনিট পেরুনোর আগেই সোহেল, স্বর্ণা, রায়হান ও স্মৃতি সবার শরীর থেকে বেরুল রক্ত। তবে স্বর্ণা ছাড়া অন্য কেউ গুরুতর ভাবে আহত নয়।

প্রধান গুহা থেকে একনাগাড়ে গুলি আসছে। ওরা পাল্টা গুলি করবে, তা সম্ভব নয়। পাথরকুচি থেকে নিজেদেরকে আড়াল করতেই উবু হয়ে গেছে মেঝের উপর। শত শত গুলি ছুঁড়ছে জঙ্গিরা, বোধহয় নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ ছিটকে ভিতরে ঢুকল এক জঙ্গি, উন্মাদের মত চিৎকার করছে। কোমরের পাশে রাইফেল রেখে গুলি শুরু করল। দেয়ালে লাগছে বুলেট, ছিন্নভিন্ন হলো বিছানা ও শেলফের বই। আঁধারে শত্রু খুঁজতে চাইছে লোকটা। তবে সোহেলের তিন রাউণ্ড গুলি বিঁধল তার বুকে। ছিটকে পিছিয়ে গেল লাশ, আবার গিয়ে পড়ল প্রধান গুহার ভিতর।

স্রেফ কপাল, লোকটা ওদেরকে শেষ করতে পারেনি। তবে ওরা সবাই বুঝল, পরেরবার মরতে হবে। ছুটে আসবে জঙ্গিরা, মৌচাকের মত অসংখ্য ফুটো নিয়ে এখানেই পড়ে থাকবে ওদের লাশ।

নিজ অ্যামিউনিশন দেখে নিল সোহেল। ওর হার্নেসে স্পেয়ার ম্যাগাজিন নেই। পিস্তলের ভিতর মাত্র সাতটা গুলি। রায়হানের রাইফেল ও পিস্তলে গুলি নেই। রাইফেলটা ধরেছে গদার মত

করে। প্রয়োজনে ওটা নিয়ে হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাট করবে। বোধহয় স্বর্ণার পিস্তলেও বেশি গুলি নেই।

তরুণ বয়স থেকে দেশের জন্য লড়ছে সোহেল। ভাবতে গিয়ে তিক্ত হাসল—ও মরবে না দেশের শ্যামল মাটিতে, বাংলার মাটিতে কবর হবে না ওর। এই পাথরের গুহার ভিতর পড়ে থাকবে লাশ। ওর দেহের উপর থুতু ফেলবে জঙ্গি ফ্যানাটিকরা। এবং পরে আরও বহু মানুষকে শেষ করবে তারা।

বড় গুহার ভিতর যেন কমে এসেছে গুলিবর্ষণ। লোকগুলো বোধহয় শেষবারের মত হামলা করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ধোঁয়া ভরা প্যাসেজ পেরুল গ্রেনেড, ঠং করে লাগল অ্যালকোভ ভরা সিন্দুকের নীচেরটায়। বিস্ফোরণের অর্ধেক চাপ সইল কাঠ, চার দিকে ছিটকে পড়ল চল্টা। চারপাশের দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ল সোনার মুদ্রা ও শ্র্যাপনেল। আবারও বেঁচে গেল ওরা, কেউ নতুন করে আহত হয়নি। তবে প্রচণ্ড কংকাশনে কাঁপতে লাগল থরথর করে। জ্বলন্ত কাঠের টুকরো পড়েছে দুই বিছানার উপর, জ্বলে উঠল লিনেনের কাপড়। ধোঁয়ায় ভরে উঠল গুহা।

স্বর্ণা কী যেন চিৎকার করে বলতে চাইল সোহেলের কানে। কিন্তু আপাতত বধির বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটার। এটা বুঝল, এবার আসবে জঙ্গিরা। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হওয়ায় ওদেরকে বাগে পেয়ে গেছে, এবার শেষ করবে খেলা। নোংরার ভিতর বসে আছে সোহেল, থরথর করে কাঁপছে দেহ, আঙুল চলে গেল পিস্তলের ট্রিগারে। আয়, শালারা, আমরা তো মরেইছি, তোদেরও ক'জনকে নিয়ে যাই!

কিন্তু এক এক করে কয়েক মিনিট পেরুল। সাত জঙ্গির মাত্র দুই একজন এখনও গুলি করছে গুহার ভিতর। ওরা অপেক্ষা করছে, ভাবল সোহেল। এই ধোঁয়াই ওদেরকে বেরুতে বাধ্য

করবে। অথবা জঙ্গিরা ভাবছে, আগুনই শেষ করবে ওদেরকে।

চিত হয়ে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল সোহেল, ধোঁয়ার ভিতর শ্বাস নিতে চাইছে। প্রতিবার দম নিতে গেলে জ্বলে উঠছে ফুসফুস। তিক্ত মনে ভাবল সোহেল, হারিস জামানের লোকদের ইচ্ছাপূরণ হবে। এখানে আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না ওরা। আবছা আলোয় স্বর্ণা ও রায়হানকে দেখল। ঠিক যেন ওর মত করেই ভাবছে ওরা। যথেষ্ট হয়েছে, ভাবল সোহেল। মরলে তো একবারই মরব! ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল, পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে স্বর্ণা ও রায়হানও।

'আজ আমাদের জীবনের শেষ দিন, হয়তো কখনও আর দেখা হবে না,' বলল সোহেল।

'তা-ই, সোহেল ভাই,' তিক্ত হাসল স্বর্ণা।

'বিদায় আপনাদেরকে,' বলল রায়হান। 'কোনও দোষ করে থাকলে মাফ করে দেবেন, সোহেল ভাই, স্বর্ণা।'

'একসঙ্গে বেরুব আমরা,' বলল সোহেল। পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল, তারপর পিস্তল বাগিয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল। পাশে চলেছে স্বর্ণা ও রায়হান।

গুহা-মুখের পাঁচ ফুট দূরে চলে এল ওরা, তাও গুলি আসছে না। ছিটকে বেরুল তিনজন, কাঁপা আলোয় টার্গেট খুঁজল সোহেল ও স্বর্ণা। রায়হান দুই হাতে গদার মত ধরে আছে রাইফেল। দূরে জ্বলছে জলদস্যু-জাহাজ। ওদের দিকে ছুটে আসছে না কেউ। কয়েক ফুট দূরে পড়ে আছে এক জঙ্গি। দুই শোল্ডার ব্লেড গ্রিল করে দিয়েছে বুলেট। একটু দূরে অন্য জঙ্গিদেরকে দেখতে পেল ওরা। বুঝল না কীভাবে শেষ হলো এরা। গুহার মেঝের উপর পড়ে আছে জঙ্গিদের লাশ। দৌড় থামাল সোহেল-স্বর্ণা-রায়হান। চমকে গেছে। গুণে দেখল পড়ে আছে আট জঙ্গি।

কখনও কুসংস্কার বিশ্বাস করেনি, কিন্তু এখন শিরশির করে উঠল সোহেলের মেরুদণ্ড।

এক জঙ্গি এখনও মারা যায়নি, বালি খামচে ধরে শ্বাস নিতে চাইছে। প্রথমজনের মতই, ওর পিঠেও গুলি লেগেছে। লাথি দিয়ে লোকটার হাতের কাছ থেকে রাইফেল সরিয়ে দিল রায়হান, দুই হাতে চিত করল তাকে। জঙ্গির ঠোঁটে জমছে রক্তাক্ত ফেনা। ফুসফুসে লেগেছে বুলেট। শ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে।

জোড়া ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল হারিস জামান, 'কী করে?'

'আমরাও জানি না,' ঢোক গিলে বলল রায়হান।

'আমি বলতে পারি,' ক্যাপ্টেন নিশাতের একটু পুরুষালি কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা, 'এই চলে এলাম আর কী!'

'নিশাত আপা?' হেসে ফেলল সোহেল।

'আপনারা কেমন আছেন, স্যর?' কাভার পজিশন থেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন নিশাত। দুই হাতে ধরেছে কক করা রাইফেল। মুখের বেশির ভাগই ঢেকে রেখেছে নাইট ভিশন গগলস। ওটা খুলে ফেলল। 'যতটা সম্ভব দ্রুত এসেছি। তবে তাতে একটু সময় লেগেছে।'

বিশালদেহিনী নিশাতের কাঁধে হাত রাখল সোহেল। 'দারুণ দেখালেন, আপা।'

নিশাতের পিঠ ফাটিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে যেন রায়হান, চাপড়ের পর চাপড় পড়ছে বেচারির পিঠে।

'অ্যাই ছোকরা!' খেপে গিয়ে ধমক দিল নিশাত। 'আর একটা চাপড় মারলে এক চড়ে তোর বত্রিশ দাঁত ফেলে দেব!'

থতমত খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল রায়হান। হাসতে শুরু করেছে সোহেল, স্বর্ণা ও নিশাত। কয়েক সেকেণ্ড পর হেসে ফেলল রায়হানও।

'আপনারা নিজেরা তো খেলা দেখিয়ে দিয়েছেন,' বলল নিশাত।

পাশের গুহা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এসেছে স্মৃতি। শার্ট আগেই হারিয়েছে, ধুলো ও ময়লায় কালো হয়ে আছে ব্রেসিয়ার। আহত হাতে ধরে রেখেছে কয়েকটা বই। আগুন ধরে গেছে পাতাগুলোয়। চট্ করে বইগুলো নিল রায়হান, বালির উপর ফেলে দিল। দুই হাতে ওগুলোর উপর ফেলছে বালি। কয়েক মুহূর্ত পর নিভে গেল আগুন।

'আমি যদি আরও সরাতে পারতাম,' কাশির ফাঁকে আফসোস করল স্মৃতি। 'কিন্তু ওই ধোঁয়া... আর পারলাম না। অবশ্য, এটা পেয়েছি।'

'ওটা কী?' জানতে চাইল নিশাত।

সামনে হাত বাড়িয়ে দিল স্মৃতি, তালুর উপর একটা রূপার চেইন। ওটার সঙ্গে ঝুলছে খুদে এক বই। 'সত্যিকারের ইউনুস আল-কবিরের ফতোয়া। কাভার পুড়ে গেছে। আগুনের শিখার কারণেই দেখতে পেলাম বিছানার উপর একটা মামি। ওটার মাথা মক্কার দিকে। তখনই বুঝলাম উনিই সেই ইমাম। উনি মারা গেলে ওখানেই শুইয়ে দেন জেফ মার্টেল, এবং সব ধনরত্ন ফেলে চলে যান। বোধহয় প্রায় দুই শ' বছর হলো, এরপর আমরা এলাম এই গুহায়।'

টাইডাল স্টেশনের ওপাশে মরুভূমির খুব নিচু জমি। ওখান থেকে দূরে এক শ' ফুট চওড়া জেনারেটিং প্ল্যান্টের বিশাল ইস্পাতের গেট। ফ্যাসিলিটি যখন ফুল ক্যাপাসিটি নিয়ে কাজ করে, ওই গেট নামিয়ে দেয়া হয় পানির তিরিশ ফুট নীচে। বিপুল পরিমাণ পানি গলগল করে ঢোকে বিশাল মোটা পাইপগুলোর ভিতর, ওগুলোর মাধ্যমে এক শ' ফুট নীচে পৌঁছে

যায় পানি টারবাইন রুমে। এখন পশ্চিমে প্রায় ডুবে গেছে সূর্য, আপাতত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ইস্পাতের গেট। টারবাইন এখন স্তব্ধ, সূর্য উঠবার পর মরুভূমি থেকে বাড়তি লবণ সরিয়ে নেবে ক্রুরা। এটাই এই ফ্যাসিলিটির বৈশিষ্ট্য, যিরো-এমিশন জেনারেটিং প্লান্ট একেই বলে।

মার্ভেল থেকে আসা দুই মিসাইল ফ্রিগেটকে ডিঙিয়ে আঘাত হেনেছে গেট কন্ট্রোলের মেশিনারির উপর। ছিটকে পড়েছে হাইড্রলিক সিস্টেম, যে গিয়ার মেকানিকাল ব্রেকের কাজ করে, ওটা বিকল হয়েছে। এগুলোকে ডিজাইন করা হয়েছে যেন সাগরের বিপুল চাপ সইতে পারে, কিন্তু এখন কোনও সিস্টেম বা গিয়ার কাজ করছে না। বাইরের প্রচণ্ড চাপ খেয়ে নামতে লাগল ভারী গেট। ওপাশেই মানব-সৃষ্ট গভীর গহ্বর।

প্রথমে গেটের উপর দিয়ে সরু রেখায় ঢুকল সাগরের ঢেউ, তারপরই ভারী বৃষ্টির পর্দার মত ছিটকে ঢুকতে লাগল পানি। অনেক নীচের দিকে ছুটছে পানি। ভূমধ্য সাগর বাইরে থেকে চাপ তৈরি করছে গেটের উপর। দ্রুত নামতে লাগল ইস্পাতের দরজা, প্রচণ্ড চাপ পড়ছে ওটার উপর। আরও তাড়াতাড়ি নামছে এখন। ফাঁকা পথ পেয়ে ঢুকতে লাগল মিলিয়ন মিলিয়ন টন পানি। যে পাইপগুলো পাওয়ার হাউসকে পানি সরবরাহ করে, সেগুলো এখন বন্ধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে না টারবাইন। কাজেই অনেক নীচে মরুভূমির বিশাল গহ্বরে গিয়ে পড়ছে সমস্ত পানি।

এই প্লান্ট যখন কাজ করে, তখনও জানিয়ে দেয়া হয়, যেন দুই মাইলের ভিতর কোনও জাহাজ না আসে। কিন্তু এখন ওই নিয়ম খুশি মনে অমান্য করেছে গগল। প্রায় ধাক্কিয়ে বক্তিয়ার খিলজিকে সঠিক পজিশনে নিয়ে এসেছে ও। ঠিক সময়ে মিসাইল ছুঁড়েছে নবী।

ওরা এখন অপারেশন্স সেন্টারে, মেইন স্ক্রিনে দেখছে ফ্রিগেটের ওপাশে সাগরের বুকে তৈরি হয়েছে বিশাল এক গর্ত। মার্ভেলের কন্ট্রোল নিয়ে কাজ শুরু করেছে গগল। ওর প্রিয় জাহাজ টান খেয়ে চলে যেতে চাইছে আরেক দিকে।

প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাকের ভিতর পড়ে মার্ভেলের কাছ থেকে দ্রুত সরছে ফ্রিগেট, ওটাকে ডুবিয়ে দিতে চাইছে খেপা সাগর। মনে হলো ফ্রিগেট যেন বিশাল গর্তের দিকে ছুটছে। ডিরেকশনাল থ্রাস্টার কাজে লাগাল গগল, কমিয়ে আনল দুই জাহাজের দূরত্ব। বারবার দেখছে মেইন ভিউ স্ক্রিন। এখনও দেখা নেই রানার!

'রানা!' বিড়বিড় করে বলল গগল, 'জলদি, ভাই!'

এর এক সেকেণ্ড পর ফ্রিগেটের হ্যাচওয়ে খুলে গেল, ছিটকে বেরুল রানা, টেনে নিয়ে আসছে একজনকে। পিছনে ছুটছে জলিল খান। মার্ভেলের সরবার অ্যাংগেল বাড়াল গগল, দ্রুত চেপে এল ফ্রিগেটের দিকে। পাশাপাশি হয়ে গেল দুই জাহাজ। ঘষা খেয়ে উঠছে রং। বক্তিয়ারের রেলিঙে উঠে পড়ল রানা, প্রধানমন্ত্রীকে পিছন থেকে তুলে নিল জলিল। তারপর নিজে টপকে চলে এল মার্ভেলে, নামিয়ে নিল প্রধানমন্ত্রীকে। প্রায় একই সঙ্গে এ জাহাজে নামল রানা। অপেক্ষা করছে পাঁচ কমাণ্ডো, তারা সরিয়ে নিল ভদ্রমহিলাকে।

রানারা ডেকে নামতেই মার্ভেল সরিয়ে নিয়েছে গগল, টান খেয়ে গহ্বরের দিকে ধেয়ে চলেছে লিবিয়ান ফ্রিগেট। থ্রটল পুরো খুলে দিয়েছে গগল। বক্তিয়ার খিলজিও প্রাণপণ চেষ্টা করছে ঘূর্ণিপাক থেকে সরে যেতে। চিমনি থেকে বেরুচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়া, দ্রুত পানি কাটছে প্রপেলার, তবে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে টান, ওটাকে নিয়ে চলেছে খোলা গেটের দিকে।

মার্ভেলের ম্যাগনেটোহাইড্রোডাইন্যামিক ইঞ্জিনের বিপুল

শক্তি ফ্রিগেটের ইঞ্জিনের দশ গুণ, ওটার টিউবগুলোর ভিতর পানি ঢুকতেই সাগরের টান থমকে গেল, সরে যেতে লাগল মার্ভেল। গগল প্রয়োজনের বেশি খাটাতে চাইল না ইঞ্জিনকে, একটু কমাল গতি। প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে ও এই জাহাজটিকে।

বক্তিয়ার খিলজির খোল আড়াআড়ি ভাবে আছড়ে পড়ল খোলা স্লুইস গেটের ইনটেকে। ওটার কিলের নীচ দিয়ে হু-হু করে ঢুকছে পানি। কিন্তু পানির স্রোত বাধা পাচ্ছে খোলে। বিতিকিচ্ছিরি ভাবে আটকা পড়ল ফ্রিগেট, প্রবল চাপে মড়মড় আওয়াজ তুলল স্টিলের খোল। ভেস্তে গেছে লিবিয়ান জঙ্গিদের সব পরিকল্পনা। কিছুই করতে পারছে না নাবিকরা, তাদের ফ্রিগেটের ইঞ্জিন এখন আর এগুতে পারছে না।

একটু আগে আরপিজি হামলার সময় সুপারস্ট্রাকচারের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে মার্ভেলের অপারেটিভরা, কিন্তু এখন রানা ও ওর অতিথিকে ঘিরে ফেলল ওরা। সঠিক সময়ে মেডিক্যাল স্টাফদের নিয়ে হাজির হতে পারেনি ডক্টর ফারা, পৌঁছে দেখল রানা ছাড়া আর কেউ আহত হয়নি।

হাসছে জলিল খান, বলল, 'স্বাগতম আমাদের জাহাজে, প্রধানমন্ত্রী।'

ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন প্রধানমন্ত্রী, তবে হাতটা শক্ত করে ধরলেন রানার। 'সত্যি ধন্যবাদ তোমাকে।'

'আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা,' বলল রানা। 'অভিনয় করেছেন কখনও?'

ভুরু কুঁচকালেন ভদ্রমহিলা। 'অভিনয়?'

'জী। ওটা শিখতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে।' হাতের ইশারায় পথ দেখাল রানা। 'চিন্তা করবেন না, আপনার নিজের চরিত্রেই অভিনয় করবেন। আমরা শুধু একটা দৃশ্য তৈরি করব

মোহাম্মদ ফতে আলীর জন্যে।'

'আপনি জানেন সে কে?'

'হ্যাঁ। এ-ও জানি, কী করে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফির উপর চাপ তৈরি করেছে। তাঁর নাতি সুইটযারল্যাণ্ডে ছুটিতে ছিল। গাড়ি থেকে কিডন্যাপ করা হয় তাকে। দুর্ঘটনা ঘটানো হয় ওই গাড়ি দিয়ে। জানিয়ে দেয়া হয় গাদ্দাফি যদি নাতিকে বাঁচাতে চান, মোহাম্মদ ফতে আলীকে ফরেন মিনিস্টার করতে হবে। ভদ্রলোক বুঝতে পারেননি দুনিয়ার অন্যতম টেরোরিস্টকে নিজ সরকারের এত গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিয়েছেন। তখন থেকে যা খুশি করছে লোকটা।'

'তুমি এসবের সঙ্গে জড়িত হলে কীভাবে?' জানতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।

মৃদু হাসল রানা। 'বোধহয় কপালের ফেরে।'

পেরিয়ে গেল সাতটা দিন।

মার্ভেলের সিনিয়র স্টাফরা এসে সমবেত হয়েছে হেলিপ্যাডের পাশে। এইমাত্র ফিরছেন ক্যাপ্টেন আলম সিরাজ। ত্রিপোলির হাসপাতাল থেকে কাশেম বক্সকে নিয়ে আসছেন তিনি। ফারার সামনে হুইল চেয়ার, মুখ ফিরিয়ে চাইল। মার্ভেলের ফ্যানটেইল নীচে রেখে হাজির হলো এমডি-৫২০এন কপ্টার।

প্যাডের ঠিক মাঝে নামল স্কিডগুলো। টারবাইন বন্ধ করে দিলেন আলম সিরাজ। সবাই ছুটে গিয়ে ঘুরন্ত রোটরের নীচে চলে গেল। রানা টোকা দিল রিয়ার ডোর গ্লাসে। সিটে বসে আছে কাশেম বক্স, সবাইকে দেখে চওড়া হাসি ফুটে উঠল মুখে। ওর বুকে ভারী ব্যাণ্ডেজ। পাঁচ ঘণ্টা অপারেশন করা হয়েছে কাশেমের বুকে। হারিস জামানের গুলি ওর ভিতরের অর্গ্যান

ক্ষতিগ্রস্ত করে। পুরো এক সপ্তাহ পড়ে থেকেছে হাসপাতালে। আর লিবিয়ানদের খাবার খেয়ে ওর মনে হয়েছে, এবার বোধহয় আর বাঁচবে না। ডাক্তার ছেড়ে দেয়ার পরই আব্দার করেছে, মার্ভেলে ফিরে বাবুর্চি মোস্তফা আবুলের কাবাব না খেলে মরেই যাবে।

এখন মার্ভেলে পৌঁছে হাসি থামছে না ওর।

সবাই ওরা জানে, আজ পর্যন্ত যত মিশনে গেছে, সেগুলোর ভিতর এবারেরটাই সবচেয়ে কঠিন ছিল। সেদিন ভোরে চার লাইফবোটের সঙ্গে রন্দেভু করেছে মার্ভেল, তুলে নিয়েছে সবাইকে। এরই মধ্যে নিজ পদ ফিরে পেয়েছেন ফরেন মিনিস্টার। যোগ দিয়েছেন শান্তি মহাসম্মেলনে।

কদিন আগেই সোহেল ও অন্যদেরকে পাহাড়ি গুহার পাশ থেকে তুলে এনেছেন আলম সিরাজ। সোহেলরা গুহা থেকে বেরুতে গিয়ে দেখে ব্রাম ট্যাগার্টকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে। মুখ বাঁধা ছিল কাপড় দিয়ে, ওটা খুলতেই ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে থাকে। নিশাতের ভয়ঙ্কর ধমক খেয়ে শেষে ফিঁউ-ফিঁউ আওয়াজ তুলে থেমে যায়।

যে কমাণ্ডোরা মার্ভেল থেকে বক্তিয়ার খিলজিতে উঠতে গিয়ে আহত হয়, তারা এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠছে। যে দু'জন সাগরে পড়ে যায়, তাদেরকে উদ্ধার করে যোডিয়াক। স্মৃতির দুই হাত ও স্বর্ণার কাঁধের ক্ষত সেরে উঠছে। সোহেলের দলের সবার শরীর থেকে এক ছটাক পাথরের কুচি বের করেছে ফারা।

মার্ভেলে মাত্র এক রাত ছিল স্মৃতি, তারপর ফিরে গেছে আমেরিকায়। বাংলাদেশি, লিবিয়ান ও তিউনিশিয়ান ত্রিদেশি একটি আর্কিওলজিকাল টিম গেছে ইউনুস আল-কবিরের সেই গুহায়। মহান জলদস্যুর জাহাজটা একেবারেই পুড়ে ছাই হয়ে

গেছে। আগুন থেকে রক্ষা পায়নি মানুষটার দেহ, সিন্দুক, বই ও আসবাবপত্র। ওই গুহার মেঝেতে পড়ে ছিল হাজার হাজার স্বর্ণ-মুদ্রা ও হীরা-মণিমুক্তা। বারবারির জলদস্যুদের কাছে এসব এসেছে ইউরোপের দেশগুলো থেকে। পূর্ব-পুরুষদের কাছ থেকেও বহু আগের স্বর্ণ-মুদ্রা পেয়েছেন ইউনুস আল-কবির। ওগুলোর মূল্য সাধারণ সোনার কমপক্ষে ত্রিশ গুণ।

ত্রিপোলি শান্তি মহাসম্মেলনে নেতারা ঘোষণা দিয়েছেন, এসব সম্পদ বিক্রি করে তৈরি করা হবে দরিদ্রদের জন্য ফাণ্ড। শুধু তা-ই নয়, বৈঠকে বসে একের পর এক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছেন তাঁরা।

অন্তত দশটা হাত এগিয়ে গেল কাশেম বক্সকে নামাতে। কপ্টারের দরজা খুলে যেতেই তাকে আস্তে করে নামিয়ে দেয়া হলো হুইলচেয়ারে।

'তোমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে না,' বলল রানা।

'আমারও মনে হচ্ছে না, মাসুদ ভাই,' হাসল কাশেম। 'তবে জানি না কোনটা বেশি খারাপ, গাধা হয়ে যাওয়া, নাকি গুলি খাওয়া। লোকটা বলেছিল ও সিআইএ এজেন্ট!'

'যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে,' বলল সোহেল। 'ওই ফুসফুসে আঘাত খেয়েই মরেছে।'

আর্কিওলজিকাল ফাইণ্ড হিসাবে পাওয়া গেছে কয়েকটা বই এবং ইমাম ইউনুস আল-কবিরের নিজ হাতে লেখা ফতোয়া। ওখানে বিস্তারিত ভাবে লেখা হয়েছে খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের মানুষ কীভাবে পাশাপাশি বাস করতে পারে। এরই মধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে লেখাগুলোকে। সেসব ইমামের নিজ হাতেরই লেখা, পশ্চিমারা নকল কিছু লিখে মানুষকে ধাপ্পা দেয়নি। মহাসম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ফতোয়াগুলো

পড়ে শুনিয়েছেন।

বিশ্ব-নেতারা আশা করছেন, এর ফলে বিলুপ্ত হবে ধর্মের নামে টেরোরিজম। তবে রানা তা মনে করে না। ওর সঙ্গে একমত সোহেলও। মানুষ যতদিন অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে না, ততদিন নানান বিবাদ তৈরি হতেই থাকবে।

কাশেম বক্সের হুইল চেয়ারের পিছু নিল সবাই। ওরা জানে, যতদিন অত্যাচারীরা সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন করবে, ততদিন ওদের মত যোদ্ধা মানুষের প্রয়োজন পড়বে।

(সমাপ্ত)

মাসুদ রানা

সূর্য-সৈনিক

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

বন্দিশিবির থেকে অসহায় একদল
মানুষকে নিয়ে ফিরছে রানা। ওদেরকে ধাওয়া করছে জঙ্গিদের ট্রাক, হেলিকপ্টার। তেড়ে আসছে সশস্ত্র বাহিনী। একের পর এক বাধা ডিঙাতে গিয়ে হাঁপ ধরে গেল রানার। উদ্ধার করা তো দূরের কথা, এখনও জানে না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে কোথায় বন্দি করে রেখেছে ওরা।
ওদিকে সোহেল খুঁজছে শুকিয়ে যাওয়া নদীতে প্রাচীন সেই কাঠের জাহাজ। খুঁজছে ইমাম ইউনুস আল-কবিরের সেই গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া যেটা পাঠ করে শোনানো হবে সম্মেলনে।
বিপদের পর বিপদ। অথচ হাতে সময় নেই।
রানার মনে হলো, আর বুঝি সম্ভব হলো না প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধার করা! প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি আজই ঘোষণা দেবেন শান্তি মহাসম্মেলনের!
চারদিক থেকে জাল গুটিয়ে এনেছে জঙ্গিরা! টিভিতে এখুনি দেখানো হবে: বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মাথা কাটা পড়ার দৃশ্য!
তা হলে কি পারল না রানা, হেরে গেল জঙ্গিদের কাছে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET